আদর্শ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হজরত মুহাম্মদ (সা.)

-প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ

মানবজাতির শিক্ষক হজরত মুহাম্মদ (সা.), তিনি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বা শিক্ষক নন। মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের শিক্ষক। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন মুক্তির দূত হিসেবে। তিনি শুধু বাণী পৌঁছে দিয়েই তার দায়িত্ব পালন করেননি, নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করে আদর্শ উপস্থাপন করেছেন। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছেন। দার্শনিক মনে করেন সকল বিজ্ঞান ও দর্শনের মূল রাষ্ট্রদর্শন। কারণ রাষ্ট্রদর্শনের প্রভাব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয়কে প্রভাবিত করে। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ প্রেরিত আল কুরআনের রাষ্ট্রদর্শনের তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রচার করেই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি। একটি আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে তাঁর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই তিনি শুধু তাত্ত্বিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই নন, একজন আদর্শ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং রাষ্ট্রনায়ক। রাষ্ট্রনায়ক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসেবে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভূমিকা পর্যালোচনার আগে তাঁর জীবনের পর্যায়গুলো অত্যন্ড় সাবধানে; অথচ সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ করা খুবই প্রয়োজন। হজরত মুহাম্মদ (সা.) হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন হতেন ঠিকই এবং উচ্ছন্নে যাওয়া মক্কা নগরীতে তার মিশন সফল করার জন্য তিনি ফিরে এসেছেন বার বার। মক্কানগরী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মভূমি হলেও ইসলাম তার পরিপূর্ণতা লাভ করেছে মদীনায়ই। হেরাগুহায় মহানবী (সা.) ছিলেন উপবাসী, সন্ন্যাসী ও সুফি সাধক। তারপর মদীনায় এসে তিনি হলেন ইসলামের বাণীবাহক। মদীনায় এসে তিনি হলেন ইসলামের প্রবর্তক। ইসলামী আদর্শভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রধান। মদীনায়ই ইসলামী চেতনা পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও স্বচ্ছতর হলো। পবিত্র কুরআন শরীফেই রয়েছে, 'আজ আমি আপনার দীনকে পূর্ণতা দান করলাম এবং আমার পক্ষ থেকে পূর্ণ রহমত আপনার ওপর নাজিল করলাম। আমি খুশি যে ইসলাম আপনার দীন। (মাদানি সূরা : কুরআন; আলিয়া ইজেতবেগোভিচ, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও ইসলাম, ১৯৯৬, ৭৯)। মক্কায় নয়, মদীনায়ই ইসলামের সার্বিক সামাজিক ব্যবস্থাপনার সূচনা হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হেরাগুহায় ধ্যানমগ্নতা, তারপর বাস্তবতার জগতে প্রত্যাবর্তন, এককথায় পারমার্থিকতা ও যুক্তির তথা আধ্যাত্মিকতা ও কর্মনিষ্ঠার সমন্বয়– এই হলো ইসলামের বৈশিষ্ট্য। মরমিবাদ দিয়ে যার শুর", রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে তার পরিপূর্ণতা। এ যেন মানবজীবনের সারবত্তা। মনুষ্য জীবনের মতোই এর রয়েছে একদিকে 'স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গ', যা এক মহাকবির মহাকাব্য এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাস্ড়বতার সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় গদ্য।

আজকের সভ্য পাশ্চাত্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষ সাধন করেলেও মদীনার কল্যাণ রাষ্ট্রের শান্তির সুবাতাস তারা ফিরিয়ে আনতে পারেননি। খ্রিস্টবাদ কখনো একেশ্বরবাদে স্থির হয়নি। খ্রিস্টান গসপেলে (Trinity) তাই দেখা যায়, তিন সত্তার অবস্থান, ট্রিনিটি (Trinity)। খ্রিষ্টীয় তত্ত্বে ঈশ্বর হলেন পিতা। মা মেরী ও অন্যান্য সাধু বা সেইন্টরা খ্রিস্টবাদে দেবতুল্য। মুসলমানরা কিন্তু মহানবীকে শ্রদ্ধা করেন একজন পরিপূর্ণ মানবরূপে, কোনো ফেরেশতারূপে নয়। এইভাবে ইসলামী সংস্কৃতি স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। মুসলমানদের মসজিদকে খ্রিস্টানদের গির্জা অথবা হিন্দুদের মন্দিরের সাথে তুলনা করলেই বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মসজিদে দেখা যায় বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার এক মুক্ত ও উদার আবহ। গির্জায় দেখা যায় রহস্যময়তার এক পরিবেশ। মন্দিরে পাওয়া যায় রহস্যময়তার সাথে সাথে শ্রেষ্ঠ বা বর্ণভিত্তিক কর্তৃত্ব এবং যাজকীয় প্রাধান্যের এক আবহাওয়া। মসজিদের অবস্থান সাধারণত কর্মস্থলে, কোনো বাজার বা বসতির কেন্দ্রে। মসজিদে নামাজ আদায়ের পর জাগতিক বিষয়ে আলোচনার সুযোগ রয়েছে। গির্জা কিন্তু বাস্ড়বতার অনুষঙ্গ থেকে দূরে থাকতে চায়। আনুষ্ঠানিক নীরবতা, অন্ধকার অথবা অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভব নির্মাণের প্রচেষ্টা এসব ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। খ্রিস্টধর্মের মর্মবাণী অথবা গসপেলের (Trinity) লক্ষ্য শুধু ব্যক্তি, কিন্তু কুরআনের বাণী ব্যক্তিসমষ্টির জন্য। গির্জার ব্যবস্থাপনায় দেখা যায় এক ধরনের অভিজাততন্ত্র। ভাবগম্ভীর পরিবেশে যাজকীয় কর্তৃত্বের প্রকাশ। মসজিদে কিন্তু সাধারণ ও অসাধারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এর ব্যবস্থাপনায় গণতন্ত্র মূর্ত। ইসলামী আইনব্যবস্থায় ইজমা বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ জনগণের ঐকমত্যভিত্তিক সিদ্ধান্ড়, তার মাধ্যমে জনগণের অভিমতের প্রকাশ ঘটেছে ইসলামে। ইসলামে এভাবে শুধু যে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে তাই নয়, নতুন সভ্যতার পথও প্রশস্ড় হয়েছে। সভ্যতার সবচেয়ে শক্তিশালী চিত্র হলো শিক্ষা। কুরআন শরীফের প্রথম আয়াতেই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। তাছাড়া কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর প্রতিনিধিরূপে উল্লেখ করেছেন। মানুষ কিন্তু বিশ্বময় তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারে শুধুমাত্র তার বিশেষ জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে, বিজ্ঞানচর্চা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে। তাই শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণ দু'টোই ইসলামে অবশ্য করণীয়। হজরত মুহাম্মদ (সা.) নিজেই বলেছেন, 'আমি দু'জনের বিষয়ে অসন্তুষ্ট : অজ্ঞ ভক্ত এবং নাস্ড়িক পন্ডিত' (Ralph waldo emerson. The conduct of life গ্রন্থে উদ্ধৃত)।

তিনি নিজে যাদের প্রশিক্ষিত করেছিলেন। তাঁর মহান সাহচর্যে থেকে যাঁরা শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছেন সেই সংস্কৃতিবান মানুষদের নিয়েই তিনি মদীনায় একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর মক্কী জীবনের ১৩ বছর ছিল কঠিন এক পরীক্ষার সময়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিরাই রাসূল (সা.) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর মদীনায় হিজরতের দুই বছর পর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনা এবং এর আশপাশের মুসলিম, ইহুদি ও অন্যান্য গোত্রকে নিয়ে রাসূল (সা.) একটি শান্ড়ি চুক্তি করেন, যেটি ইসলামের ইতিহাসে; এমনকি বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান ও মানবাধিকার সনদ, যা ইতিহাসে মদীনা সনদ নামে পরিচিত। এটি রচিত হয় মদীনা রাষ্ট্রের নানা ধর্মের মানুষদের শান্ড়ি পূর্ণ সহাবস্থান, মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার রক্ষার জন্য। এই লিখিত সনদটি প্রথমবারের মতো গোত্রভিত্তিক একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। প্রথমবারের মতো বিশ্বের বুকে একটি ভৌগোলিক জাতীয়তাভিত্তিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। নানা ধর্মের, নানা গোত্রের মানুষ মিলে এক জাতিতে পরিণত হয়। এমনকি আইন তৈরি এবং প্রণয়নের প্রাথমিক ধারণাও এখান থেকে প্রতিষ্ঠিত হলো। এই সনদ শিখিয়েছে কীভাবে পাশাপাশি সহাবস্থানে থেকে সকল গোত্রের নিজস্ব কৃষ্টি-কালচারের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা যায়। এই সংবিধান যাবতীয় মানবাধিকার, নারী অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক চর্চা, সামাজিক নিরাপত্তা, ক্ষুদ্র ও প্রান্ড়িক জনগোষ্ঠীর অধিকার ইত্যাদি নিশ্চিত করেছে। এটি মদীনাকে সব ধরনের সন্ত্রাসবিরোধী শান্ড়ির এবং নিরাপত্তার রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছে। প্রকারান্ড়রে রাসূল (সা.) একটি ইসলামী আদর্শভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্রই ভিত্তি স্থাপন করেছেন মদীনায়। ১৯৮৬ সালে ড. হামিদুল্লাহ বিভিন্ন ইসলামিক দলিল-পত্রের সাহায্যে মদীনা সনদকে ৪৭টি ধারায় ভাগ করেছিলেন। সাম্প্রতিককালে প্রখ্যাত ইসলামিক স্কলার এবং বিচারক ড. মুহম্মদ তাহির আল কাদরী এ সনদ নিয়ে বিশদ গবেষণা ও বিশ্লেষণ করেছেন এবং আধুনিক সংবিধানগুলোর মতো করে সনদের বিভিন্ন ভাগের বিভিন্ন শিরোনাম দিয়েছেন এবং সংবিধানটিকে ৬৩টি আর্টিকেলে ভাগ করেছেন। ড. কাদরীর বইটির নাম হলো 'মদীনা সনদের সাংবিধানিক বিশ্লেষণ'। ৬৩টি ধারাগুলো নিম্নরূপ–

আর্টিকেল ১ : সাংবিধানিক দলিল : এই সংবিধান আল্লাহর নবী রাসূল (সা.) (আল্লাহ তায়ালার হুকুমে) কর্তৃক প্রণীত।

আর্টিকেল ২ : সংবিধানের অধিভুক্ত পক্ষসমূহ : এই সংবিধানটি কুরাইশ মুসলিম, মদীনার নাগরিক, তাদের অধীনস্ড় গোত্রসমূহ যারা রাজনৈতিকভাবে তাদের সাথে যুক্ত হবে এবং তাদের হয়ে যুদ্ধ করবে।

আর্টিকেল ৩ : সাংবিধানিক জাতীয়তা : উপরোল্লিখিত পক্ষসমূহ একটি সাংবিধানিক ঐক্যের ভিত্তিতে পরিচিত হবে যা অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ থেকে তাদের আলাদাভাবে পরিচিত করবে।

আর্টিকেল ৪ : রক্তমূল্য পরিশোধের পূর্ববর্তী গোত্রীয় আইন : মুহাজির কুরাইশদের জন্যও বৈধ এবং বলবৎকরণ মুহাজির কুরাইশগণ আগেকার বিধিবিধান মোতাবেক তাদের গোত্রের জন্য দায়বদ্ধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথভাবে রক্তঋণ পরিশোধ করবে এবং প্রতিটি পক্ষই মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের বন্দীদের মুক্ত করে নিবে এবং বিশ্বাসীদের মাঝে যাবতীয় লেনদেন হবে বিদ্যমান আইন মোতাবেক এবং ইনসাফের ভিত্তিতে।

আর্টিকেল ৫ : বনি আউফ গোত্রের জন্যও রক্তমূল্যের পূর্বের আইন বলবৎকরণ : বনি আউফ গোত্রের মুহাজিরগণ আগেকার বিধিবিধান মোতাবেক তাদের গোত্রের জন্য দায়বদ্ধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথভাবে রক্তঋণ পরিশোধ করবে এবং প্রতিটি পক্ষই মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের বন্দীদের মুক্ত করে নিবে এবং বিশ্বাসীদের মাঝে যাবতীয় লেনদেন হবে বিদ্যমান আইন মোতাবেক এবং ইনসাফের ভিত্তিতে।

আর্টিকেল ৬ : বনি হারিস গোত্রের জন্যও রক্তমূল্যের পূর্বের আইন বলবৎকরণ : বনি হারিস গোত্রের মুহাজিরগণও আগেকার বিধিবিধান মোতাবেক তাদের গোত্রের জন্য দায়বদ্ধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথভাবে রক্তঋণ পরিশোধ করবে এবং প্রতিটি পক্ষই মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের বন্দীদের মুক্ত করে নিবে এবং বিশ্বাসীদের মাঝে যাবতীয় লেনদেন হবে বিদ্যমান আইন মোতাবেক এবং ইনসাফের ভিত্তিতে।

আর্টিকেল ৭ : বনি সাঈদা গোত্রের জন্যও রক্তমূল্যের পূর্বের আইন বলবৎকরণ : বনি সাঈদা গোত্রের মুহাজিরগণ আগেকার বিধিবিধান মোতাবেক তাদের গোত্রের জন্য দায়বদ্ধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথভাবে রক্তঋণ পরিশোধ করবে এবং প্রতিটি পক্ষই মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের বন্দীদের মুক্ত করে নিবে এবং বিশ্বাসীদের মাঝে যাবতীয় লেনদেন হবে বিদ্যমান আইন মোতাবেক এবং ইনসাফের ভিত্তিতে।

আর্টিকেল ৮ : বনি জুশাম গোত্রের জন্যও রক্তমূল্যের পূর্বের আইন বলবৎকরণ : বনি জুশাম গোত্রের মুহাজিরগণ আগেকার বিধিবিধান মোতাবেক তাদের গোত্রের জন্য দায়বদ্ধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথভাবে রক্তঋণ পরিশোধ করবে এবং প্রতিটি পক্ষই মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের বন্দীদের মুক্ত করে নিবে এবং বিশ্বাসীদের মাঝে যাবতীয় লেনদেন হবে বিদ্যমান আইন মোতাবেক এবং ইনসাফের ভিত্তিতে।

আর্টিকেল ৯ : বনি নজর গোত্রের জন্যও রক্তমূল্যের পূর্বের আইন বলবৎকরণ : বনি নজর গোত্রের মুহাজিরগণ আগেকার বিধিবিধান মোতাবেক তাদের গোত্রের জন্য দায়বদ্ধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথভাবে রক্তঋণ পরিশোধ

করবে এবং প্রতিটি পক্ষই মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের বন্দীদের মুক্ত করে নিবে এবং বিশ্বাসীদের মাঝে যাবতীয় লেনদেন হবে বিদ্যমান আইন মোতাবেক এবং ইনসাফের ভিত্তিতে।

আর্টিকেল ১০ : বনি আমর গোত্রের জন্যও রক্তমূল্যের পূর্বের আইন বলবৎকরণ : বনি আমর গোত্রের মুহাজিরগণ আগেকার বিধিবিধান মোতাবেক তাদের গোত্রের জন্য দায়বদ্ধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথভাবে রক্তঋণ পরিশোধ করবে এবং প্রতিটি পক্ষই মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের বন্দীদের মুক্ত করে নিবে এবং বিশ্বাসীদের মাঝে যাবতীয় লেনদেন হবে বিদ্যমান আইন মোতাবেক এবং ইনসাফের ভিত্তিতে।

আর্টিকেল ১১ : বনি নাবীত গোত্রের জন্যও রক্তমূল্যের পূর্বের আইন বলবৎকরণ : বনি নাবীত গোত্রের মুহাজিরগণ আগেকার বিধিবিধান মোতাবেক তাদের গোত্রের জন্য দায়বদ্ধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথভাবে রক্তঋণ পরিশোধ করবে এবং প্রতিটি পক্ষই মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের বন্দীদের মুক্ত করে নিবে এবং বিশ্বাসীদের মাঝে যাবতীয় লেনদেন হবে বিদ্যমান আইন মোতাবেক এবং ইনসাফের ভিত্তিতে।

আর্টিকেল ১২ : বনি আউস গোত্রের জন্যও রক্তমূল্যের পূর্বের আইন বলবৎকরণ : বনি আউস গোত্রের মুহাজিরগণ আগেকার বিধিবিধান মোতাবেক তাদের গোত্রের জন্য দায়বদ্ধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথভাবে রক্তঋণ পরিশোধ করবে এবং প্রতিটি পক্ষই মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের বন্দীদের মুক্ত করে নিবে এবং বিশ্বাসীদের মাঝে যাবতীয় লেনদেন হবে বিদ্যমান আইন মোতাবেক এবং ইনসাফের ভিত্তিতে।

আর্টিকেল ১৩ : আইন ও সুবিচারের সমতা সকল গোত্রের জন্য প্রযোজ্য : সকল গোত্রকে বন্দীমুক্তি দেয়ার অধিকার দেয়ার মাধ্যমে বিশ্বাসীদের প্রতি আইনের সমতা এবং সুবিচার নিশ্চিত করা হলো।

আর্টিকেল ১৪ : আইনে শিথিলতা নিষিদ্ধ : বিশ্বাসীরা নিজেদের মাঝে কোনো ঋণগ্রস্ড় রাখবে না, সাধ্যমতো তাকে মুক্তিপণ পরিশোধ করতে সহায়তা করবে।

আর্টিকেল ১৫ : অন্যায় পক্ষপাত নিষিদ্ধ : কোনো বিশ্বাসী অন্য কোন বিশ্বাসীর সাথে তার মতামত না নিয়ে কোনো অ্যালায়েন্স করবে না।

আর্টিকেল ১৬ : অবিচার, নিষ্ঠুরতা এবং আক্রমণকারীদের বির"দ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ : মদীনা রাষ্ট্রের বির"দ্ধে বিরোধিতাকারী বা জোরপূর্বক কোনো কিছু জবরদখল করার চেষ্টারত বা বিশ্বাসীদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী' এদের বির"দ্ধে সকল বিশ্বাসী একসাথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, যদি সেই বিপ্লবী বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী তাদের কারো সন্ড়নও হয়ে থাকে।

আর্টিকেল ১৭ : একজন মুসলিম কর্তৃক আরেকজন মুসলিম হত্যা করা নিষিদ্ধ : একজন অবিশ্বাসীর জন্য কোন মুসলিম অপর কোনো মুসলিমকে হত্যা করবে না; এমনকি কোন বিশ্বাসীর বির"দ্ধে কোনো অবিশ্বাসীকে সাহায্যও করবে না।

আর্টিকেল ১৮ : সকল মুসলিমের জন্য জানের নিরাপত্তার সমঅধিকারের নিশ্চয়তা : আল্লাহ কর্তৃক সবার নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। এই সংবিধান সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে, এর জন্যে সকল বিশ্বাসীকে সর্বোচ্চ পরিমাণে বিনয়ী হতে হবে (সকল বিশ্বাসীর জন্যই এটা বাধ্যতামূলক)।

আর্টিকেল ১৯ : অন্যান্য সাংবিধানিক কমিউনিটির চেয়ে মুসলিমদের আলাদা সাংবিধানিক পরিচয় : বিশ্বাসীরা একে অপরকে সাহায্য করবে বহির্বিশ্বের বিপরীতে।

আর্টিকেল ২০ : অমুসলিম ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী (ইহুদি)-এর জন্যও জীবনের নিরাপত্তার সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ (মুসলিমদের মতো) : রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যশীল একজন ইহুদির জীবনের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা হলো যে পর্যন্ড় না তিনি বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষতিকর কিছু না করেন বা বিশ্বাসীদের বির"দ্ধে বাইরের কাউকে সাহায্য না করেন।

আর্টিকেল ২১ : সমতা এবং ইনসাফের ভিত্তিতে সকল মুসলিমের জন্য শান্ড়ি এবং নিরাপত্তার বিধান : বিশ্বাসী কর্তৃক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা সবার জন্য সমান। যখন আল্লাহর রাস্ড়ায় কোন জিহাদের প্রয়োজন হবে কোন বিশ্বাসী শত্রুপক্ষের সাথে আলাদাভাবে কোন চুক্তিতে যাবে না, যদি না সেটা সকল বিশ্বাসীদের জন্য সমতা এবং নায্যতা প্রতিষ্ঠা করে।

আর্টিকেল ২২ : যুদ্ধের সহযোগী পক্ষগুলোর জন্য ছাড় : যুদ্ধের প্রতিটি পক্ষের জন্যই যুদ্ধের যাবতীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ ছাড়।

আর্টিকেল ২৩ : আল্লাহর রাস্ড়ায় হতাহতের বির"দ্ধে মুসলিমদের প্রতিশোধ : আল্লাহর রাস্ড়ায় নিহতদের প্রতিশোধ নিতে বিশ্বাসীরা একে অপরকে সাহায্য করবে।

আর্টিকেল ২৪ : ইসলাম জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিধান : তাকওয়াসম্পন্ন বিশ্বাসীদের জন্য উৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে সঠিক জীবন পদ্ধতি ইসলামকে মনোনীত করা হয়েছে।

আর্টিকেল ২৫ : শত্রুপক্ষকে জীবনের এবং সম্পদের নিরাপত্তা দেয়া নিষেধ : কোন পৌত্তলিকের জানের এবং সম্পদের নিরাপত্তা কুরাইশদের কাছে নেই, যেহেতু তারা মদীনা রাষ্ট্রের শত্রু। এমনকি কোন বিশ্বাসীর বির"দ্ধে তাদের সহায়তাও প্রদান করা হবে না।

আর্টিকেল ২৬ : মুসলিম হত্যার প্রতিশোধ : যখন কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলিমকে হত্যা করে এটা সত্য প্রমাণিত হলে সেই হত্যাকারীকেও হত্যা করা হবে। যদি না নিহতের আত্মীয়-স্বজন জানের বদলা হিসেবে রক্তমূল্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। বিশ্বাসীরা একযোগে সেই হত্যাকারীর বির"দ্ধে দাঁড়াবে, হত্যাকারীর বিরোধিতা করা ছাড়া বিশ্বাসীদের আর কোন অবস্থান হতে পারবে না।

আর্টিকেল ২৭ : সংবিধানের বির"দ্ধে ষড়যন্ত্রকারী বা ধ্বংসকারীদের ক্ষেত্রে কোন সুরক্ষা বা ছাড় নেই : যারা বিশ্বাসী, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং পরকালে বিশ্বাস করে এবং এই দলিলের সব ধারার সাথে সম্মতি জানিয়েছে তারা এই সংবিধানের বির"দ্ধে ষড়যন্ত্রকারী বা এই সংবিধান অকার্যকর করার সাথে যুক্ত এমন কাউকে কোনরূপ সুরক্ষা বা ছাড় দেবে না। যারা এমনটি করবে, কেয়ামতের দিন তাদের জন্য রইলো আল্লাহর অভিশাপ এবং প্রচ" ক্রোধ। এমনকি কেয়ামতে দিন ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদের কোনকিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না।

আর্টিকেল ২৮ : যেকোন বিষয়ে দ্বিমত বা বিতর্কে চূড়ান্ড় সিদ্ধান্ড় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা.) : যখন তোমাদের মাঝে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিবে, তখন সেটি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা.) কাছে সেটি পেশ করবে। যেহেতু সকল বিষয়ে চূড়ান্ড় ফায়সালা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-ই দেবেন।

আর্টিকেল ২৯ : অমুসলিম মানে ইহুদিগণ যুদ্ধের ব্যয়ভার সমানুপাতিক হারে বহন করবে : ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ইহুদিগণ যতক্ষণ তাদের সাথে একসাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, সমানুপাতিক হারে যুদ্ধের ব্যয়ভার এবং দায়দায়িত্ব বহন করবে।

আর্টিকেল ৩০ : সকল মুসলিম এবং অমুসলিমদের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা : বনি আউফ গোত্রের ইহুদিগণ বিশ্বাসীদের সাথে মিলে একটি কমিউনিটি হিসেবে বিবেচিত হবে। মুসলিমদের সাথে সাথে তাদেরও পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। তাদের এবং তাদের সহযোগী সবার জন্যই এই অধিকার সুনিশ্চিত করা হলো, তাদের ছাড়া যারা অন্যের ওপর বলপ্রয়োগকারী অপরাধী এবং যারা এই চুক্তি ভঙ্গকারী। এভাবে তারা শুধুমাত্র নিজেদের এবং তাদের পরিবারের প্রতি দুর্ভোগ বয়ে আনবে।

আর্টিকেল ৩১ : বনি নজর গোত্রের ইহুদিগণেরও বনি আউফ গোত্রের মতো সমান অধিকার : বনি আউফের মতো বনি নজর গোত্রও একইরকম অধিকার ভোগ করবে।

আর্টিকেল ৩২ : বনি হারিস গোত্রের ইহুদিগণেরও বনি আউফ গোত্রের মতো সমান অধিকার : বনি আউফের মতো বনি হারিস গোত্রও একইরকম অধিকার ভোগ করবে।

আর্টিকেল ৩৩ : বনি সাঈদা গোত্রের ইহুদিগণেরও বনি আউফ গোত্রের মতো সমান অধিকার : বনি আউফের মতো বনি সাঈদা গোত্রও একইরকম অধিকার ভোগ করবে।

আর্টিকেল ৩৪ : বনি জুশাম গোত্রের ইহুদিগণেরও বনি আউফ গোত্রের মতো সমান অধিকার : বনি আউফের মতো বনি জুশাম গোত্রও একইরকম অধিকার ভোগ করবে।

আর্টিকেল ৩৫ : বনি আউস গোত্রের ইহুদিগণেরও বনি আউফ গোত্রের মতো সমান অধিকার : বনি আউফের মতো বনি আউস গোত্রও একইরকম অধিকার ভোগ করবে।

আর্টিকেল ৩৬ : বনি থা'লাবা গোত্রের ইহুদিগণেরও বনি আউফ গোত্রের মতো সমান অধিকার : বনি আউফের মতো বনি থা'লাবা গোত্রও একইরকম অধিকার ভোগ করবে, তারা ছাড়া যারা অন্যের ওপর বলপ্রয়োগকারী অপরাধী এবং যারা এই চুক্তি ভঙ্গকারী। এভাবে তারা শুধুমাত্র নিজেদের এবং তাদের পরিবারের প্রতি দুর্ভোগ বয়ে আনবে।

আর্টিকেল ৩৭ : বনি থা'লাবার উপগোত্র জাফনার ইহুদিগণেরও বনি আউফ গোত্রের মতো সমান অধিকার : জাফনা, থা'লাবা গোত্রের একটি শাখা তারাও থা'লাবা গোত্রের মতো একইরকম অধিকার ভোগ করবে

আর্টিকেল ৩৮ : বনি শুতাইবা গোত্রের ইহুদিগণেরও বনি আউফ গোত্রের মতো সমান অধিকার : বনি আউফের মতো বনি শুতাইবা গোত্রের ইহুদিগণও একইরকম অধিকার ভোগ করবে। তারা এই সংবিধানের প্রতি পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য প্রদর্শন করবে এবং এর কোন একটি ধারাও ভঙ্গ করবে না।

আর্টিকেল ৩৯ : থা'লাবা গোত্রের সকল সহযোগীদের অধিকারের সমতা : বনি থা'লাবার জন্য যে অধিকার, তার সহযোগী সব গোত্রের জন্যও সমঅধিকার নিশ্চিত করা হলো।

আর্টিকেল ৪০ : ইহুদি সকল শাখার জন্য অধিকারের সমতা : ইহুদিদের প্রতি যে অঙ্গীকার করা হয়েছে, তাদের সকল শাখার জন্যও একই প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো।

আর্টিকেল ৪১ : সশস্ত্র যুদ্ধে যাবার ক্ষেত্রে চূড়ান্ড় সিদ্ধান্ড় নেয়ার এবং আদেশ দেয়ার ক্ষমতা আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর : আল্লাহর রাসূলের (সা.) পূর্বানুমতি ছাড়া কেউ সশস্ত্র যুদ্ধ শুর" করতে পারবে না। যেহেতু যুদ্ধের ব্যাপারে চূড়ান্ড় সিদ্ধান্ড় নেয়ার অথরিটি কেবলমাত্র রাসূল (সা.)।

আর্টিকেল ৪২ : প্রতিশোধের ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম নেই : কেউ কোন যৌক্তিক প্রতিশোধ বা খুনের বদলা নিতে চাইলে সেখানে কোনরূপ বাধা প্রদান করা হবে না।

আর্টিকেল ৪৩ : বেআইনি হত্যার দায় দায়িত্ব : কেউ যদি বেআইনিভাবে কাউকে খুন করে তবে সে এবং তার পরিবার এর জন্য দায়ী হবে, তবে সে যদি কোন নিষ্ঠুর বা অত্যাচারী কাউকে খুন করে সেক্ষেত্রে ছাড় পেতে পারে। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এই সনদের আনুগত্যকারীদের সাথে আছেন।

আর্টিকেল ৪৪ : পৃথকভাবে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করা : মুসলিম এবং ইহুদিগণ পৃথকভাবে নিজ নিজ যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবে।

আর্টিকেল ৪৫ : যুদ্ধের সময় একে অপরকে সহায়তা করা অবশ্য কর্তব্য : এই সনদে স্বাক্ষরকারীদের সাথে যারা যুদ্ধরত তাদের বির"দ্ধে সকলের পারস্পরিক সহায়তা করা অবশ্যকর্তব্য।

আর্টিকেল ৪৬ : পারস্পরিক আলোচনা এবং সম্মানজনক লেনদেন : এই চুক্তিনামায় স্বাক্ষরদানকারী প্রতিটি পক্ষ নিজেদের মাঝে পারস্পরিক বোঝাপড়া বজায় রাখবে এবং সম্মানজনকভাবে লেনদেন করবে এবং নিজেদের মাঝে করা সকল প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকবে।

আর্টিকেল ৪৭ : বিশ্বাসঘাতকতা নিষিদ্ধ এবং নিপীড়িতদের সহযোগিতা প্রদান : কেউ মিত্রপক্ষের জন্য কোন চুক্তি ভঙ্গ করবে না এবং নিপীড়িতদের সাহায্য করা হবে।

আর্টিকেল ৪৮ : ইহুদিগণ (অমুসলিম ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী) যুদ্ধের সময়ে রাষ্ট্রের প্রতি আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ বাড়াবে : মুসলিমদের পাশাপাশি ইহুদিরাও যুদ্ধের সময়ে রাষ্ট্রকে দেয়া আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ বাড়াবে।

আর্টিকেল ৪৯ : রাষ্ট্রে বিদ্যমান বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ এবং রক্তপাত নিষিদ্ধ : ইয়াসরিব উপত্যকা পবিত্র ভূমি, সেখানে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে যুদ্ধ এবং রক্তপাত নিষিদ্ধ করা হলো।

আর্টিকেল ৫০ : সনদের অধীনে আশ্রয় নেয়া জনগণের সমভাবে জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা : কোন ব্যক্তিকে মদীনায় আশ্রয় দেয়া হলে যতক্ষণ পর্যন্ড় না সে ক্ষতিকর কিছু করছে বা বিশ্বাসঘাতকতা করছে ততক্ষণ পর্যন্ড় জীবনের নিরাপত্তার ব্যাপারে তারও সমান অধিকার।

আর্টিকেল ৫১ : নারীদের আশ্রয় দেয়ার ব্যাপারে আইন : একজন নারীকে তার পরিবারের সম্মতি ছাড়া আশ্রয় দেয়া হবে না।

আর্টিকেল ৫২ : কোন মতবিরোধ সংঘাতের দিকে পৌঁছালে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল (সা.)-ই হবেন
এর চূড়ান্ড় ফায়সালাকারী : যখনই এই সনদে স্বাক্ষরকারী দলসমূহের মধ্যে কোন মতপার্থক্য চরমে পৌঁছালে, সংঘাতের দিকে যাবার আশঙ্কা তৈরি হলে সেটার বিচারের ভার আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা.) ওপর ন্যস্ড় করা হবে। রাসূল (সা.)-ই চূড়ান্ড় এবং সর্বোচ্চ মানদ"ের সঠিক সমাধান দিবেন। এই সংবিধানের ওপর আস্থাশীল বিশ্বাসীদের যারা এই সংবিধানের নীতিমালাসমূহ সঠিকভাবে পালনে সচেষ্ট তাদের যাবতীয় দায়দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার।

আর্টিকেল ৫৩ : শত্রুরাষ্ট্রের কাউকে বা তাদের কোন মিত্রকে কোন আশ্রয় নয় : কুরাইশ এবং তার মিত্রদের কোনো আশ্রয় দেয়া হবে না।

আর্টিকেল ৫৪ : রাষ্ট্রের ওপর কোন আঘাত আসলে সম্মিলিত প্রতিরোধ : বাহির থেকে মদীনা রাষ্ট্রের ওপর কোন আঘাত আসলে মুসলিম এবং ইহুদিগণ সম্মিলিতভাবে সেটা প্রতিরোধ করবে।

আর্টিকেল ৫৫ : প্রতিটি মিত্র গোত্রের জন্য শান্ড়িচুক্তি মেনে চলা অবশ্যকর্তব্য : ইহুদিদের কোন শান্ড়িচুক্তিতে আহ্বান জানানো হলে এটা তাদের দায়িত্ব যে তারা সেটি পালন করবে এবং এর সাথে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধভাবে যুক্ত থাকবে। একইভাবে মুসলিমদের কোন শান্ড়িচুক্তিতে আহ্বান জানানো হলে এটা তাদের দায়িত্ব যে তারা সেটি পালন করবে এবং এর সাথে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধভাবে যুক্ত থাকবে।

আর্টিকেল ৫৬ : কোন চুক্তিই ধর্মীয় চর্চা থেকে কাউকে বিরত রাখবে না বা ধর্মপালনে বাধা দিবে না : (যদিও মুসলিমদের কোন শান্ড়িচুক্তিতে আহ্বান জানানো হলে এটা তাদের দায়িত্ব যে তারা সেটি পালন করবে এবং এর সাথে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধভাবে যুক্ত থাকবে।) তবে কোনো চুক্তিই তাদের আল্লাহর পথে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই থেকে বিরত করতে পারবে না।

আর্টিকেল ৫৭ : প্রতিটি মিত্রপক্ষ তাদের নিজ নিজ সম্মুখভাগের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে : চুক্তিতে স্বাক্ষররত প্রতিটি পক্ষ তাদের নিজ নিজ সম্মুখভাগের সমরনীতি নিজেরাই নির্ধারণ করবে এবং কীভাবে নিজেদের রক্ষা করবে সে ব্যাপারে নিজেরাই সিদ্ধান্ড় নেবে।

আর্টিকেল ৫৮ : স্বাক্ষরকারী প্রত্যেকটি দলের জন্যই মূল সাংবিধানিক মর্যাদা সমান : আউস গোত্র এবং তাদের মিত্র সকল ইহুদিগণ এই সংবিধানে স্বাক্ষরকারী অন্য দলগুলোর মতো সমানভাবে সাংবিধানিক মর্যাদা পাবে এই শর্তে যে তারা নিষ্ঠা এবং আন্ড়রিকতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করবে।

আর্টিকেল ৫৯ : সংবিধান অবমাননা করার কোন অধিকার কোন পক্ষের নেই : বিদ্যমান কোন দলেরই সংবিধান অবমাননা করার কোন অধিকার নেই। কেউ যদি কোন অপরাধ করে তাহলে সে নিজেই এর জন্য দায়ী।

আর্টিকেল ৬০ : সংবিধানের প্রতি আনুগত্যশীলদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা দয়াশীল : যারা বিশ্বস্ড়তার সাথে এই সংবিধানের প্রতি আনুগত্যশীল থাকবে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সবসময়ে সদয় থাকবেন।

আর্টিকেল ৬১ : কোন বিশ্বাসঘাতক বা বলপ্রয়োগকারীর জন্য এই সংবিধানের অধীনে কোনো আশ্রয় নেই : এই মর্মে বলা হচ্ছে যে এই সংবিধান কোন বিশ্বাসঘাতক বা অন্যায়ভাবে বলপ্রয়োগকারীকে কোন সুরক্ষা দিবে না।

আর্টিকেল ৬২ : সকল শান্ড়িপূর্ণ নাগরিক নিরাপদ এবং সুরক্ষিত : যারা যুদ্ধে যাবে বা যারা মদীনায় অবস্থান করবে সবার জন্যই নিরাপত্তা, শুধুমাত্র তাদের ছাড়া যারা গোলযোগ সৃষ্টি করছে এবং সংবিধান মেনে চলছে না।

আর্টিকেল ৬৩ : সংবিধানের প্রতি আনুগত্যশীল : মদীনার প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) হলেন রক্ষাকর্তা এ মর্মে ঘোষণা করা হচ্ছে যে আল্লাহ এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল (সা.), মদীনার সুনাগরিক এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের রক্ষাকর্তা।

এ চুক্তির মধ্য দিয়ে মদীনার নানা গোত্রের, ধর্মের মানুষের মধ্যে একটি শান্ড়ি ও নিরাপত্তাময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল এবং এরপর থেকে ইসলামের মূল জয় শুর" হয়, কুরাইশদের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে ইসলামী বাহিনী জয় লাভ করতে থাকে। এ চুক্তির ছয় বছর পর ৬২৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে কুরাইশদের সাথে রাসূল (সা.)-এর বাহিনীর যে শান্ড়িচুক্তি হয় সেটির নাম 'হুদায়বিয়ার সন্ধি'। সেখানে কুরাইশরা রাসূল (সা.)-কে আল্লাহর নবী হিসেবে মানতে চায়নি, তবুও রাসূল (সা.) শুধু তাঁর পিতৃপ্রদত্ত পূর্বনামেই চুক্তি সম্পন্ন করেছিলেন, মক্কায় হজ করতে গিয়েছিলেন। আর এই সূত্র ধরেই আরো দুই বছর পর মুসলিমরা অর্জন করেছে তাদের চূড়ান্ড় বিজয়। ৬২৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর রাসূল (সা.) এবং তাঁর বাহিনী মক্কা জয় করেন। সেখানে দীন ইসলাম পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পবিত্র কাবাঘরের সকল মূর্তি অপসারিত হয়।

ইসলামের মৌল ভিত্তি যে একত্ববাদ তা যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যোগ্য লোক তৈরির শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়েছে, সেই ঐক্যানুভূতির প্রতিকৃতিও রূপ পেয়েছে আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সুনির্দিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাক্ষেত্রে বিশ্বময় আজ যে প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, বিশেষ করে তথ্য প্রবাহের অবাধ গতির প্রেক্ষাপটে, গণতান্ত্রিকতার বৈপ্লবিক সম্প্রসারণের একালে, বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষাব্যবস্থার কিছুটা প্রতিফলন দেখা যায় বটে, কিন্তু তা আংশিক। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, আইন-চিকিৎসা, অর্থনীতি, পরিকল্পনা, যুক্তিবিদ্যা-প্রকৌশল প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা গতিশীল হলেও ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র, দর্শন ও সৃষ্টিতত্ত্ব, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা এখনো অপরিণত ও অপূর্ণ। বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা এক্ষেত্রে এখনো পথিকৃৎ, এখনো দিশারিতুল্য, উজ্জ্বল দীপশিখার মতো। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ক্ষেত্রকে নৈতিকতার আবরণমুক্ত করে অগ্রসরমান মানবগোষ্ঠী যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তা যে কোনো মুহূর্তে সমগ্র মানবসমাজকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিতে পারে। তখন কিন্তু বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষাব্যবস্থাই হতে পারে একমাত্র উজ্জ্বল আলোকরশ্মি। এই শিক্ষার আলোয় আলোকিত মানুষদের নিয়েই হজরত মুহাম্মদ (সা.) সকল জাতি ধর্মের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে এক জাতিকে পরিণত করেছিলেন। হজরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ প্রেরিত রাসূল এবং একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রধান হওয়ার পরও তিনিই প্রথম লিখিতভাবে ঘোষিত করেছিলেন, 'মদীনা রাষ্ট্রের উম্মাহ শুধু মুসলমানদের নয়, নয় কুরাইশদের অথবা মুহাজির ও আনসারদের। এই উম্মাহ সকলের। ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের। যে যার ধর্ম অনুসরণ করবে, কিন্তু জাতি হিসেবে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে সকলেই কৃতসঙ্কল্প।'

লেখক : প্রবীণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সাবেক ভিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আল কুরআনে সীরাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

-অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

ইসলামী বিশ্বকোষে 'সিরাত'-এর বেশ কিছু অর্থ উল্লেখ করেছে। তম্মধ্যে মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনচরিত; সম্প্রসারিত অর্থে বীরপুর"ষদের কীর্তির বর্ণনা অর্থটি উল্লেখযোগ্য। কুরআনের বিভিন্ন সূরায় রাসূল (সা.) সম্বন্ধে নানা ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য আছে। অন্যদিকে হাদীস শরীফে রাসূল (সা.)-এর জীবনের সবদিক ও বিভাগের খুঁটিনাটি বর্ণিত হয়েছে।

'কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র', হজরত আয়েশা (রা.)। কুরআন মাজীদের আয়াতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনচরিত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কিত আয়াতগুলো নিবিড়ভাবে খুঁজে বের করলে রাসূলের সীরাত বুঝতে মোটেও অসুবিধা হবে না। আল কুরআনে বর্ণিত রাসূলের সীরাত সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় কোনো সন্দেহ নেই। এরকম একটা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা পাঠক পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরা হলো–

১. নৈতিকতার অতি উচ্চমর্যাদায় সমাসীন

নিঃসন্দেহে তুমি নৈতিকতার অতি উচ্চমর্যাদায় সমাসীন? (সূরা কলম : ৪)। হজরত মুহাম্মাদ (সা.) নৈতিক চরিত্রের সর্বোচ্চ মানের ওপর অধিষ্ঠিত। তাই তিনি আল্লাহর বান্দাদের হিদায়াতের কাজে এত দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। একজন দুর্বল নৈতিক চরিত্রের মানুষ এ কাজ করতে সক্ষম হতো না। অন্যটি হলো, কাফেররা তার প্রতি পাগল হওয়ার যে অপবাদ আরোপ করেছে তা মিথ্যা হওয়ার আরেকটি সুস্পষ্ট প্রমাণ তার উন্নত নৈতিক চরিত্র। কারণ উন্নত নৈতিক চরিত্র ও মস্তিষ্ক বিকৃতি একসাথে একই ব্যক্তির মধ্যে থাকতে পারে না। যার বুদ্ধি-বিবেক ও চিন্তার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে এবং মেজাজে সমতা নেই সেই পাগল। পক্ষান্তরে মানুষের উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রমাণ করে যে, তার মস্ি"ষ্ক ও বিবেক-বুদ্ধি ঠিক আছে এবং সে সুস্থ ও স্বাভাবিক। তার মন-মানস ও মেজাজ অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নৈতিক চরিত্র কেমন তা মক্কার প্রতিটি বিবেকসম্পন্ন মানুষ চিন্তা করতে বাধ্য হবে যে, তারা কতই নির্লজ্জ। নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে এত উন্নত একজন মানুষকে তারা পাগল বলে আখ্যায়িত করেছে। তাদের এ অর্থহীন কথাবার্তা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য নয় বরং তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর। কারণ শত্রুতার আক্রোশে উন্মাত্ত হয়ে তারা তাঁর সম্পর্কে এমন কথা বলেছিল, যা কোনো বিবেকবান ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারে না। এ যুগের জ্ঞান-গবেষণার দাবিদারদের ব্যাপারও ঠিক তাই। তারাও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি রোগগ্রস্ত ও বিকৃত মস্তিষ্ক হওয়ার অপবাদ আরোপ করছে। দুনিয়ার সব জায়গায় কুরআন শরীফ পাওয়া যায় এবং নবী (সা.)-এর জীবন বৃত্তান্তও সবিস্তারে লিপিবদ্ধ আছে। যে কোনো লোক তা অধ্যয়ন করলেই বুঝতে পারবে, যে এ অনুপম গ্রন্থ পেশকারী এবং এরূপ উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী মানুষটিকে মানসিক রোগী বলে আখ্যায়িত করে তারা শত্রুতার অন্ধ আবেগে আক্রান্ত হয়ে কি ধরনের অর্থহীন ও হাস্যকর প্রলাপ বকে চলেছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নৈতিক চরিত্রের সর্বোত্তম সংজ্ঞা দিয়েছেন হজরত আয়েশা (রা.)। তিনি বলেছেন, অকানা কুল্লুকুহুল কুরআন– কুরআনই ছিলো তাঁর চরিত্র। ইমাম আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী ও ইবনে জারীর সামান্য কিছু শাব্দিক তারতম্যসহ তাঁর এ বাণীটি বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। এর মানে রাসূলুল্লাহ (সা.) দুনিয়ার সামনে শুধু কুরআনের শিক্ষাই পেশ করেননি। বরং তিনি নিজেকে তার জীবন্ত নমুনা হিসেবে পেশ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কুরআনে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে সবার আগে তিনি নিজে সে মোতাবিক কাজ করেছেন। এতে যেসব বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে, তিনি নিজে তা সবার আগে বর্জন করেছেন। কুরআন মজীদে যে নৈতিক গুণাবলীকে মর্যাদার কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেসব গুণে তিনি ছিলেন সবার চেয়ে বেশি গুণান্বিত। আল কুরআন মজীদে যেসব বিষয়কে অপছন্দনীয় আখ্যায়িত করা হয়েছে তিনি নিজে ছিলেন তা থেকে সবচেয়ে বেশি মুক্ত। আরেকটি বর্ণনায় হজরত আয়েশা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো কোনো খাদেমকে মারেননি, কোনো নারীর গায়ে হাত তোলেননি, জিহাদের ক্ষেত্র ছাড়া নিজ হাতে কখনো কাউকে হত্যা করেননি।

তাঁকে কেউ কষ্ট দিয়ে থাকলে তিনি কখনো তার প্রতিশোধ নেননি। কেবল আল্লাহর হারাম করা বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করলে তিনি তার শাস্তি দিয়েছেন। তাঁর নীতি ছিল, কোনো দু'টি বিষয়ের একটি গ্রহণ করতে হলে তা যদি গোনাহের কাজ না হতো, তাহলে তিনি সহজতর বিষয়টি গ্রহণ করতেন। গোনাহের কাজ থেকে তিনি সবচেয়ে বেশি দূরে থাকতেন। (মুসনাদে আহমাদ)। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, আমি দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। আমার কোনো কাজ সম্পর্কে তিনি কখনো উহ! শব্দ পর্যন্ড় উচ্চারণ করেননি। আমার কোনো কাজ দেখে কখনো বলেননি, তুমি এ কাজ করলে কেন? কিংবা কাজ না করলে কখনো বলেননি, তুমি এ কাজ করলে না কেন? (বুখারী ও মুসলিম)। সীরাতে ইবনে হিশাম সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বাংলা অনুবাদ পৃষ্ঠা-১৯২ দেখুন। (অনুবাদক)।

২. তিনি কারোর পিতা নন, তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী

(হে লোকেরা!) মুহাম্মদ তোমাদের পুর"ষদের মধ্য থেকে কারোর পিতা নন, কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী আর আল্লাহ সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন? (সূরা আহযাব : ৪০)। এখানে তিনটি বক্তব্য– ১. তিনি কারোর পিতা নন, ২. তিনি আল্লাহর রাসূল এবং ৩. তিনি শেষ নবী।

বিরোধীদের প্রথম অভিযোগ ছিল, তিনি নিজের পুত্রবধূকে বিয়ে করেন, অথচ তাঁর নিজের শরীয়াতেও পুত্রের স্ত্রী পিতার জন্য হারাম। এর জবাবে বলা হয়েছে, 'মুহাম্মদ তোমাদের পুর"ষদের কারো পিতা নন।' অর্থাৎ যে ব্যক্তির তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা হয়েছে তিনি মুহাম্মদ (সা.)-এর পুত্রই ছিলেন না, কাজেই তার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম হবে কেন? 'কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল।' অর্থাৎ রাসূল হওয়ার কারণে তাঁর ওপর এ দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়েছিল যে তোমাদের রসম-রেওয়াজ যে হালাল জিনিসটিকে অযথা হারাম গণ্য করে রেখেছে সে ব্যাপারে সবরকমের স্বার্থপ্রীতির তিনি অবসান ঘটিয়ে দেবেন এবং তার হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশই রাখবে না।

'তিনি শেষ নবী', অর্থাৎ যদি কোনো আইন ও সামাজিক সংস্কার তাঁর আমলে প্রবর্তিত না হয়ে থাকে তাহলে তাঁর পরে আগমনকারী নবী তার প্রবর্তন করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর পরে আর কোনো রাসূল তো দূরের কথা কোনো নবীই আসবেন না। কাজেই তিনি নিজেই জাহেলিয়াতের এ রসমটির মূলোচ্ছেদ করে যাবেন, এটা আরো অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। 'আল্লাহ প্রত্যেটি বিষয়ের জ্ঞান রাখেন।' অর্থাৎ আল্লাহ জানেন, এখন আর তাঁর পক্ষ থেকে কোনো নবী আসবেন না, কাজেই নিজের শেষ নবীর মাধ্যমে তিনি এ রসমটিকে উৎখাত করেন।

৩. আল্লাহর রাসূল সকল মানুষের জন্য

'হে নবী! বলে দাও, হে মানবজাতি, আমি হচ্ছি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল।' (সূরা আল আ'রাফ : ১৫৮)। তোমাকে কেবল এ শহর ও এ যুগের লোকদের জন্য নয়, বরং সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য তোমাকে চিরন্তন নবী হিসেবে পাঠান হয়েছে। কিন্তু তোমার এ সমকালীন স্বদেশীয় লোকেরা তোমার মর্যাদা বুঝে না। কত বড় মহান সত্তাকে তাদের মধ্যে পাঠান হয়েছে সে ব্যাপারে কোনো অনুভূতিই তাদের নেই।

নবী করীম (সা.)-কে কেবল তাঁর নিজের দেশ বা যুগের জন্য নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য পাঠানো হয়েছে, এ কথা কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, 'আর আমার প্রতি এ কুরআন অহির সাহায্যে পাঠানো হয়েছে যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদের এবং যার কাছে এ বাণী পৌঁছে যায় তাকেই সতর্ক করে দেই। (আলে আন'আম : ১৫৭)।

'আর হে নবী! আমি পাঠিয়েছি তোমাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যই রহমত হিসেবে।' (আল আম্বিয়া : ১০৭)। 'বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি যিনি তার বান্দার ওপর ফুরকান নাজিল করেছেন যাতে সে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারীতে পরিণত হয়।' (আল ফুরকান, ১)। নবী (সা.) নিজেই এই একই বক্তব্য বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্নভাবে পেশ করেছেন। যেমন– 'আমাকে সাদা-কালো সবার কাছে পাঠান হয়েছে।' (মুসনাদে আহমাদ, আবু মুসা আশ'আরী বর্ণিত)।

'আমাকে ব্যাপকভাবে সমস্ত মানুষের কাছে পাঠান হয়েছে। অথচ আমার আগে যে নবীই অতিক্রান্ত হয়েছেন তাকে তার জাতির কাছে পাঠানো হতো।' (মুসনাদে আহমাদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণিত)। 'প্রথমে নবীকে বিশেষভাবে তার জাতির কাছে পাঠান হত আর আমাকে সমগ্র মানবজাতির জাতির কাছে পাঠান হয়েছে।' (বুখারী ও মুসলিম, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত)। 'আমার আগমন ও কিয়ামতের অবস্থান এরূপ এ কথা বলতে গিয়ে নবী (সা.) নিজের দুটি আঙুল উঠান।' (বুখারী ও মুসলিম)। এর অর্থ এই ছিল যে, 'এ দু'টি আঙুলের মাঝখানে যেমন তৃতীয় কোনো আঙুলের অন্তরাল নেই, ঠিক তেমনি আমার ও কিয়ামতের মাঝখানে ও অন্য কোনো নবুয়্যতের অন্ড়রাল নেই। আমার পরে এখন আর শুধু রয়েছে কিয়ামত এবং কিয়াতম পর্যন্ড় আমিই নবী ও রাসূল হিসেবে থাকব।'

৪. তোমাকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী করে পাঠিয়েছি

আর আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী করে পাঠিয়েছি, কিন্তু বেশিরভাগ লোক জানে না? (সূরা সাবা : ২৮)। আমি কোনো অভিনব রাসূল নই। এদের বলো, 'আমি কোনো অভিনব রাসূল নই? কাল তোমাদের সাথে কী আচরণ করা হবে এবং আমার সাথেই বা কী আচরণ করা হবে তা আমি জানি না? আমি তো কেবল সেই অহির অনুসরণ করি, যা আমার কাছে পাঠানো হয় এবং আমি সুস্পষ্ট সাবধানকারী ছাড়া আর কিছুই নই?' (সূরা আহকাফ : ৯)।

নবী (সা.) যখন নিজেকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে পেশ করলেন তখন মক্কার লোকেরা এ কথা শুনে নানা রকম কথা বলতে শুর" করলো। তারা বলতো, এ আবার কেমন রাসূল যার সন্তানাদি আছে, যে বাজারে যায়, পানাহার করে এবং আমাদের মতো মানুষের ন্যায় জীবনযাপন করে। তাহলে তার মধ্যে আলাদা কী বৈশিষ্ট্য আছে, যেদিক দিয়ে সে সাধারণ মানুষের চেয়ে ভিন্ন এবং যার ফলে আমরাও বুঝতে পারবো যে, আল্লাহ বিশেষভাবে এই ব্যক্তিকেই তাঁর রাসূল বানিয়েছেন?

তারা আরো বলতো, আল্লাহ যদি এই ব্যক্তিকেই তাঁর রাসূল বানাতেন, তাহলে তার আরদালী হিসেবে কোনো ফেরেশতা পাঠাতেন। সেই ফেরেশতা ঘোষণা করতো, তিনি আল্লাহর রাসূল। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে সামান্যতম বেআদবিও করত সে তাকেই শাস্তিস্বরূপ বেত্রাঘাত করতো। আল্লাহ যাকে তার রাসূল হিসেবে নিয়োগ করবেন, তাঁকে মক্কার অলিতে-গলিতে এভাবে চলতে এবং সবরকম জুলুম-অত্যাচার বরদাশত করার জন্য অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবেন, তা কী করে হতে পারে? আর কিছু না হলেও অন্তত এতটুকু হতো যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলের জন্য একটি জাঁকালো রাজপ্রাসাদ এবং একটি সবুজ-শ্যামল তরতাজা বাগান তৈরি করে দিতেন। তাহলে তাঁর রাসূলের স্ত্রীর অর্থ-সম্পদ যখন নিঃশেষ হতো, তখন তাঁর অভুক্ত থাকার মতো পরিস্থিতি আসতো না এবং তায়েফ যাওয়ার জন্য সওয়ারী থাকতো।

গায়েবি বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চাইতো। তাদের ধারণায় কোনো ব্যক্তির আল্লাহর রাসূল হওয়ার অর্থ ছিল সে অতিমানবিক শক্তির মালিক হবে। তাঁর একটি ইঙ্গিত পাহাড় স্থানচ্যুত হবে, চোখের পলকে মরুভূমি শ্যামল-শস্য ক্ষেতে পরিণত হবে, অতীত ও ভবিষ্যৎ সবকিছু তাঁর জানা থাকবে এবং অদৃশ্য সবকিছু তাঁর কাছে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হবে। আয়াতটির ছোট ছোট অংশে এ কথাগুলোরই জবাব দেয়া হয়েছে।

একটি অংশে বলা হয়েছে, এদের বলো 'আমি অন্য রাসূলদের থেকে ভিন্ন কোনো রাসূল নই।' আমার পূর্বে বহু রাসূল এসেছিলেন। আমি তাদের থেকে আলাদা কিছু নই। পৃথিবীতে এমন কোনো রাসূল কখন এসেছেন যার সন্তানাদি ছিল না, কিংবা যিনি পানাহার করতেন না অথবা সাধারণ মানুষদের মতো জীবনযাপন করতেন না? কোন্ রাসূলের সাথে ফেরেশতা এসে তাঁর রিসালাতের ঘোষণা দিতো এবং তাঁর আগে আগে চাবুক হাতে চলতো? কোন্ রাসূলের জন্য বাগান ও রাজপ্রাসাদ তৈরি করে দেয়া হয়েছে এবং আমি যে দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করছি আল্লাহর পথে ডাকতে গিয়ে কে তা করেনি? এমন রাসূল কে এসেছিলেন, যিনি তাঁর ইচ্ছামতো মু'জিজা দেখাতে পারতেন কিংবা নিজের জ্ঞান দিয়েই সবকিছু জানতেন? তাহলে শুধু আমার রিসালাত পরখ করে দেখার জন্য এই অভিনব ও স্বতন্ত্র মানদণ্ড তোমরা কোথা থেকে নিয়ে আসছো?

জবাবে তাদের এ কথাও বলো, 'কাল তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে এবং আমার সাথেই বা কী আচরণ করা হবে, তা আমি জানি না।' আমি তো কেবল আমার কাছে প্রেরিত অহি অনুসরণ করি। অর্থাৎ আমি গায়েব নই যে, আমার কাছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবকিছু সুস্পষ্ট থাকবে এবং দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসই আমার জানা থাকবে। তোমাদের ভবিষ্যৎ তো দূরের কথা আমার নিজের ভবিষ্যৎও আমার জানা নেই। আমাকে অহির মাধ্যমে যে জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া হয়, আমি শুধু সেটাই জানি। এর চেয়ে বেশি জানার দাবি আমি কবে করেছিলাম এমন জ্ঞানের অধিকারী রাসূলই বা পৃথিবীতে কবে এসেছিলেন যে তোমরা আমার রিসালাত পরখ করার জন্য আমার গায়েবি জ্ঞানের পরীক্ষা নিতে চাচ্ছো। হারানো বস্তুর সন্ধান বলা, গর্ভবর্তী নারী পুত্রসন্তান প্রসব করবে না কন্যাসন্তান এবং রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে না মারা যাবে এসব বলা কবে থেকে কাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সব শেষে বলা হয়েছে, তাদের বলে দাও, আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই।

৫. পূর্ণ শক্তি দিয়ে কাফের ও মুনাফিকদের মোকাবিল করো

'হে নবী! পূর্ণ শক্তি দিয়ে কাফের ও মুনাফিক উভয়ের মোকাবিল করো এবং তাদের প্রতি কঠোর হও? শেষ পর্যন্ত তাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থান স্থল?' (তাওবা : ৭৩)। তাবুক যুদ্ধের আগে পর্যন্ত মুনাফিকদের কার্যকলাপের ব্যাপারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করা হচ্ছিল। এর দু'টি কারণ ছিল। এক. তখনো পর্যন্ত মুসলমানদের হাত এত বেশি শক্তিশালী হতে পারেনি যে, বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাথে সাথে তারা ভেতরের শত্রুদের সাথেও লড়াই করতে পারতো। দুই. যারা সন্দেহ-সংশয়ে ডুবে ছিল ঈমান ও প্রত্যয় লাভ করার জন্য তাদের যথেষ্ট সুযোগ দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য। এ দু'টি কারণ এখন আর বর্তমান ছিল না। মুসলিম শক্তি এখন সমগ্র আরব ভূখণ্ডকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে নিয়েছিল এবং আরবের বাইরের শক্তিগুলোর সাথে সংঘাতের সিলসিলা শুরু হতে যাচ্ছিল। এ কারণে ঘরের এ শত্রুদের মাথা গুঁড়া করে দেয়া এখন সম্ভবও ছিল এবং অপরিহার্যও হয়ে পড়েছিল। তাহলে তারা আর বিদেশি শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে দেশে আভ্যন্তরীণ বিপদ সৃষ্টি করতে পারতো না। তাছাড়া তাদের ৯ বছর সময় দেয়া হয়েছিল চিন্তাভাবনা করার, বুঝার এবং আল্লাহর সত্য দীনকে যাচাই-পর্যালোচনা করার জন্য। তাদের মধ্যে যথার্থ কল্যাণ লাভের কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকলে তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারতো। এরপর তাদের আরো বেশি সুযোগ-সুবিধা দেয়ার মুনাফিকদের বিরুদ্ধেও এবার জিহাদ শুরু করে দিতে হবে এবং এদের ব্যাপারে এ পর্যন্ত যে উদার নীতি অবলম্বন করা হয়েছে তার অবসান ঘটিয়ে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে হবে।

তাই বলে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ও কঠোর নীতি অবলম্বন করা মানে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নয়। আসলে এর অর্থ হচ্ছে, তাদের মুনাফিকী মনোভাব ও কর্মনীতিকে এ পর্যন্ত যেভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং যে কারণে তারা মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে থেকেছে, সাধারণ মুসলমানরা তাদের নিজেদের সমাজেরই একটি অংশ মনে করেছে এবং তারা ইসলামী দল ও সংগঠনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ও ইসলামী সমাজে মুনাফিকীর বিষ ছড়াবার যে সুযোগ পেয়েছে,

তা এখন ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে। এখন যে ব্যক্তিই মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে মুনাফিকী নীতি অবলম্বন করবে এবং যার কার্যধারা থেকে এ কথাও প্রকাশ হবে, যে সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুনিমদের অন্তরঙ্গ বন্ধু নয়, সর্বসমক্ষে তার মুখোশ খুলে দিতে হবে এবং নিন্দা করতে হবে। মুসলিম সমাজে তার মর্যাদা ও আস্থা লাভের সকল প্রকার সুযোগ খতম করে দিতে হবে। তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। দলীয় পরামর্শের ক্ষেত্রে থেকে তাকে দূরে রাখতে হবে। আদালতে তার সাক্ষ্য অনির্ভরযোগ্য গণ্য করতে হবে। বড় বড় পদ ও মর্যাদার দরজা তার জন্য বন্ধ করে দিতে হবে। সভা-সমিতিতে তাকে গুর"ত্ব দেবে না। প্রত্যেক মুসলমান তার সাথে এমন আচরণ করবে যাতে সে নিজে অনুভব করতে পারে যে, সমগ্র মুসলিম সমাজে কোথাও তার কোনো মর্যাদা ও গুর"ত্ব নেই এবং কারো অন্তরে তার জন্য এতটুকু সম্ভ্রমবোধও নেই। তারপর তাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো সুস্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে তার অপরাধ লুকানো যাবে না এবং তাকে ক্ষমা করাও যাবে না। বরং সর্বসমক্ষে তার বির"দ্ধে মোকদ্দমা চালাতে হবে এবং তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

এটি ছিল একটি অত্যন্ত গুর"ত্বপূর্ণ নির্দেশ। এ পর্যায়ে মুসলমানদের এ নির্দেশটি দেয়ার প্রয়োজন ছিল। এছাড়া ইসলামী সমাজকে অবনতি ও পতনের অভ্যন্তরীণ কার্যকারণ থেকে সংরক্ষণ করা সম্ভব হতো না। যে জামায়াত ও সংগঠন তার নিজের মধ্যে মুনাফিক ও বিশ্বাসঘাতকদের লালন করে এবং যেখানে দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা হয়, তার নৈতিক অধপতন এবং সবশেষে পূর্ণ ধ্বংস ছাড়া গত্যন্ড়র নেই। মুনাফিকী প্লেগের মতো একটি মহামারী। আর মুনাফিক হচ্ছে এমন একটি ইঁদুর যে এ মহামারীর জীবাণু বহন করে বেড়ায়। তাকে জনবসতির মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সুযোগ দেয়ার অর্থ গোটা জনবসতিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া। মুসলমানদের সমাজে একজন মুনাফিকদের মর্যাদা ও সম্ভ্রম লাভ করার অর্থ হলো হাজার হাজার মানুষকে বিশ্বাসঘাতকতা ও মুনাফিকী করতে দুঃসাহস জোগানো। এতে সাধারণ্যে এ ধারণা বিস্তার লাভ করে যে, এ সমাজে মর্যাদা লাভ করার জন্য আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও সাচ্চা ঈমানদারীর কোনো প্রয়োজন নেই। বরং মিথ্যা ঈমানদের প্রদর্শনীর সাথে খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতার পথ অবলম্বন করেও এখানে মানুষ ফুলেফেঁপে বড় হয়ে উঠতে পারে। এ কথাটিই রাসূলুল্লাহ (সা.) তার একটি সংক্ষিপ্ত জ্ঞান-গর্ভ বক্তব্যের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো বিদআতপন্থীকে সম্মান করলো সে আসলে ইসলামের ইমারত ভেঙে ফেলতে সাহায্য করলো।' (প্রবন্ধটির সম্পাদনা তাফহীমুল কুরআন থেকে, কৃতজ্ঞতা ও দোয়া তাফহীমুল কুরআন ও তার লিখক আল্লামা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী রহ.-এর জন্য)।

লেখক : ভারপ্রাপ্ত আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও সাবেক সংসদ সদস্য।

দা'য়ী ইলাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)
-আবদুস শহীদ নাসিম

১. দা'য়ী ইলাল্লাহ রাসূল (সা.) : মহান আল্লাহ মুহাম্মদ (সা.)-কে যেসব দায়িত্ব দিয়ে রাসূল নিযুক্ত করেছেন, তন্মধ্যে অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিলো দাওয়াত ইলাল্লাহ বা মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের দায়িত্ব পালন। তাঁর ওপর অর্পিত এই গুরুদায়িত্ব এবং প্রাসঙ্গিক দায়িত্বসমূহের উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, আর আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী হিসেবে এবং আলো বিতরণকারী উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে। তুমি মুমিনদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রয়েছে বিরাট অনুগ্রহ। তুমি অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের আনুগত্য করোনা এবং তাদের দেয়া কষ্ট উপেক্ষা করো, আর তাওয়াক্কুল করো আল্লাহ্‌র ওপর। দায়িত্বশীল ও কার্যসম্পাদনকারী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।' (সূরা আলে ইমরান : ৪৫-৪৮)।

২. দা'য়ী ইলাল্লাহ হিসেবে মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য : উপরোল্লিখিত কয়টি আয়াতে রাসূল হিসেবে মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর দা'য়ী ইলাল্লাহ হিসেবে আল্লাহ্‌ তায়ালা যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করেছেন, সেসব দায়িত্বেরই কয়েকটি তিনি উল্লেখ করেছেন। এখানে তাঁকে যেসব দায়িত্ব পালনের নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলো হলো– ১. শাহেদ : সাক্ষী। এর প্রকৃত মর্ম হলো, দা'য়ী ইলাল্লাহ হিসেবে নিজেকে দ্বীনের বাস্তব নমুনা, মূর্তপ্রতীক ও সাক্ষী হিসেবে মানুষের সামনে পেশ করা; ২. মুবাশ্‌শির : এর অর্থ- সুসংবাদদাতা, সুসংবাদবাহক। অর্থাৎ এই আহ্বান গ্রহণ করার ফায়দা ও কল্যাণ সম্পর্কে মানুষকে সুসংবাদ প্রদান করা; ৩. নাজির : সতর্ককারী। অর্থাৎ এই আহ্বানে সাড়া না দিলে যে মহাক্ষতি ও অকল্যাণ হবে, সে বিষয়ে সতর্ক করা; ৪. দা'য়ীয়ান ইলাল্লাহ : অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী বা দাওয়াতদানকারী; ৫. সিরাজাম মুনিরা : আলো ছড়ানো উজ্জ্বল প্রদীপ। এছাড়া কর্তব্য হিসেবেও তাঁকে কিছু কাজের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সেগুলো হলো– ১. আল্লাহ্‌র রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা নিজেদের ঈমানের অমিয় সুধায় সিক্ত করেন, তাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল তাঁর অনুগ্রহের সুসংবাদ প্রদান করা; ২. অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের আনুগত্য-অনুসরণ না করা;

৩. কাফির ও কপট-বিশ্বাসীদের দেয়া কষ্ট-যাতনা ধৈর্যের সাথে উপেক্ষা করা; ৪. সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা (তাওয়াক্কুল) করা; ৫. কার্যসম্পাদনকারী (উকিল) হিসেবে আল্লাহ্‌কেই যথেষ্ট মনে করা।

৩. রাসূল এবং তাঁর উম্মতের দায়িত্ব মিশনারি দায়িত্ব : মহান আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আল্লাহর দিকে মানব সমাজকে দাওয়াত প্রদানের যে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা পুরোপুরি মিশনারি দায়িত্ব। এ দায়িত্ব এক অবিরাম প্রক্রিয়া। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) যথাযথভাবে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করে গেছেন, আল্লাহ্‌র দ্বীনকে মানব সমাজে পরিপূর্ণভাবে প্রবর্তন করে গেছেন। আর মহান আল্লাহ্ তাঁর দায়িত্ব পূর্ণরূপে সম্পাদনের স্বীকৃতিও তাঁকে প্রদান করেছেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্যে পূর্ণ করে দিলাম তোমাদের দ্বীন, পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত (আল কুরআন) এবং তোমাদের জন্যে দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) মনোনীত করলাম ইসলামকে।' (সূরা মায়িদা : ৩)।

রাসূলুল্লাহর (সা.) মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌পাক দাওয়াতের এই মহান মিশনারি দায়িত্ব পালনের ভার তাঁর উম্মতের ওপর অর্পণ করেছেন, 'তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির (কল্যাণের) উদ্দেশ্যে। (তোমাদের দায়িত্ব হলো) তোমরা মানব সমাজকে ভালো কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আস্থা রাখবে।' (সূরা আলে ইমরান : ১১০)। 'তোমাদের মধ্যে অবশ্যই এমন একদল লোক থাকতে হবে, যারা (মানুষকে) আহ্বান করবে কল্যাণের দিকে, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং নিষেধ করবে মন্দ কাজ থেকে। আর তারাই হবে সফলকাম।' (সূরা আলে ইমরান : ১০৪)। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আজ মুসলিম উম্মাহ্‌র অধঃপতনের মূল কারণ আল্লাহ্ প্রদত্ত এই মিশনারি দায়িত্ব পালন থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া।

৪. প্রত্যেক মুসলিমকে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র দায়িত্ব পালন করতে হবে : মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে যে পাঁচটি দায়িত্ব তাঁর মিশন হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রত্যেক সদস্যকেও নিজ নিজ যোগ্যতা ও সামর্থ্যানুযায়ী সে দায়িত্বগুলো পালন করতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিমই তার সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী– ১. মুখে এবং কর্ম ও আচরণের মাধ্যমে ইসলামের বাস্তব সাক্ষ্য ও নমুনা পেশ করবেন; ২. ইসলাম গ্রহণ করার এবং ইসলামের পথে চলার সুফল সম্পর্কে মানবসমাজকে সুসংবাদ দেবেন; ৩. এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান না আনার এবং ইসলামের ভিত্তিতে জীবনযাপন না করা চরম দুঃখময় পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করবেন; ৪. মানুষকে নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পথে আসার জন্যে অহর্নিশি আহ্বান জানাবেন; ৫. নিজেকে ইসলামের আলো বিতরণকারী উজ্জ্বল প্রদীপ (সিরাজাম মুনিরা) হিসেবে গড়ে তুলে দাওয়াতের এই মহান মিশনারি দায়িত্ব পালন করে যাবেন।

৫. রাসূলুল্লাহ (সা.) কীভাবে দ্বীনের সাক্ষ্য ও নমুনা পেশ করেছেন? : মহান আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তিন ধরনের সাক্ষ্য ও নমুনা পেশ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন–

মৌখিক সাক্ষী : আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে অহি ও কিতাবের মাধ্যমে ঈমান ও ইসলামের যে শিক্ষা ও রূপরেখা দিয়েছেন, তা হুবহু তিনি মানুষের সামনে সত্য বলে পেশ করেছেন, মানুষকে স্পষ্ট করে তা বলে দিয়েছেন। এর সাথে সাংঘর্ষিক এবং এর বিপরীত সমস্ত বিশ্বাস ও মতবাদ যে বাতিল ও মিথ্যা তা পরিষ্কার করে মানুষকে বলে দিয়েছেন। সমস্ত সত্য, ন্যায় ও কল্যাণকর মূলনীতি, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি মানব সমাজের কাছে পরিষ্কার করে পেশ করেছেন। আল্লাহ্‌র শরিয়ত প্রদত্ত সমস্ত হালাল হারাম মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া মানুষের সর্বপ্রকার বিরোধিতা উপেক্ষা করে একাজ করে গেছেন। এসবই তাঁর মৌখিক সাক্ষ্যের মৌলিক কথা। তাঁর এ দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, 'তোমার প্রতি তোমার প্রভুর যে কিতাব অহি করা হয়েছে তুমি তা তিলাওয়াত (বর্ণনা) করো। তাঁর বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই। তুমি কখনো তাঁকে ছাড়া আর কোনো আশ্রয় পাবে না।' (আল কুরআন ১৮ : ২৭)।

বাস্তব সাক্ষী বা কর্মের সাক্ষী : আল্লাহ্ প্রদত্ত মহাসত্য নীতি ও আদর্শ মৌখিকভাবে মানবসমাজের কাছে তুলে ধরার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ নিজের বাস্তব জীবনের সর্বক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে সেগুলো পালন করে এবং মেনে চলে নিখুঁত নজির ও নমুনা উপস্থাপন করে বাস্তবে ইসলামের নমুনা ও সাক্ষ্য পেশ করে গেছেন। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'এভাবে আমরা তোমাদের বানিয়েছি একটি 'মধ্যপন্থী উম্মাহ', যাতে করে তোমরা বিশ্ববাসীর জন্যে সাক্ষী হতে পারো এবং যেন রাসূল হয় তোমাদের জন্যে সাক্ষী।' (সূরা বাকারা : ১৪৩)।

পরকালে আল্লাহ্‌র আদালতে সাক্ষী : পরকালে প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই আল্লাহ্‌র আদালতে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে, তাঁকে আল্লাহ্ তায়ালা যে সত্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন কিনা? রাসূলুল্লাহ (সা.)ও আদালতে আখিরাতে এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'সেদিন আমরা প্রত্যেক জাতি থেকে তাদের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী দাঁড় করাবো আর তোমাকে নিয়ে আসবো এদের বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে।' (আল কুরআন ১৬ : ৮৯)।

৬. তিনি কোন্ দিকে এবং কীভাবে দাওয়াত দিয়েছেন? : আল্লাহপাক সাক্ষী হিসেবে তাঁর দ্বীনের যে মিশনারি দায়িত্ব পালনের ভার তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন এবং তাঁর উম্মতকে দিয়েছেন, তা মূলত এক সর্বব্যাপী দাওয়াতি কাজ। তাই তিনি

মানবসমাজকে কোন্ দিকে আহ্বান করবেন, কীভাবে করবেন, তা-ও মহান আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন, 'তুমি মানুষকে দাওয়াত দাও তোমার প্রভুর দিকে এবং তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' (আল কুরআন ২৮ : ৮৭)। 'এমতাবস্থায় তুমি (সরাসরি কেবল আল্লাহ্র দ্বীনের দিকেই) মানুষকে আহ্বান করো এবং এর ওপর অটল-অবিচল থাকো, যেভাবে তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' (আল কুরআন ৪২ : ১৫)। 'তোমার প্রভুর পথের দিকে মানুষকে দাওয়াত দাও হিকমত এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।' (সূরা নাহত : ১২৫)। 'ঐ ব্যক্তির চাইতে সুন্দর কথা আর কে বলে, যে মানুষকে দাওয়াত দেয় আল্লাহ্র দিকে এবং উত্তম আমল করে, আর বলে, নিশ্চয়ই আমি একজন মুসলিম (আল্লাহ্র অনুগত)।' (সূরা হামিম আস্ সাজদা : ৩৩)।

ফেরাউন যখন মূসা (আ.)-কে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন তারই এক সভাসদ নিজের ঈমান প্রকাশ করে ফেরাউনের সামনেই জাতির উদ্দেশে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। কুরআনে তার সেই ভাষণ উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষণে তিনি এ কথাও বলেন, 'হে আমার কওম! এটা কেমন ব্যাপার, আমি তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছি মুক্তির দিকে; অথচ তোমরা আমাকে ডাকছো জাহান্নামের দিকে! তোমরা আমাকে দাওয়াত দিচ্ছো, যেন আমি আল্লাহ্র প্রতি কুফরি করি এবং তাঁর সাথে শিরক করি, যে ব্যাপারে আমার কোনো এলেম নেই। অথচ আমি তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছি মহাপরাক্রমশালী অতীব দয়াবানের দিকে।' (সূরা মুমিন : ৪১-৪২)। এই মহান ব্যক্তি ছিলেন মূসা (আ.)-এর সাহাবি। রাসূলুল্লাহ (সা.)ও এ কথাগুলোই তাঁর জাতিকে বলেছেন এবং তাঁর অনুসারীদের এভাবে দাওয়াত দিতে শিক্ষা দিয়েছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আলী ও মুয়ায (রা.)-কে ইয়েমেন যাত্রা করার নির্দেশ দেন। তিনি তাদের বলেন, তোমরা যাও, মানুষকে সুসংবাদ দেবে, ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেবে না। সহজ করে উপস্থাপন করবে, কঠিন করে পেশ করবে না। কারণ আমার প্রতি নাজিল হয়েছে, 'হে নবী! আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে...।' (সূত্র : ইবনে আবি হাতিম)

৭. রাসূলুল্লাহ্র (সা.) দাওয়াত দান পদ্ধতি : কুরআন ও হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের পদ্ধতি বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর দাওয়াত দান পদ্ধতির কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো– ১. তিনি মানুষকে ডাকতেন আল্লাহর দিকে; ২. তিনি প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে দাওয়াত দিতেন; ৩. তিনি মর্মস্পর্শী উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত দিতেন; ৪. তিনি সুন্দরভাবে হাসিমুখে যুক্তি দিয়ে কথা বলতেন; ৫. তিনি রাতদিন সবসময়ই দাওয়াতি কাজ করতেন; ৬. তিনি গোপনে গোপনে (ব্যক্তিগত কন্টাক্টের মাধ্যমে) দাওয়াত দিতেন; ৭. তিনি প্রকাশ্য সভায় দাওয়াত দিতেন; ৮. তিনি মানুষকে উৎসাহ প্রদান করতেন; ৯. তিনি কট্টরপন্থা অবলম্বন করে মানুষকে দূরে ঠেলে দিতেন না; ১০. তিনি বক্তব্য সহজভাবে উপস্থাপন করতেন এবং ১১. তিনি মন্দের জবাব দিতেন ভালো দিয়ে।

৮. দা'য়ী ইলাল্লাহ হিসেবে রাসূলুল্লাহর (সা.) গুণাবলী : কুরআন মজিদ থেকে জানা যায়, দা'য়ী ইলাল্লাহ্ হিসেবে মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন– ১. সত্যের সাক্ষী (নমুনা); ২. সুসংবাদদাতা; ৩. সতর্ককারী; ৪. সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত; ৫. সুন্দর বাচনভঙ্গির অধিকারী; ৬. নেক আমলকারী; ৭. আল্লাহর অনুগত; ৮. মুক্তির দিকে আহ্বানকারী; ৯. দীনের পথে আহ্বানের কাজে অটল; ১০. ইসলামী আদর্শের বাস্তব নমুনা; ১১. বিরোধীদের দেয়া কষ্ট উপেক্ষাকারী এবং ১২. আল্লাহর ওপর ভরসাকারী।

লেখক : বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ।

মহানবী (সা.) এবং মুসলিম উম্মাহ

-অধ্যাপক আবু জাফর

পৃথিবীটা খুব তেমন একটা বাসযোগ্য পৃথিবী নয়। এখানে ভালো মানুষরা ভালো থাকে না; তারা অস্বস্ড়ি ও নানামুখী অশান্ড়ির মধ্যেই দিনযাপন করতে বাধ্য হয়। মন্দ ও অমানুষরাই এখানে ভালো থাকে। দৃশ্যত এবং বস্তুতই খারাপ মানুষদের জন্য পৃথিবী অনেকটা স্বর্গস্বরূপ। তবে এটা সত্য যে, পৃথিবীকে যত নিন্দামন্দ-সমালোচনাই করা যাক, তাকে পুরোপুরি খারাপ বলা চলে না কারণ পৃথিবী কোন স্থায়ী আবাসস্থল নয়, ঈমানদার-উৎকৃষ্ট মানুষদের জন্য প্রকৃত ও চিরস্থায়ী বাসস্থান হলো জান্নাত এবং বেঈমান নিকৃষ্টদের জন্য অনন্ড়দিনের জাহান্নাম। তবে এটাও সত্য যে, পৃথিবী আদর্শ কোনো স্থান নয় বটে, কিন্তু নিরঙ্কুশ খারাপও নয়। কারণ এই আমাদের পৃথিবী যেখানে আল্লাহপাক নিজ অনুগ্রহে তাঁর শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত মহানবী (সা.)-কে পাঠিয়েছেন, এমন পৃথিবীকে অসম্পূর্ণ ও অস্বস্ড়িকর ভেবে খারাপ বলে অভিহিত করা সমীচীন নয়। সমীচীন নয়, কারণ একজন মহামানবের চরণস্পর্শে ধণ্য এই পৃথিবী একেবারে আক্ষরিক অর্থেই জান্নাতের উপমা। কোনরূপ অত্যুক্তি নয়, পৃথিবীর জন্য রাসূল (সা.)-এর সৌরভ ও সুষমা এই অর্থই বহন করে। নমর"দ ও ফেরাউন, আবু জেহেল ও আবু লাহাব বিশ্ব-ইতিহাসকে যতই কন্টকিত কর"ক, যতই সর্পিল ও পিচ্ছিল করে তুলুক, এই সত্য চিরদিনের

জন্য জ্যোতিষ্মান যে, রাসূল (সা.) যে-বিশ্বে একবার পদার্পণ করেছেন সেই বিশ্ব লক্ষ্য সূর্যের প্রদীপ্ত আলোয় মহিমান্বিত এবং এই মহিমা সরবে নীরবে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে আছে ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে। এইজন্যই কবি ইকবাল বড় সুন্দর করে বলেছেন, 'খিরা না কর সাকা মুঝে জলওয়ায়ে দানিশ-এ-ফারাঙ্গ, সুরমা হায় মেরি আঁখো কা খাকে মদীনা ও নজফ' পাশ্চাত্যের চাকচিক্য ও জৌলুস আমাকে বিভ্রান্ড় করতে পারেনি, কারণ আমার দুচোখে সুরমা হয়ে জড়িয়ে ছিল নজফ ও মদীনার ধূলিকণা।

(২)

মুসলিম উম্মাহর বড় দুর্দিন, বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহ আজ বড় কঠিন দুঃসময় ও বদনসীবের শিকার। অথচ এরকমটি হওয়ার কথা নয়। কারণ আল্লাহপাকের শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত যে-রাসূল (সা.) তাঁর প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার নিয়ে মুসলিম উম্মাহর চিরদিন বিশ্বপটে মাথা উঁচু করে অবস্থান করার কথা; খোশনসী কোনোদিনই অস্ড়মিত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু যা-হবার তাই-ই হলো। অথচ আল্লাহপাক কত পরিষ্কার ভাবেই-না নিশ্চয়তা দিয়েছেন, 'ওয়া ছাখখারা লাকুম মাফিস সামাওয়াতি ওয়া মাফিল আরদি জামিয়াম মিনহু' (সুরা জাছিয়া)। আসমান সমূহ ও জমিনের মধ্যস্থিত সমস্ড় কিছুই আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন (সুরা জাছিয়া)। মহান আল্লাহপাক কর্তৃক বিঘোষিত এমন অনুগ্রহের পরও মুসলিম উম্মাহ আজ বিশ্বব্যাপী উপেক্ষা ও কর"ণার শিকার। এই অবস্থা কোনো দৈব-দুর্ঘটনা নয়, এই অবস্থা মুসলিম উম্মাহর নিজস্ব উপার্জনের ফল।

(৩)

যাই হোক, এই দুর্ভাগ্যজনক শোচনীয় অবস্থার জন্য মুসলমান নিজেই দায়ী যাকে আত্মঘাত বললেও অত্যুক্তি হয় না। মুসলমান আসলে নিজের আত্মপরিচয়কে রীতিমতো বিকৃত করে ফেলেছে, যে কারণে কবি ইকবাল বলেছিলেন, ইসলাম হলো 'most misunderstood Religion'। ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকে মুসলমান তার নিজ ধর্মকে শুধু বিস্মৃত হয় নি, আদ্যোপান্ড় বিকৃতও করে ফেলেছে এবং এমনভাবে এই বিস্মৃতি ও বিকৃতি সাধিত হলো যে, মুসলমানকে আজ আর মুসলমান বলে মনেই হয় না। সত্যই মনে হয় না। কারণ স্বভাবে ও আচরণে, চিন্ড়ায় ও আদর্শে, স্বপ্নে ও আকাঙ্ক্ষায় মুসলিম উম্মাহর অবস্থান এখন এত নিম্নে যে, তার অধঃপাত এখন আর কোনো আলোচনারই বস্তু নয়। তার মধ্যে না-আছে সততা ও ইনসাফ, না-আছে হিম্মত ও শৌর্যবীরত্ব। বর্তমান মুসলিম উম্মাহর মধ্যে আছে শুধু নিরেট পার্থিবতা, আছে হিংসা-বিদ্বেষ মিথ্যাচার ও মুনাফেকি, আছে লালসা ও লোলুপ স্বার্থান্ধতা। এই অবস্থাদৃষ্টেই ইকবাল সপরিতাপে বলেছেন, 'ইহ্ মুসলমাঁ হায় জিনহে দেখ্কে শরমাঁয়ে য়ুহুদ' এমন মুসলমান যাকে দেখে ইহুদিরা পর্যন্ড় লজ্জা পায়।

কিন্তু কেন মুসলিম উম্মাহর এই অকথ্য অবস্থা? অবস্থা যদিও ভয়াবহ কিন্তু কারণ তেমন অভিনব কিছু নয়। ইসলাম কী এবং মুসলমানিত্বের প্রকৃত পরিচয় কী, এই প্রশ্নের মধ্যেই মুসলিম উম্মাহর অধঃপতন ও বিশ্বব্যাপী উপেক্ষা ও পরাভবের কারণ নিহিত। আল্লাহপাকের প্রতি অংশীবাদমুক্ত নিরঙ্কুশ ঈমান, আখিরাতের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং রাসূল (সা.)-এর জীবন ও সুন্নাহর প্রতি নিরঙ্কুশ ও অবিভাজ্য আনুগত্য– এ তিনের সমন্বয়েই ইসলাম ও মুসলমানিত্ব। অতএব মুসলমানের মধ্যে যদি এই বৈশিষ্ট্য জাগর"ক না থাকে, তাহলে সে আর মুসলমানই থাকে না। এমতাবস্থায় দুর্ভাগ্যের অতল তলে হারিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কী অবশিষ্ট থাকে!

রাসূল (সা.)-এর শাশ্বত পথনির্দেশনা থেকে স্বেচ্ছাবিমুখ ও স্বেচ্ছা মাহর"ম মুসলিম উম্মাহ নিজেই নিজের আততায়ী। তার ধ্বংস ও অধঃপতনের জন্য বহিঃশত্র"র আক্রমণ ও চক্রান্ড়ের কোনো দরকার পড়ে না; রাসূল (সা.)-কে ভুলে গিয়ে ভুলে থাকাই তার ধ্বংস ও আত্মবিলোপের জন্য যথেষ্ট। মহানবী (সা.) তাঁর বিদায় হজের অভিভাষণে বলেছিলেন, তোমরা আল কুরআন এবং আমার সুন্নাহ এই দুটি বস্তুকে যদি প্রাণপনে আঁকড়ে থাকো তোমাদের কোনো ভয় নেই। মুসলিম উম্মাহ কি এই অব্যর্থ নসিহতকে মনে রেখেছে, রাখেনি। যদি রাখতো তাহলে তার উন্নত মস্ড়ক কখনোই অবনত কি অধঃপতিত হতো না। অতএব মুসলিম উম্মাহকে যদি তার হৃতগৌরব পুনর"দ্ধার ও বিশ্বসভায় সর্বোচ্চ সম্ভ্রম নিয়ে দাঁড়াতে হয়, তাকে অন্যকিছু নয়, তাকে নিঃশর্ত আনুগত্যে মহানবী (সা.)-কে অনুসরণ করতে হবে। এটাই প্রকৃষ্ট পথ, একমাত্র পথ। লেখক : শিক্ষাবিদ ও গীতিকার।

রাসূল (সা.)-এর দাওয়াত দানের পদ্ধতি

-প্রফেসর তোহুর আহমদ হিলালী

মানুষকে পথ দেখানো আল্লাহপাকেরই দায়িত্ব। তিনি মানুষকে তাঁর নিজের প্রতিনিধি এবং ভালো-মন্দ পার্থক্য করার মতো বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে সমগ্র সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তারপরও সঠিক পথের দিশাদানের লক্ষ্যে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে অসংখ্য নবী-রাসূলকে হেদায়াতসহ যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন। এটা মূলত প্রথম মানুষ আদম (আ.)-কে দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতিরই অংশ। মানুষের আদি বাসস্থান জান্নাত। শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহর নাফরমানি করার কারণে আদম ও শয়তান উভয়কেই পরীক্ষাস্বরূপ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এ দুনিয়ায় পাঠানো হয়। এটি মূলত কোনো শাস্তিভোগের জায়গা নয়, একটি পরীক্ষার স্থান এবং উত্তীর্ণ হতে পারলে আবার জান্নাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে। পৃথিবীতে চলে আসার সময় ভীতসন্ত্রস্ত আদম (আ.)-কে আল্লাহপাক অভয় বাণী শুনিয়েছিলেন, 'আমার পক্ষ থেকে যে হেদায়াত যাবে যারা তা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয়ের কারণ নেই।' তাঁরই প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সর্বশেষ নবী ও রাসূল হলেন আমাদের প্রিয়তম নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)।

মূলত মানুষ যখন গোমরাহীর চরম সীমায় উপনীত হয়, তখনই পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহপাক নবী পাঠান। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আগমনকালীন অবস্থা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। মারামারি-হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, খুন-ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই, ধোঁকা-প্রতারণা, আমানতে খেয়ানত, ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গসহ সব ধরনের অপরাধ সে সমাজে চালু ছিল। সেই সমাজে নারী জাতি ছিল চরম অবহেলিত, কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণকে তারা অপমান মনে করতো এবং অনেক সময় কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। সমাজে দাসপ্রথা চালু ছিল এবং হাটবাজারে গরু-ছাগলের মতো মানুষ কেনাবেচা হতো। সারা বিশ্বের চিত্র এমনই ছিল। সে সময়ে সুপার পাওয়ার হিসেবে বিবেচিত রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যে রাজতান্ত্রিক স্বৈরশাসন জারি ছিল। আর আরবে কোনো রাষ্ট্রীয় একক শাসন ছিল না; সেখানে নানা গোত্র ও বংশে মানুষ বিভক্ত ছিল এবং একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার লড়াই-এ সর্বক্ষণ লিপ্ত থাকতো। এমন অবস্থায় মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহপাক তাঁর প্রিয়তম ও সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পাঠান। মক্কা নগরীর বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করে তিনি সেই সমাজে দীর্ঘ ৪০ বছর অতিবাহিত করেন। স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণে অন্যদের থেকে তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম। মানবজীবনের সকল সৎ গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। সততা ও বিশ্বস্ততার কারণে তিনি আল আমিন ও আস সাদিক উপাধীতে ভূষিত হন। জনগণের আমানতের সংরক্ষক ও বিবাদ-বিসংবাদের তিনি ছিলেন মীমাংসাকারী। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের অনাচার দূরীকরণে তিনি সচেষ্ট ছিলেন এবং যুবক বয়সে হিলফুল ফুজুল গঠন করে মজলুমের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। নবী হওয়ার পূর্বে তিনি ছিলেন তাঁর জাতির সবচেয়ে সম্মানীয় ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। সমাজ নিয়ে তিনি ভাবতেন, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনায় ব্যথিত হতেন। এক পর্যায়ে তিনি লোকালয় থেকে আলাদা হয়ে ধ্যানমগ্ন থাকেন। হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁর ওপর অহি অবতীর্ণ হয়। তিনি পথের দিশা পান। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে সতর্ক করার জন্য ডাক আসে।

সমাজের কোনো সমস্যাকে পুঁজি করে তিনি মানুষকে ডাক দেননি। না পুরুষের বিরুদ্ধে নারীকে, না ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রকে, না মনিবের বিরুদ্ধে দাসকে উস্কিয়ে তাদের একত্রিত করেননি। বরং হাজারো সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তিনি মানুষকে আহ্বান জানান, 'হে দুনিয়ার মানুষ! তোমরা বলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাহলেই তোমরা সফলকাম হবে।' এ দাওয়াত শুধু তিনি একা দেননি, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে যত নবী-রাসূল এসেছেন সবারই দাওয়াত অভিন্ন ছিল। এই দাওয়াত যিনি পেশ করেছেন এবং যাদের কাছে পেশ করা হয়েছে সবাই এর মর্ম বুঝতো। তাই তার প্রতিক্রিয়াও ছিল তাৎক্ষণিক। প্রথমে তিনি গোপনে দাওয়াত পেশ করেন এবং পরবর্তীতে আল্লাহর নির্দেশ আসে নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করার জন্য। গোপন দাওয়াতে তাঁরাই সাড়া দিয়েছেন যাঁরা হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে খুব কাছে থেকে দেখেছেন। যেমন -হজরত খাদিজা (রা.), হজরত আবু বকর (রা.) ও হজরত আলী (রা.) প্রমুখ। আল্লাহর নির্দেশের প্রেক্ষিতে প্রকাশ্যে দাওয়াত দানের লক্ষ্যে তিনি মানুষকে একটি পাহাড়ের পাদদেশে একত্রিত করে বলেন, 'আমি যদি তোমাদের বলি এই পাহাড়ের অপর পার্শে তোমাদের আক্রমণ করার জন্য এক সেনাবাহিনী ওত পেতে আছে। তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে?' সমস্বরে সবাই বলে ওঠে, অবশ্যই। কারণ তুমি তো আল আমিন ও আস সাদিক, জীবনে কখনই মিথ্যা বলনি।' তাহলে আমি তোমাদের এক ভয়াবহ আযাব সম্পর্কে সতর্ক করছি এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমরা সবাই মিলে বল– 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।' তাঁর আপন চাচা আবু লাহাব হজরত মুহাম্মদ সা.-এর জন্মের খবর যে দাসী তাকে দিয়েছিল সে খুশি হয়ে তাকে মুক্ত করে দিয়েছিল) বলে ওঠে- 'হে মুহাম্মদ, তোমার সর্বনাশ হোক! সাত-সকালে এই কথা শোনানোর জন্য আমাদের ডেকে এনেছ।' এরপর তাঁর দাওয়াত দানের পরিধি বাড়তে থাকে এবং সাথে সাথে বাড়তে থাকে তাঁর ও তাঁর সাথীদের প্রতি জুলুম-নির্যাতন। তিনি তাঁর জাতির সাথে কখনোই গাদ্দারি করেননি বা তাঁর চরিত্রে ছিল না সামান্যতম কোন কালিমা। প্রশ্ন জাগে, এত ভালো এই মানুষটির সাথে শত্রুতার কারণ কী? জাতির একজন কল্যাণকামী হিসেবেই তো তিনি সবার কাছে পরিচিত এবং তিনি কেবল আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর উলুহিয়াত (সার্বভৌমত্ব) এবং রেসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসের

দিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তো সুদ-ঘুষ, জেনা-ব্যভিচার বা অন্য কোনো আচরণের বির"দ্ধে বা কোনো আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিও আহ্বান জানাননি। সকল নবীর যে আহ্বান ছিল তিনিও একই আহ্বান তাঁর জাতির কাছে পেশ করেছেন। আসলে যাদের কাছে এই আহ্বান জানানো হয়েছে তারা বুঝেছে যে, এটা সাধারণ কোনো ধর্মীয় বাক্য নয়, এটা একটি বিপ্লবাত্মক স্লোগান যার মধ্যে রয়েছে সমাজ পরিবর্তনের আহ্বান। তাই প্রথমেই বাধাটা আসে শাসক ও শোষকগোষ্ঠী থেকে এবং তাদের অনুগ্রহপুষ্ট ধর্মীয় ও কায়েমিস্বার্থবাদী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। রাসূল (সা)-এর বির"দ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তিনি তাদের ধর্ম মানেন না এবং তাদের দেবদেবী ও আচার-অনুষ্ঠানকে মন্দ বলেন (আমাদের ভাষায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা) এবং পরিবারের মধ্যে অর্থাৎ পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-ভাই এ বিভেদ সৃষ্টি করছেন। সে সময়ে সকল বাধা-বিপত্তি ও সমালোচনা-নিন্দাবাদ উপেক্ষা করে তিনি শুধু ইতিবাচক কাজ করেন এবং সকল নিপীড়ন-নির্যাতন নীরবে সহ্য করে গেছেন, কোনো একটির পাল্টা জবাব দেননি। এত প্রতিকূল অবস্থার মাঝে আল্লাহর কিছু বান্দাহ তাঁর ডাকে সাড়া দেন। তিনি আখিরাতের বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাঁর সাথীদের পরিশুদ্ধ করেন, অর্থাৎ মৌলিক মানবীয় গুণে সজ্জিত করেন। আমরা যদি মক্কী যুগের সূরাগুলো খেয়াল করি তাহলে দেখবো, নানাভাবে সেখানে মানুষের মধ্যে তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসের সাথে নেক আমলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। সূরা আছরে বলা হয়েছে, সবাই ধ্বংস ও ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত; তারা ছাড়া যারা ঈমান, নেক আমল ও অপরকে হকের পথে উদ্বুদ্ধ ও ধৈর্য ধারণের তাগিদ দিয়েছে। নেক আমল অত্যন্ড় বিস্ড়ৃত এবং এর একটি সর্বজনীন রূপ আছে, যা আল্লাহ মানুষের প্রকৃতিতে দিয়ে রেখেছেন। যেমন সত্য কথা বলা, ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালন, আমানত সংরক্ষণ (দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান হওয়াও আমানতের অংশ), ধোকা-প্রতারণা না করা (ওজনে কমবেশি বা ভেজাল না দেয়া, মিথ্যা কসম না খাওয়া ইত্যাদি), সুদ-ঘুষ ও নানাবিধ অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকা এবং মানুষের সাথে সদাচরণ করা। যেমন সূরা হুমাযায় বলা হয়েছে, মানুষকে গালি দেয়া, কারো নিন্দাবাদ করা, হেয় করা, অপমান করা সবই গুনাহের কাজ এবং এর পরিণতি হুতামা। রাসূল (সা.)-এর দাওয়াতে যারা সাড়া দিয়েছেন তাদের তিনি কুরআনের আলোকে ঈমানের সাথে নেক আমলে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর কাজ হিসেবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, 'তিনি মানুষকে আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করে শোনান ও তাদের পরিশুদ্ধ করেন।' আমরা রাসূল (সা.)-এর দীর্ঘ ১৩ বছরের মক্কীজীবন পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবো, তিনি সে সময়ে এক তরফাভাবে নিপীড়ন-নির্যাতন সহ্য করেছেন-বন্দিত্ব যাপন (শে'বে আবু তালিব) করেছেন, সঙ্গী-সাথীদের হিজরত উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়ায় পাঠিয়েছেন এবং একপর্যায়ে তিনি নিজেও মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে একটি ঘটনাও এমন পাওয়া যায় না, ইসলামের কোনো দুশমনকে তিনি গোপনে হত্যা করেছেন বা শারীরিকভাবে আঘাত করেছেন। এটা শুধু ইতিহাসই নয়, আল্লাহর অভিপ্রায়ও তাই– 'তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখ এবং নামাজ কায়েম করো।' আল্লাহপাক কুরআন মজিদে নবী-রাসূলদের যে ইতিহাস উল্লেখ করেছেন তাতে দেখা যায়, সবারই নিপীড়ন-নির্যাতনের কাহিনীই সবিস্ড়ারে উল্লেখ করেছেন এবং জালেমদের শায়েস্ড়া করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। যেমন নমর"দ, ফেরাউন, শাদ্দাদের মতো স্বৈরশাসক এবং আদ, সামুদের মতো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী জাতিকে তিনি নিজেই সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন। রাসূল (সা)-এর জীবনে যুদ্ধ-বিগ্রহ সবই ছিল মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময়ে। ইসলামী রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধনে এগিয়ে আসা শত্রু বা আল্লাহর দ্বীন গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে তিনি নিজে যুদ্ধ করেছেন এবং যুদ্ধের জন্য তাঁর সাথীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। মাদানী আয়াতসমূহে যুদ্ধ-জিহাদের কথা বার বার এসেছে এবং এর থেকে সামান্যতম দূরে অবস্থান মুনাফিকের জীবন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সশস্ত্র যুদ্ধ বা অস্ত্র হাতে লড়াই করার অধিকার কেবল রাষ্ট্রশক্তিরই রয়েছে। বর্তমানে দেশে দেশে যে চোরাগোপ্তা হামলা বা সশস্ত্র যুদ্ধ চলছে এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই বা নবীর ইসলাম প্রচারের পদ্ধতির সাথেও কোনো মিল নেই। এ সবই ইসলামের দুশমনদের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ড় এবং যারা ইসলামের নামে করছে হয় তারা বিভ্রান্ড়, নয়তো ইসলামের দুশমনদের উচ্ছিষ্টভোগী ও ক্রীড়নক।

উপরের আলোচনায় আমরা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ তিনি মানুষের কাছে তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং যারা সাড়া দিয়েছেন তাঁদের পরিশুদ্ধ করে তাদেরও দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করেছেন। এই দাওয়াতের মধ্য দিয়ে যথার্থ পরিশুদ্ধির কাজটি সম্পন্ন হয়। তাঁদের কথা ও কাজে পুরোপুরি মিল ছিল এবং তাঁরা ছিলেন নিঃস্বার্থবান। কথা ও কাজে গরমিল আল্লাহর বড়ই অপছন্দনীয়। তাঁর জিজ্ঞাসা– 'এমন কথা কেন বলো যা নিজেরা করো না? এটা আল্লাহর বড়ই ক্রোধ উদ্রেগকারী বিষয় যে, তোমরা যা বলো তা নিজেরা করো না।' সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাঁর সাথীদের চরিত্র এমনই ছিল। সূরা ইয়াছিনে বলা হয়েছে, 'আনুগত্য করো সেই লোকদের যারা নিজেরা হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও কোন বিনিময় আশা করেন না।' দাওয়াত শুধু মৌখিক নয়, আমলী দাওয়াত হতে হবে। একজন দ্বায়ী ইলাল্লাহকে তার আচার-আচরণ, লেনদেন, কথাবার্তা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি সকল ক্ষেত্রে নিজেকে ইসলামের মূর্ত প্রতীক হিসেবে পেশ করতে হবে। কবি নজর"ল যথার্থই বলেছেন, 'ইসলাম সে তো পরশ মানিক, তারে কে পেয়েছে খুঁজি, পরশে যারা সোনা হলো

মোরা তাদেরই বুঝি।' সকল বাধা-বিপত্তি মাড়িয়ে মৌখিক ও আমলী দাওয়াতের মধ্য দিয়ে ইসলামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে, একে রোধ করার শক্তি কারো নেই।

ইসলাম আমাদের কাছে বর্তমানে পূর্ণাঙ্গভাবে রয়েছে। মানুষের কাছে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে নিজেদের জীবনে এর অনুসরণ এবং অন্যদের কাছে তা পৌঁছে দেয়ার আহ্বান জানাতে হবে। ইসলামকে সহজভাবে মানুষের কাছে পেশ করতে হবে। মানুষের যোগ্যতানুসারে আল্লাহর আদালতে বিচার হবে। সাধারণ মানুষের অবস্থানটা ইসলামের পক্ষে (অর্থাৎ ইসলামই শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থা এবং এর মধ্যেই মানবজাতির কল্যাণ এতটুকু বিশ্বাস) এবং মৌলিক ইবাদতে অভ্যস্ড় হলেই তাদের জন্য জান্নাতের ফয়সালা আশা করা যায়। রাসূল (সা.)-এর কাছে একজন বেদুইন এসে ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি ঈমানের সাথে নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ (ফরজ হলে) পালনের কথা বললে তিনি বলেন 'আমি এর বেশিও করবো না, কমও করবো না।' লোকটি চলে যাবার পর রাসূল (সা.) বলেন, লোকটি সত্য বলে থাকলে সে জান্নাতি। কোনো দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য দু'টি শর্ত অপরিহার্য। একদল যোগ্য নেতাকর্মী যারা ঈমানের বলে বলিয়ান ও নেক আমলে সমৃদ্ধ হবে এবং দ্বিতীয়ত অনুকূল পরিবেশ অর্থাৎ জনগণ সক্রিয় বিরোধী না হয়ে ইসলামের পক্ষে হবে। মক্কায় প্রথম শর্ত পূরণ হলেও দ্বিতীয় শর্তটি না থাকায় একজন নবী ও রাসূল হওয়া সত্ত্বেও হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। পক্ষান্ড়রে দু'টি শর্তই পূরণ হওয়ায় মদীনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। মুমিনদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যই মূলত সকল ব্যবস্থাপনার ওপর ইসলামকে বিজয়ী করে দেয়া। এ ব্যাপারে আল্লাহর বক্তব্য দ্ব্যর্থহীন– 'তিনি আপন রাসূলকে হেদায়াত ও সত্যদ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন যাতে সকল প্রকার দ্বীনের ওপরে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে পারেন, যদিও শিরকবাদীগণ মোটেই বরদাশত করবে না।' (সূরা সফ)। আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার টার্গেট নিয়ে মানুষকে ইসলামের পক্ষে আহ্বান জানাতে হবে এবং দ্বীনের ফরজ-ওয়াজিব পালন ও কবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সুন্নাত-মুস্ড়হাব পালনের বিষয়টি ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ততার ওপরে ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের সমাজে ফিকহ মাসলা-মাসায়েল নিয়ে বেশ মতপার্থক্য রয়েছে এবং এগুলো গৌন বিষয় বলেই মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ফরজ-ওয়াজিব ও কবীরা গুনাহের ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই। দ্বীনের মাঝে মতপার্থক্য সৃষ্টি করাকে আল্লাহপাক তাঁর কিতাবে কুফুরি বলে উল্লেখ করেছেন। (সূরা আলে ইমরান : ১০৫-১০৭)। এ দেশে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে উম্মাহর মতপার্থক্য অবশ্যই কমিয়ে এনে বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টি করতে হবে। আল্লাহপাক যে কাজটি এড়িয়ে গেছেন এবং রাসূল (সা.) তাঁর উম্মতের জন্য যেটা বাধ্য করেননি সেটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা কখনোই দ্বীনের জন্য কল্যাণকর নয়। এগুলো সবই পরিপূরক এবং ছাওয়াব মনে করে উম্মাহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেগুলো পালন করবে এবং অতীতেও করে আসছে।

দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জাতিকে শুনিয়েছিলেন, তোমরা যদি এ দ্বীন গ্রহণ করো, তাহলে আরবের নেতৃত্ব তোমাদের হাতে চলে আসবে এবং সমগ্র দুনিয়া তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে। দ্বীন গ্রহণের ফলে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জীবন বড় সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দরিদ্র শ্রেণীর মুসলমানদের জীবন আরো কঠিন হয়ে পড়েছিল। রাস্ড়াঘাটে মারপিট, মন্দ কথা শোনা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। অত্যাচার-নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে একদিন তাঁরা খানায়ে কাবায় বিশ্রামরত রাসূল (সা.)-কে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমরা তো আর সহ্য করতে পারি না। আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর"ন। জবাবে রাসূল (সা.) বলেন, অতীতকালেও যারা আল্লাহর দ্বীন কবুল করেছিল তাদের কাউকে করাতে দ্বিখ"ত ও কারো শরীর থেকে লোহার চির"ণী দিয়ে গোশত পৃথক করা হয়েছিল, তারপরও তারা দ্বীন থেকে বিচ্যুত হননি। সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন সানআ থেকে হাজরা মাউত পর্যন্ত এক ষোড়শী স্বর্ণালঙ্করসহ একাকী হেঁটে যাবে তাকে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করতে হবে না। রাসূল (সা.) তাঁর সাথীদের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এবং তাঁরা পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এখানে রাসূল (সা.) একটি ইসলামী সমাজের চিত্র তাদের সামনে পেশ করেছেন এবং সেটা হলো সকলের জন্য একটি নিরাপদ সমাজ; যে সমাজে ভয়ভীতি বা কোন জুলুম-নির্যাতন থাকবে না, জীবন-সম্পদ-সম্মানের পূর্ণ নিরাপত্তা নিয়ে সকলে জীবনযাপন করতে পারবে। আর আল্লাহও মুমিনদের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন যে, ঈমান ও নেক আমলে সমৃদ্ধ হলে জমিনে তিনি তাদের খেলাফত দান করবেন ও ভয়ভীতি দূর করে দেবেন। (সূরা নূর : ৫৫)। আর গোনাহসমূহ ক্ষমা করে জান্নাতের ওয়াদা তো রয়েছেই। যারা জমীনে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের অবশ্যই রাসূল (সা.) প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হতে হবে। অর্থাৎ মানুষের কাছে হেকমতের সাথে দ্বীনের দাওয়াত (আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি) পৌঁছাতে হবে এবং যারা সাড়া দেবে তাদের পরিশুদ্ধ করতে হবে (মৌলিক মানবীয় গুণের অধিকারী হতে হবে)। ঈমান ও মৌলিক মানবীয় গুণে (নেক আমল) সমৃদ্ধ একটি জনগোষ্ঠী কোন জনপদে থাকলে সহজেই তারা সাধারণ মানুষের মন জয় করতে পারে এবং এটা সম্ভব হলে আল্লাহপাকও তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণে এগিয়ে

আসবেন। আল্লাহপাক আমাদের তাঁর দ্বীনের ওপর অবিচল থেকে পূর্ণ মুসলিম হিসেবে জীবনযাপনের তাওফিক দান করুন। আমিন।
লেখক : উপাধ্যক্ষ (অব.), কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ।

প্রেমের শ্রেষ্ঠ উপমা হজরত মুহাম্মদ (সা.)
-প্রফেসর ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

বিনিসুতোর বন্ধনই প্রেম। সৃষ্টি আর স্রষ্টার মধ্যে সম্পর্ক গড়ার অলৌকিক সূত্র এটি। অন্যকথায় প্রেমের আত্মায় মানবতার বসবাস। সত্যিকার প্রেমের পঙক্তি রচনায় তোমার উপমা তুমিই হে প্রিয় রাসূল (সা.)। মানবতার পরতে পরতে যে অসংগতি তার সুচিকিৎসায় তোমার প্রেয়ময় ক্ষমা ও সৌন্দর্যবোধ পরিপূরক নেয়ামত। মানব শিশুর ভ্রূণ তৈরির পূর্ব থেকেই তোমার যে প্রেমপরশ তা মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে শৈশব-কৈশর-যৌবন ও পৌঢ়কাল পেরিয়ে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। মানবতাবাদী স্লোগানের খোলসে যে নারকীয়তা, তার জ্বালাময়ী উদর দেখেছি আইয়্যামে জাহেলিয়াত থেকে একাবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানময় বিশ্বের আধুনিকতা পর্যন্ত। প্রেমের মোড়কে বিকানো সব আদর্শেই বিষধর সাপ, আগুনের লেলিহান শিখা। ফলে শুধু টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া এবং রূপসা থেকে পাথুরিয়া নয়, বিশ্বের প্রত্যেক জনপদেই হাহাকার, ফিরে আসে শান্তির মুখোশ। তাই এ প্রেক্ষাপটে শুধু তোমাকেই মনে পড়ে। এ মনেপড়া শুধু বিশ্বাসী হৃদয়েই নয়, অমুসলিম বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানীরাও তোমায় স্মরণ করে টমাস কালকাইলের মতো। তোমার বিপ্লব ছিল এক প্রচণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যা দিল্লি থেকে গ্রানাডা এবং দুনিয়া থেকে আসমান পর্যন্ত যে অমানবিকতা ও অসত্যের আবর্জনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তা চোখের নিমিষে পুড়ে ছারখার করে দিল। তাই তো তোমাকে আবার চায় এ পৃথিবী।

ফিরে দেখা

মনুষ্যত্বের ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুন পতাকা হাতে মানবতার কাণ্ডারি হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন প্রিয় রাসূল হজরত মুহাম্মদ (সা.)। অজ্ঞতা, বর্বরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার দাপটে মানবতা যখন ভূলুণ্ঠিত, তখনই তাঁর আগমন। ভাইয়ে ভাইয়ে, বোনে-বোনে, পিতা-পুত্রে, ঘরে-বাইরে, সমাজে-অর্থনীতিতে; এমনকি ধর্ম বিশ্বাসেও শুধু দ্বন্দ্ব আর সংঘাতের খবর। ‘জোর যার মুল্লুক তার’ এ নীতি যেমন সর্বত্র বিরাজমান, তেমনি ‘নারী, মদ ও যুদ্ধ’ নেতৃত্বের শীর্ষতম গুণাবলী। সমাজের অর্ধেক নারী হলেও তারা ছিলেন ভোগের সামগ্রী মাত্র। যখন যাকে যেভাবে ইচ্ছে ভোগ করতো ক্ষমতাবান পুরুষরা। নিজেরা যথেচ্ছা নারী ভোগে লোলুপ থাকলেও নিজের বংশের মান বাঁচাতে স্বীয় কন্যাকে স্বহস্তে জীবন্ত কবর দিতেও দ্বিধাবোধ করতো না। শত্রুর সাথে গলাগলি তো দূরের কথা, দাস-দাসী থেকে শুরু করে পরিবারের প্রিয়জন পর্যন্ত নিষ্ঠুরতার স্বীকার হতো। মূলত তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের জ্ঞান না থাকার কারণে মানবতাবোধের এত অবক্ষয়। এ কারণে ঐতিহাসিকগণ এ সময়কে আইয়্যামে জাহেলিয়া নামে অভিহিত করেছেন। আলোহীন পৃথিবী, আঁধারের ঘোরতর মহকাল, মানবতার প্রান্তসময়।

মানবতা ও প্রেম

রাতের পরে দিনের আলো যেমন প্রত্যাশিত বাস্তবতা, সেই বাস্তবতার নিরিখে মহানবী (সা.) এলেন অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির আবাদ করতে। এলেন তিনি অহির বারতা এবং প্রেমের অথৈই সাগর বুকে ধারণ করে মানবতাবাদী মানুষ হিসেবে। স্বস্তি ফিরে আসে আকাশে-বাতাসে, সৃষ্টির পরতে পরতে নেমে আসে প্রশান্তির ছোঁয়া। প্রাণোচ্ছল হয়ে ওঠে আশাহত শিশু কিশোর, সুখের স্বপ্ন দেখে ঘর পোড়া দম্পতি, আলোয় বেরিয়ে আসে অন্ধকারে থাকা নারী সমাজ; বাঁচার স্বপ্ন দেখে দাস-দাসী এবং সমাজের অস্পৃশ্য মানবমণ্ডলী।

‘ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে’। এ বাস্তবসত্যকে সামাজিকভাবে ফলপ্রসূ করার জন্য বর্তমানে শিশু অধিকার নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা স্লোগান। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে শিশু অধিকার দিবস ঘোষণা করা হলেও দিন যত গড়াচ্ছে শিশু অধিকার ততই ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। অথচ অনেক আগেই শিশু অধিকার নিশ্চিতকল্পে মহানবী (সা.) নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। মহানবী (সা.) যখন কোনো সওয়ারীতে আরোহণ করতেন, তখন আগে-পিছে শিশুদের তুলে নিতেন এবং পথিমধ্যে খেলাধুলারত শিশুদের আদর সোহাগ করাকে তাহাদের অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং পুত্র-কন্যা উভয় শিশুকেই সমভাবে স্নেহ মমতা করার আদেশ দিয়েছেন। শিশুদের বিভিন্ন ক্রটি-বিচ্যুতি অপরাধ হিসেবে না দেখে মমতা মাখা আদরে তা সুধরে দিতেন। তিনি শিশুদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়াকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং উত্তম সদকা বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা সঠিক শিক্ষা না পেলেই শিশু-

কিশোররা বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ পায়; বিশেষত কিশোর বয়ঃসন্ধিক্ষণে অপরাধজগৎ তাদের রঙিন স্বপ্নে হাতছানি দেয়। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন শিশু-কিশোর অধিকারের মূর্তপ্রতীক।

একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যৌবনামুহূর্তে প্রেম, মানবতাবোধ, মানবাধিকার, প্রগতিশীলতা প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যাপক আকর্ষণীয় রঙে উপস্থাপিত হচ্ছে। আধুনিকতার প্যাকেজ দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন তৈরিতে ভীষণভাবে ব্যস্ত বিজ্ঞানের স্বপ্নময়ী নির্মাতাগণ। এ স্বপ্নের দোলায় দুলতে দুলতে আমরাও জীবনের বাস্তবতার উপভোগ্যতা হারিয়ে সর্বক্ষণ স্বপ্নের মতো দৌড়াচ্ছি। নতুন নতুন যন্ত্রের সাথে আমরাও হয়ে যাচ্ছি জীবন্ত রোবট। হঠাৎ সম্বিত ফিরে আসে হজরত আজরাঈল (আ.)-এর ডাকে। কিন্তু কিছুই করার নেই। শুধু টিকিট সংগ্রহই নয়, ওপারের বাহনে উঠে যাত্রা শুরু। পরপারের বাস্তবতায় নয় পৃথিবীবাসীর বিশ্লেষণেই আমার প্রেম প্রমাণিত হলো স্বার্থবাদী হিসেবে, মানবতাবোধ চিহ্নিত হলো নিজের সুখ-শান্তি ধরার ফাঁদ হিসেবে। মানবাধিকার উপস্থাপিত হলো অন্যের অধিকারের নাম করে নিজের আয়েশি জীবন পাওয়ার মুখোশ হিসেবে এবং দুর্গতি ও দুর্দশাগ্রস্ত-দুর্গতিময় সামাজিক অবকাঠামো গড়ার বাহন হিসেবে। প্রমাণিত হলো প্রগতিশীলতা। তাহলে কি পেলাম এ রঙিন স্লোগানে নিজেকে উচ্চকিত করে? 'ভালোবাসার শেষ ফল, বুকে ব্যথা চোখে জল' সে জলটুকুও মিলবে কি? তাই মানবতাবাদী মহাপুরুষ হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শের কাছে ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?

নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে পৃথিবীতে মানুষের আবাদ হলেও, নারীরা স্মরণাতীতকাল থেকেই নির্যাতিত ও নিগৃহীত হয়ে এসেছে। মোসাঃ আউয়ালন্নেসা খাতুনের পরিভাষায় 'যুগ যুগ ধরিয়াই নিরীহ নারী জাতি উপেক্ষিতা, নিগৃহীতা জীবনযাপন করিয়া আসিতেছিল। এই লাঞ্ছিতা, পদদলিতা অবলা জাতিকে সসম্মানে ধুলা মুছিয়া সর্বপ্রথম যে গৌরবের কোলে ঠাঁই দিয়াছে তাহা হইতেছে, ন্যায়নিষ্ঠ, উদার ও মহান এবং শান্তিময় ইসলাম।' মুহাম্মদ আহবাব চৌধুরীর মতে, ইসলামই সর্বপ্রথম উপেক্ষিত নারীকে মঙ্গলময়ী নারী বলে অভিনন্দিত করে। এ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মঙ্গলময়ী নারী, এসো অনন্দময়ী নারী, এসো তাপসময়ী নারী বলে মাতৃজাতিকে অভিবাদন জানান। হজরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পত্তি, ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অধিকার প্রদান করে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করলেন। সত্যিকার অর্থেই মহানবীই (সা.) সর্বপ্রথম নারীকে পুরুষের সমপর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করে তাকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত' এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে মাকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী, তোমার পালনকর্তা আদেশ দিচ্ছেন যে, তাকে (আল্লাহকে) ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদের 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলো না এবং তাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করো। তাদের সাথে ভালোবাসা সহকারে নম্রভাবে মাথা নত করে দাও।

অত্র আয়াতে পিতা মাতার সমঅধিকার ও মর্যাদা সূচক বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু অন্য আয়াতে মায়ের মর্যাদাকেই বেশি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে সময় লেগেছে ৩০ মাস। মহানবী (সা.) পিতা-মাতা উভয়কেই সন্তানের জান্নাত অথবা জাহান্নাম বলে উল্লেখ করলেও অনেক হাদীসেই মায়ের গুরুত্ব বেশি বলে উল্লেখ করেছেন। হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল (সা.) আমার সুন্দর আচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা। (বুখারী ও মুসলিম)। মহানবী (সা.) নারীকে বড় বড় পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভের উসিলা হিসেবেও উপস্থাপন করে তাদের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছেন। এক ব্যক্তি প্রিয়নবীর (সা.) খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমি একটি বড় গুনাহ করে ফেলেছি, হে রাসূল (সা.) আমার তাওবার কোনো পথ আছে কি? রাসূল (সা.) বললেন তোমার মা জীবিত আছেন কি? সে ব্যক্তি বলল, জ্বি না হুজুর, মা জীবিত নেই। অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন, তোমার খালা জীবিত আছেন? লোকটি বলল, জী হুজুর খালা জীবিত আছেন। রাসূল (সা.) বললেন, তার সাথে সুন্দর ও মাধুর্যপূর্ণ আচরণ কর। সুতরাং শুধু মা হিসেবেই নয়, খালা হিসেবেও ইসলাম নারীকে কত বড় উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে এ হাদীস থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সমতা বিধানে মহানবী (সা.) অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি পরামর্শের ভিত্তিতে কার্য সম্পাদনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মহিলাদের বিবাহের ক্ষেত্রেও এ বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কুমারী, বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তাসহ সব মহিলার বিবাহের

ক্ষেত্রে ইসলাম তাদের সম্মতিকে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে মূল্যায়ন করে থাকে। মহানবী (সা.) বলেছেন, তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা নারী তার বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভিভাবকের তুলনায় অধিক হকদার এবং কুমারীর বিয়ের ব্যাপারেও তার অনুমতি নিতে হবে। বিয়েতে পাত্রীর অনুমতির গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি তাদের মর্যাদাকে বৃদ্ধির জন্য পাত্র কর্তৃক মোহরানা প্রদানকেও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অথচ প্রাক-ইসলামী যুগে কন্যা পক্ষের অভিভাবক কর্তৃক বরপক্ষকে মোহরানা (ডিমান্ড বা উৎকোচ) প্রদান করতে হতো। ইসলাম এ ঘৃণ্য প্রথাকে উচ্ছদ করে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে মোহর পরিশোধ করা ফরজ করে দিয়েছে। শুধু মোহর দেয়াই শেষ নয়, বরং দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করতেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা নারীদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করো। যদি তাদের তোমরা অপচ্ছন্দ করো, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিষকে অপছন্দ করছ– যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন। অনুরূপ মহানবী (সা.) এরশাদ করেন, পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার তারাই, যাদের আচার-আচরণ ভালো, আর তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে সর্বোত্তম। (তিরমিযী) সুতরাং স্ত্রীদের স্বামীর চরিত্র নির্ণয়ক মাপকাঠি হিসেবেও উপস্থাপন করা হয়েছে। জাহেলি যুগে নারীদের অবমূল্যায়ন করার ফলে ইসলাম তাদের এতটা গুরুত্ব দিয়েছে, কারো যদি ২টি সন্তান থাকে তার একটি যদি কন্যাসন্তান হয়, তবে বাজার থেকে সন্তানদের জন্য কোন মিষ্টান্ন কিংবা ভালো জিনিস বাড়িতে আনা হলে আগে কন্যাসন্তানের হাতে তুলে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া কন্যাসন্তানের লালন-পালনকে জান্নাত লাভের উসিলা হিসেবেও দেখানো হয়েছে। মহানবী (সা.) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ২টি কন্যাসন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, আমি এবং সে একত্রে জান্নাতে বসবাস করব। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, যার একটি কন্যাসন্তান রয়েছে এবং তাকে জীবন্ত কবর দিল না, তার সাথে অপমানজনক কোনো আচরণ করল না এবং তার তুলনায় কোনো পুত্রসন্তানকে অধিক অনুগ্রহ দেখালো না, আল্লাহ তাকে বেহেশত নসিব করবেন। কন্যার পাশাপাশি বোনের পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারেও মহানবি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি তার দুই বোনকে ভরণ পোষণ দেবে, আমি এবং সে আখিরাতে এক সাথে মিলিত হব।' সুতরাং প্রমাণিত হয়, ইসলাম নারী অধিকার খর্ব করেনি, বরং ইসলাম এবং ইসলামই নারী অধিকারের একমাত্র জীবন বিধান।

এ কথা নির্মম সত্য যে, একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগে এসেও আমরা ঘুরেফিরে আবার সেই জাহেলি যুগেই ফিরে যাচ্ছি। আধুনিকতার মোড়কে নারীদের পণ্য বানানো হচ্ছে। মিডিয়া ও বিনোদনে নারীকে সাজানো হচ্ছে ভোগের সামগ্রী হিসেবে। নারী অধিকারের ভোকাল স্লোগানিস্টরাই কন্যাসন্তান রোধে কন্যা ভ্রূণ হত্যায় চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করছে। ভারতের মতো মানবতাবাদী ও নারী অধিকারের প্রবক্তা বলে পরিচয়দানকারী রাষ্ট্রে দৈনিক প্রায় ৩ হাজারের অধিক কন্যা ভ্রূণ হত্যা করার খবর অনেক পুরনো। এমনকি তামিলনাড়ু ও রাজস্থানের মতো বিভিন্ন রাষ্ট্রে বড় বড় পোস্টার ও প্রচারপত্রে স্লোগান তোলা হয়েছে ৫০০ রুপি খরচ করুন, ৫ লাখ রুপি বাঁচান। অর্থাৎ ৫০০ রুপি খরচ করে আলট্রাসোগ্রাফি করে নিশ্চিত হোন পেটের সন্তান ছেলে না মেয়ে। মেয়ে হলে তাকে হত্যা করে তার ভরণপোষণ ও যৌতুকের ৫ লাখ টাকা বাঁচান। জাহেলি যুগের কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবরদানের আধুনিক রূপ নয় কি এটা? অথচ মহানবী (সা.) এরশাদ করেছেন, যে পিতা একটি অথবা দু'টি অথবা তিনটি কন্যাসন্তান সন্তুষ্টচিত্তে লালন-পালন করে সুশিক্ষা দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবে সে পিতা-মাতা এবং আমি জান্নাতে পাশাপাশি অবস্থান করবো। তিনি আরো বলেছেন, কন্যাসন্তান তোমার জান্নাতের উসিলা এবং জাহান্নামের বাধা। পবিত্র কুরআনেও বলা হয়েছে, স্ত্রীরা তোমাদের পোশাক পুরুষরাও তাদের পোশাক।

শুধুমাত্র সমাজের সাধারণ নারীই নয়, বরং বিধবা নারীরা ছিল সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। তাদের সমাজের এতটাই বোঝা মনে করা হয়েছিল, তারা বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকেই বেশি সহজ ও কল্যাণকর মনে করত। মহানবী (সা.) বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে তাদের সামাজিক মর্যাদার দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। হজরত আয়েশা (রা.) ছাড়া তাঁর সমস্ত স্ত্রীগণই বিধবা ছিলেন। তিনি বিধবা ও এতিমদের সম্পর্কে ঘোষণা করেন, যে কেউ কোনো বিধবা ও এতিমের (মিসকিনের) কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট থাকে সে আল্লাহর পথে জিহাদরত কিংবা ঐ ব্যক্তির সমতুল্য যে দিনে রোজা রাখে এবং সারারাত ইবাদতে কাটায়, (তিরমিযী)। অথচ আধুনিক বিশ্বেও বিধবা নারীগণ সামাজিকভাবে বঞ্চনার শিকার। মাত্র একশত বছর পূর্বেও দাস-দাসীগণ ছিলেন সমাজের সবচেয়ে অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠী। মনে করা হতো, দাস-দাসীদের মনিবের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তারাও যে মানুষ এ ধারণাই করা হতো না। মহানবী (সা.) প্রথম শ্রেণী বিভেদ দূর করলেন এবং দাস-দাসীগণকে মানবসমাজের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দাসদের আজাদ করে তার পরিবারের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, 'দাস-দাসীগণও তোমাদের মতোই মানুষ এবং তোমাদেরই ভ্রাতা, ভগ্নি বা তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তোমরা নিজেরা যা খাও তাহাদিগকে তাই খাওয়াও, নিজেরা যা পরিধান কর তাহাদিগকে তাই পরিধান করাও এবং তাহাদিগকে সাধ্যের অধিক কাজ দিবে না, যদি দিতেই হয় তবে নিজেরাও সহায়তা করবে।' অথচ বর্তমান বিজ্ঞানময় আধুনিক সমাজে দাস-দাসী না থাকলেও বাড়ির কাজের বুয়া, গেন্দু কিংবা ছোট ছোট বাচ্চাদের

বাসাবাড়ির কাজে নিয়োগ করে তাদের প্রতি কেমন আচরণই বা করা হয়? যারা বেশি প্রগতিশীলতার ধারক-বাহক, শিশু অধিকার সম্পর্কে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে ব্যস্ত থাকেন, তাদের ঘরের কাজের শিশুটিই বেশি অধিকার বঞ্চিত। এমনকি তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধিদের ঘরেই কাজের বুয়া কিংবা কাজের শিশুরা বেশি নিগৃহীত হয়, নির্যাতিত হয়; এমনকি জীবননাশের মতো ঘটনাও ঘটে।

ঘোষণাপর্ব

এ প্রেক্ষাপটে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা যায়, কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক মতাদর্শ নয়, শুধুমাত্র মহানবীর (সা.) আদর্শই পারে মানুষকে মানবতাবোধে উজ্জীবিত করতে। তিনি নন আরবে কিংবা অনারবের, শুধু আমিরের, নন শুধু ফকিরের। তিনি একক কারো নন, তিনি সবার; সব মানুষের। মানতাবাদের যে ফসিল আমাদের সামনে ঝুলানো হচ্ছে এগুলো আলেয়া কিংবা রঙিন ফানুস বৈ কিছু নয়। তাই দ্বিধাহীনচিত্তে বলতেই পারি, হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমিই মানবতাবাদী প্রেমিক মহাপুরুষ; তোমার পরশেই এ অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির মশাল জ্বলে উঠতে পারে। তোমার আর্দশের ছোঁয়ায় এ সবুজ জমিনে বয়ে যাক সুখ-শান্তির বহতা নদী; প্রেম ও মানবতাবাদের স্রোতে প্লাবিত হোক মানবজমিন। পৃথিবী এখন তোমার আদর্শের দিকেই তাকিয়ে।

লেখক : অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
mrakhanda@gmail.com

রাসূলের (সা.) প্রণোদনায়
আসহাবে রাসূল হজরত আলী (রা.)-এর কাব্যচর্চা
-মোশাররফ হোসেন খান

রাসূল (সা.)। তিনি ছিলেন তুলনাহীন এক অসাধারণ মহামানব। ছিলেন মানুষ ও মানবতার শিক্ষক। তিনি ছিলেন শিক্ষকের শিক্ষক। তাঁর প্রত্যক্ষ প্রয়াসে তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতি, মানুষের মর্যাদা ও মূল্যবোধ এক নতুন আলোকিত মাত্রা পেয়েছিল। তিনি শুধু সমাজ-সংস্কারই করেননি, বরং সমাজ-জীবনে আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন। আমরা বিস্মিত হই, যখন দেখি রাসূল (সা.) একই সাথে শাসক, সমরবিদ, সেনাপতি, সমাজ-সংস্কারকসহ সকল দিকে তাঁর ঐতিহাসিক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ড় স্থাপন করে গেছেন। এমনই একজন মহামানব তিনি, যিনি শিল্প-সাহিত্য ও আসহাবে রাসূলের (সা.) কাব্যচর্চার ক্ষেত্রেও রেখে গেছেন অতুলনীয় ভূমিকা। রাসূলের (সা.) প্রত্যক্ষ প্রণোদনায় সাহাবী-কবিগণ তাঁদের কাব্যচর্চার ধারা বেগবান করে তুলেছিলেন। তাঁদের রচিত সেইসব কাব্যসাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত বলেই আজও সেসব নিয়ে প্রচুর লেখালেখি, গবেষণা ও আলোচনা-পর্যালোচনা হয়।

রাসূলের (সা.) সাহায্য, সহযোগিতা, প্রেরণা ও উৎসাহে যেসব সাহাবী-কবির উত্থান ঘটেছিল, এবং যাঁরা কাব্যসাহিত্যে অমরতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রা.) অন্যতম। তাঁর কাব্যসাহিত্য নিয়েই আজকের এই যৎকিঞ্চিত পর্যালোচনা। রাহমাতুল্লিল আলামীন সাইয়িদুল মুরসালীন খাতামুন নাবীয়্যীন বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবী হজরত আলী (রা.) ইবনে আবু তালিব। সুবিচারের জন্য তিনি 'শ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক' মর্যাদায় ভূষিত ছিলেন। সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতি বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি। বিভিন্ন সশস্ত্র জিহাদে অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা, হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র রচনা, নাজরানের খ্রিস্টান প্রতিনিধিদের সাথে চুক্তিপত্র রচনা, কৃষকদের অধিকার সংরক্ষণে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রচলনে হজরত আলীর প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা ছিল। কৃষক-শ্রমিক তথা সকল শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের বন্ধু ছিলেন তিনি। অনন্য মগ্নতায় তিনি নামাজ সম্পন্ন করতেন এবং আল্লাহর প্রেমে কখনো কখনো সংজ্ঞা হারাতেন। তিনি নাজিলকৃত আয়াত লিখে রাখতেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে আলোচনা করতেন। তিনি অতুলনীয় ছিলেন। অনন্য জ্ঞান প্রজ্ঞার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিশেষ নৈকট্যে থেকে সূরা নাজিলের প্রেক্ষিতসহ আয়াতসমূহের অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ লাভ করেন তিনি।

মহান সাহাবী ও খলিফা হজরত আলী (রা.) আরবী সাহিত্যেও সুপ"িত ছিলেন। সশস্ত্র জিহাদসমূহে তাঁর ভূমিকা কিংবদন্ড়িতুল্য। তিরাশিটি সশস্ত্র জিহাদে বিজয়ী হন তিনি। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) নবুওয়াত লাভ করেন সোমবারে এবং হজরত আলী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন পরদিন মঙ্গলবার। ইসলাম গ্রহণের পর সত্য অবলম্বন করে থাকা ও প্রচারের কাজে তিনি নানাভাবে নির্যাতিত হন। হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতিনিধিরূপে আমানতকারীদের কাছে আমানত ফিরিয়ে দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করে তাঁর নিজের বিছানায় তাঁকে রেখে যান। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি সেখানে থেকে মারাত্মক বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করে আমানতকারীদের আমানত ফিরিয়ে দিয়ে সপরিবারে মদীনায় হিজরত করেন। ইসলামের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ জিহাদ-বদরে তিনি বিপুল সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন। উহুদের যুদ্ধে মহানবীর

জীবননাশের আশঙ্কা দেখা দেয়। বিধর্মীরা তাঁকে ঘিরে ফেললো। তিনি নিজ অবস্থান থেকে ছুটে এসে তাদের ব্যূহ ভেদ করে নবীজীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। খন্দকের সশস্ত্র জিহাদে আমির ইবনে আবদে উদ দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালে তিনি এগিয়ে যান ও সবাইকে অবাক করে তাঁর জুলফিকারে ইবনে আবদে উদকে হত্যা করেন।

খায়বারের জিহাদে কঠিন ভাগ্য পরীক্ষা। মুসলিম বাহিনীর কোনো সেনাপতি জয়ী হতে পারছিলেন না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আগামীকাল এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দেবো, যিনি আল্লাহ ও রাসূলকে অত্যধিক ভালোবাসেন এবং আল্লাহ তাঁর দ্বারা বিজয় লাভ করাবেন। তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হবেন না।' হজরত আলীর চোখের রোগ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দোয়ায় মুহূর্তে নিরাময় হলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে পতাকা প্রদান করে বললেন, 'হে আলী! পতাকা গ্রহণ করো এবং তা নিয়ে অগ্রসর হও যতক্ষণ পর্যন্ড় না আল্লাহ তোমাকে জয়যুক্ত করেন।' যুদ্ধে ঢাল হাতছাড়া হয়ে গেলে তিনি দুর্গের কপাট খুলে ঢালরূপে ব্যবহার করেন এবং যুদ্ধ শেষে তা দূরে নিক্ষেপ করেন। একমাত্র তাবুক অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে মদীনা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন।

তিনি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে গঠনমূলক ভূমিকা অব্যাহত রাখেন ও প্রথম তিন খলিফার শাসনকালের পঁচিশ বছর সহযোগিতা দান করেন। তিনি হজরত উমর (রা.)-কে হিজরত হতে মুসলিম সন গণনার পরামর্শ দান করেন। হজরত উমর (রা.) বলেন, 'আলী না হলে উমর ধ্বংস হতো।' হিজরীর শেষ দিক থেকে ৪০ হিজরীর ১৭ রমজান পর্যন্ড় খিলাফতের গুর"দায়িত্ব পরিচালনা করেন তিনি। ২১ রমজান রাতে ৬৩ বছর বয়সে তিনি শাহাদাত লাভ করেন। রোববার রাতে তাঁকে কুফায় দাফন করা হয়।

হজরত আলীর (রা.) অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভা ছিল। অধ্যাপক পি কে হিট্টি হজরত আলীকে (রা.) 'মুসলিম সাহিত্য ও শৌর্যবীর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে মূল্যায়ন করেন।' ঐতিহাসিক গীবন বলেন, 'জন্ম, আত্মীয়তার বন্ধন এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলীকে (রা.) এত বেশি মহিমান্বিত করেছিল যে, আরবের শূন্য সিংহাসনের দাবি করা তাঁর জন্য অযৌক্তিক ছিল না। একজন কবি, একজন দরবেশ ও একজন সৈনিকের সমন্বিত গুণাবলী তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল। তাঁর বাগ্মিতা ও সাহসিকতার কাছে সব প্রতিদ্বন্দ্বীই হার মানতো। মহানবী (সা.) তাঁর কর্তব্যের শুর" থেকে শেষ পর্যন্ড় তাঁর এই বন্ধুর কথা মনে রেখেছিলেন। তাঁকে তিনি নিজের ভাই, প্রতিনিধি এবং দ্বিতীয় মূসার বিশ্বস্ড় হার"ন হিসেবে আখ্যায়িত করে গেছেন।'

অনন্য বাগ্মিতার অধিকারী ছিলেন হজরত আলী (রা.)। জনগণের উদ্দেশে বিভিন্ন সময়ে তিনি যে ভাষণ প্রদান করেন, তার সংকলন গ্রন্থ বিখ্যাত 'নাহযুল বালাগা।' এতে তাঁর ধর্মীয় বিচার-বুদ্ধি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, জীবনবোধ ও আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদনের আকুতির প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর সেই ভাষণাবলী প্রকাশভঙ্গি, শব্দচয়ন ও ভাষার লালিত্যে এক অতুলনীয় সাহিত্যকর্মে রূপ গ্রহণ করেছে। আরবী ভাষার অমূল্য সম্পদ হিসেবে এ গ্রন্থ সর্বত্র, স্বীকৃত ও সম্মানিত। আরবী গদ্য ধারায় মাকামা সাহিত্যের স্থান অত্যন্ড় উঁচুতে। শাশ্বত সর্বজনীন বাণীর ভিত্তিতে বক্তব্য উপস্থাপন, কালোত্তীর্ণ ভাব ও অলংকরণ, গদ্য ধারায় ছান্দিক কুশলতা ও শিল্প-শোভনতা নাহযুল বালাগার মর্যাদাকে সমুন্নত রেখেছে।

হজরত আলী (রা.)-কে আরবী ব্যাকরণের জনক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর তত্ত্বাবধানে আবুল আসওয়াদ দুয়েলী প্রথম আরবী ব্যাকরণ রচনা করেন। হজরত আলী (রা.) লিখেছেন অনেক কবিতা। পবিত্র হাদীস ও সাহিত্যের গ্রন্থাবলীতে তাঁর অনেক কবিতা পাওয়া যায়। তাঁর কবিতার বিভিন্ন সংকলনও হয়েছে। দীওয়ান-ই-আলী (রা.) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কাব্য সংকলন। মুসলিম বিশ্বে তো বটেই, এর বাইরেও এ গ্রন্থের সমাদর ব্যাপক-বিশাল। সার্বজনীন কালোত্তীর্ণ বাণী ও শিল্প সৌন্দর্যে এ গ্রন্থ কালজয়ীর ভূমিকা পালন করছে। দীওয়ান শব্দের অর্থ কাব্যগ্রন্থ, কবিতা সংকলন। বিচারালয়ও এর অর্থ হয়। এককভাবে কোনো কবির কাব্য-সমষ্টিকে বা একই গোত্রের কয়েকজনের কাব্যসংগ্রহকে দীওয়ান বলা হয়। দীওয়ান-ই-আলী (রা.) মানে আলী (রা.)-এর কাব্য সংকলন। আল্লামা শিবলী নুমানী এ গ্রন্থের মর্যাদা ও খ্যাতির ওপর মূল্যবান এক অভিমতে বলেন, 'আরবী কাব্য সাহিত্যে মুআল্লাকা, লামিয়াত ও আধুনিক আরবীয় গদ্য ও কাব্যসাহিত্যের সুবিশাল জগতের মধ্যে দীওয়ান-ই-আলীর তুলনামূলক মূল্যায়নে এটা স্বচ্ছ হয় যে, ইসলামের অনুপম সত্য ও সুন্দরের উপস্থাপনায়, মানবীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশের সৃজনশীলতায়, নশ্বর পার্থিবতার মোহের বলয় ভেঙে চিরন্ড়ন জীবনের আহ্বান কুশলতায়, সর্বোপরি মাবুদ ও বান্দার সম্পর্ক ও নৈকট্যের জন্য অনুপম আকুতি-সমৃদ্ধ দীওয়ান-ই আলী (রা.) একই সাথে তত্ত্বসন্ধানী ও শিল্পান্বেষী মানুষের জন্য এক মূল্যবান উপহার এবং এর গতিময়তা কাল থেকে কালান্ড়রে, শতকের পর শতক পেরিয়ে বিস্ড়র লাভ করেছে। দুর্ভাগ্যবশত দৃষ্টিকোণগত সংকীর্ণতার যূপকাষ্ঠে দীওয়ান-ই-আলী (রা.)-এর মত সার্বজনীন মানবতাবাদী বিশ্বসাহিত্যে যথাযোগ্য মূল্যায়ন ঘটেনি। খিলাফতের প্রতি বৈরী আঘাত থেকে এ সাহিতকর্মও রেহাই পায়নি। কারণ এর কবি হজরত আলী (রা.), খুলাফায়ে রাশেদীনের শেষ খলিফা ও কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। ফলে মজলুম মানুষের মুক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য-কর্ম হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় এর আহ্বান উপস্থাপিত

হয়নি। মানবিক মহিমার সর্বোচ্চ ঘোষণায় দীওয়ান-ই-আলী (রা.) শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ছিল সেদিন, রয়েছে আজো এবং এর আবেদন আগামীর আবহমান মানুষের মিছিলেও শামিল থাকবে।'

হজরত আলী (রা.)-এর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সুধীমহল কমবেশি অবহিত আছেন। আরবী কাব্যক্ষেত্রে হজরত আলী (রা.)-এর অমর অবদানের মধ্যে রয়েছে আনওয়ার আল-উকূল মিন আশআরী ওয়াসিইয়ী আর-রাসূল (রাসূল প্রতিনিধির কবিতাবলী জ্ঞানপ্রদীপ)। হি. ৮৯৭,/খৃ. ১৪৯২ সনে সাদী ইবন তাজী সংকলিত এ গ্রন্থ ব্রিটিশ মিউজিয়াম (প্রথম) ৮/৫৭৭; আয়া সুফিয়া ৪২/৩৯৩৭; পাটনা ১: ৭৪৯, ১৯৫; লীডন ৫৮০; প্যারিস (প্রথম) ৩/৩০৮২; ব্রিটিশ মিউজিয়াম (দ্বিতীয়) ২/১২২৪; মিউনিখ (প্রথম) ২/৪৪১; ভ্যাটিক্যান (তৃতীয়) ৩৬৫; আলীগড় ৭,১৩৪ ও অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। হি. ৮৯০/খৃ. ১৭৮৫ সনে হুসাইন ইবনে মুঈন আল-দীন-আল-মাইবুযী কর্তৃক ফার্সি ভাষায়কৃত এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লীডন ৫৭৯; ব্রিটিশ মিউজিয়াম (প্রথম) ৫৭৯/১৬৬৫; ব্রিটিশ মিউজিয়াম (দ্বিতীয়) ১: ১৯,২০; তেহরান ২: ৪/৪১৩ ইত্যাদি স্থানে পাওয়া যায়। এছাড়া অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তিত্বকৃত এর ফার্সি অনুবাদ হামবুর্গ (১,১৯১)-সংরক্ষিত রয়েছে। মূলত হজরত আলীর (রা.) কাব্য ও সাহিত্যকর্ম বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

দুই.

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবু আবারও স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, হজরত আলী (রা.) ছিলেন একজন সুবক্তা ও বিখ্যাত কবি। তাঁর কবিতার একটি 'দীওয়ান' আমরা পেয়ে থাকি। তাতে অনেকগুলো কবিতায় মোট ১৪০০ শ্লোক আছে। গবেষকদের ধারণা, তাঁর নামে প্রচলিত অনেকগুলো কবিতা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। তবে তিনি যে তৎকালীন আরবী কাব্যজগতের একজন বিশিষ্ট দিকপাল ছিলেন এতে পণ্ডিতগণের কোনো সংশয় নেই। 'নাহযুল বালাগা' নামে তাঁর বক্তৃতার একটি সংকলন আছে, যা তাঁর অতুলনীয় বাগ্মিতার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

হজরত আলীর (রা.) কবিতার বিষয়বস্তু বিচিত্রধর্মী। বংশ অহমিকা, মূর্খের সাহচর্য, যুগের বিশ্বাসঘাতকতা, যুগযন্ত্রণা, দুনিয়ার মোহ, দুনিয়া থেকে আত্মরক্ষা, সহিষ্ণুতার মর্যাদা, বিপদে ধৈর্য ধারণ, দুঃখের পর সুখ, অল্পে তুষ্টি, দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য ইত্যাদি বিষয় যেমন তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে, তেমনিভাবে সমকালীন ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, যুদ্ধের বর্ণনা, প্রিয়নবীর (সা.) সাহচর্য, তাকদীর, আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস, খোদাভীতিসহ নানা বিষয় তাতে বাক্সময় হয়ে উঠেছে। তিনি মৃত্যুর অনিবার্যতা, যৌবনের উন্মাদনা, বন্ধুত্বের রীতিনীতি, ভ্রমণের উপকারিতা, জ্ঞানের মহত্ব ও অজ্ঞতার নিচতা, মানুষের অভ্যন্তরের পশুত্ব ইত্যাদি বিষয়ের কথা যেমন বলেছেন, তেমনিভাবে প্রিয়নবীর (সা.) ও প্রিয়তমা স্ত্রী ফাতিমার (রা.) মৃত্যুতে শোকগাঁথাও রচনা করেছেন।

বংশ অহমিকা যে অসার ও ভিত্তিহীন সেকথা হজরত আলী (রা.) বলেছেন এভাবে–

'আকার-আকৃতির দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান।
তাদের পিতা আদম এবং মা হাওয়া।
মায়েরা ধারণের পাত্রস্বরূপ, আর পিতারা বংশের জন্য।
সুতরাং মানুষের গর্ব ও অহঙ্কারের যদি কিছু থেকে থাকে
তা হলো কাদা ও পানি।'

পুত্র হুসাইনকে (রা.) তিনি উপদেশ দান করেছেন এভাবে–

'হে হুসাইন! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি,
তোমাকে আদব শিখাচ্ছি; মন দিয়ে শোন।
কারণ বুদ্ধিমান সেই যে শিষ্টাচারী হয়।
তোমার স্নেহশীল পিতার উপদেশ স্মরণ রাখবে,
যিনি তোমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন।
যাতে তোমার পদস্খলন না হয়।
আমার প্রিয় ছেলে!
জেনে রাখ, তোমার রুজি-রিজিক নির্ধারিত আছে।
সুতরাং উপার্জন যাই কর, সৎভাবে করবে।
অর্থ-সম্পদ উপার্জনকে তোমার পেশা বানাবে না।
বরং আল্লাহভীতিকেই তোমার উপার্জনের লক্ষ্য বানাবে।'

বুদ্ধি, জ্ঞানের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা তিনি বলেছেন এভাবে–

'মানুষের জন্য আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ হলো তার বোধ ও বুদ্ধি।
তার সমতুল্য অন্য কোনো ভালো জিনিস আর নেই।

দয়াময় আল্লাহ যদি মানুষের বৃদ্ধিপূর্ণ করে দেন
তাহলে তার নীতিনৈতিকতা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে।
একজন যুবক মানুষের মাঝে বুদ্ধির দ্বারাই বেঁচে থাকে।
আর বুদ্ধির ওপরই তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়।
সুস্থ-সঠিক বুদ্ধি যুবককে মানুষের মাঝে সৌন্দর্যময় করে
যদিও তার আয়-উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়।
আর স্বল্প বুদ্ধি যুবককে মানুষের মাঝে গ্লানিময় করে
যদিও বংশ মর্যাদায় সে হয় অভিজাত।'
তিনি পৃথিবীর নশ্বরতা ও নিত্যতাকে মাকড়সার জালের সাথে তুলনা করে বলেছেন–
'নিশ্চয় দুনিয়া নশ্বর।
এর কোনো স্থায়িত্ব নেই।
এ দুনিয়ার উপমা হলো মাকড়সার তৈরি করা ঘর।
হে দুনিয়ার অন্বেষণকারী!
দিনের খোরাকই তোমার জন্য যথেষ্ট।
আর আমার জীবনের শপথ!
খুব শিগগির এ দুনিয়ার বুকে যারা আছে,
সবাই মারা যাবে।'
তিনি দুনিয়াকে সাপের সাথে তুলনা করেছেন এভাবে–
'দুনিয়া হলো সেই সাপের মত যে বিষ ছড়ায়;
যদিও তার দেহ নরম ও কৃশকায়।'
দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ-দুঃখে ধৈর্যহারা না হওয়ার কথা বলেছেন এভাবে–
'যুগ বা কাল যদি আমাকে দুঃখ দেয়
তাহলে আমি সংকল্প করেছি ধৈর্য ধরার।
আর যে বিপদ চিরস্থায়ী নয় তা খুবই সহজ ব্যাপার।
আর যুগ যদি আনন্দ দেয় তাহলে উল্লাসে আমি মাতি না।
আর যে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী তা একান্ড় তুচ্ছ ব্যাপার।'
খায়বার যুদ্ধের দিন মারহাব ইহুদি তরবারি কোষমুক্ত করে নিম্নের এই শ্লোকটি আওড়াতে আওড়াতে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান জানায়–
'খায়বার ময়দান জানে যে, আমি মারহাব।
আমি অস্ত্রধাণকারী,
অভিজ্ঞ বীর-যখন যুদ্ধের দাবানল জ্বলে ওঠে।'
এক পর্যায়ে হজরত আলী (রা.) এই শেণ্টাকটি আবৃত্তি করতে করতে অসীম সাহসিকতার সাথে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন–
"আমি সেই ব্যক্তি যার মা তাকে 'হায়দার' নাম রেখেছে।
আমি জঙ্গলের বীভৎস দৃশ্যরূপী সিংহ।
আমি শত্র" বাহিনীকে সানদারাড় পরিমাপে পরিমাপ করি।
অর্থাৎ তাদের পূর্ণরূপে হত্যা করি।"
উহুদ যুদ্ধের পর হজরত আলী (রা.) হজরত ফাতিমার (রা.) কাছে এসে বললেন, ফাতিমা! তরবারিটি রাখ। আজ এটি দিয়ে খুব যুদ্ধ করেছি। তারপর তিনি এই দু'টি শ্লোক আবৃত্তি করলেন–
'হে ফাতিমা!
এই তরবারিটি রাখ যা কখনো কলঙ্কিত হয়নি।
আর আমিও ভীর" কাপুর"ষ নই এবং নই নিচ।
আমার জীবনের কসম!
নবী আহমাদের সাহায্যার্থে এবং বান্দার সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত
প্রভুর সন্তুষ্টি বিধানে আমি এটাকে ব্যবহার করে

পুরনো করে ফেলেছি।'

কবিতা সম্পর্কে হজরত আলীর (রা.) মনোভাব তাঁর একটি মূল্যবান উক্তিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন– 'কবিতা হলো একটি জাতির দাঁড়িপাল্লা (অথবা তিনি বলেছেন) কথার দাঁড়িপাল্লা।' অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লা দিয়ে যেমন জিনসপত্রের পরিমাপ করা হয়, তেমনি কোন জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতি, সভ্যতা, নৈতিকতা ও আদর্শের পরিমাপ করা যায় তাদের কবিতা দ্বারা। তিনি শুধু নিজে একজন উঁচু মানের কবি ছিলেন শুধু তাই নয়, বরং অন্য কবিদেরও তিনি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। তাদের কবিতার যথাযথ মূল্যায়নও করতেন। যেমন– একবার এক বেদুঈন তাঁর কাছে এসে কিছু সাহায্য চাইলো। তিনি তাকে একটি চাদর দান করলেন। লোকটি যাওয়ার সময় তার নিজের একটি কবিতা শোনালো। এবার হজরত আলী (রা.) তাকে আরো পঞ্চাশটি দীনার দিয়ে বললেন, শোন, চাদর হলো তোমার চাওয়ার জন্য, আর দীনারগুলো হলো তোমার কবিতার জন্য। আমি রাসূলকে (সা.) বলতে শুনেছি যে, তোমরা প্রত্যেক লোককে তার যোগ্য আসনে সমাসীন করবে।'

তিন.

রাসূল (সা.) কবি ও কবিতাকে ভালোবাসতেন। কবিকে যথাযথ মর্যাদা দিতেন। পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সহযোগিতা করতেন। অনুপ্রেরণা দান করতেন। রাসূলের (সা.) এই কর্মধারায় সাহাবীগণও অভিষিক্ত ছিলেন। হজরত আলীও (রা.) কবি ও কবিতাকে যেমন ভালোবাসতেন, তেমনি তার পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতাও করতেন। রাসূলের (সা.) প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য ও শিক্ষায় উদ্ভাসিত ছিলেন তাঁরা। যে কারণে সমরে কিংবা শান্ড়িতে, শাসকের দায়িত্ব পালন কালে, নেতৃত্ব প্রদান কালে; অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় তাঁরা কবি ও কবিতাকে যথাযথ সম্মান, মর্যাদা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে গেছেন, যা আজ এবং আগামীর জন্য এক যুগান্ড়কারী দৃষ্টান্ড়স্বরূপ। সুতরাং কবি ও কবিতার যথাযোগ্য মূল্য ও মর্যাদা দেয়া সুন্নতেরই একটি বড় অধ্যায়।

বেদনার বিষয় বটে, আজকে যারা নেতৃত্বের আসীনে অধিষ্ঠিত, তাঁদের কাছে কবি ও কবিতার বিশেষ কোনো মূল্য বা মর্যাদা আছে বলে মনে হয় না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিরাই নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, বঞ্চিত এবং লাঞ্ছিত। এটা কোনো ক্রমেই শুভ লক্ষণ নয়। কাম্যতো নয়-ই। স্মরণ রাখা উচিত, বিশ্বাসী কবিদের কবিতা ইসলামী সমাজ গঠনে, আদর্শিক সংস্কৃতি বিকাশে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সবিশেষ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং যাদের এতটা অবদান সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে, সেই সকল কবি-সাহিত্যিকদের প্রতিও ইসলামের নেতৃবৃন্দসহ সকলের সুদৃষ্টি রাখা একান্ড় প্রয়োজন। প্রয়োজন কবি ও কবিতার যথাযথ মর্যাদা ও মূল্য দেয়ার। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা করার। তাহলেই বিশ্বাসী কবিতার ধারা আরও বেগবান হয়ে উঠবে। আর তাতে করে সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সবুজ চত্বর আরও বেশি সম্প্রসারিত হবে। একটি সবুজ-সুন্দর পৃথিবী ও সমাজ বিনির্মাণের জন্য কবি ও কবিতার ভূমিকা অনিঃশেষ। বিষয়টির প্রতি সকলের সবিশেষ গুর"ত্ব দেয়া অত্যন্ড় জর"রি বলে মনে করি।

লেখক : কবি, কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক।

আদর্শ সমাজ গঠনে মহানবী (সা.)

-সৈয়দ আবদাল আহমদ

মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। আমাদের মহানবী হজরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন আল্লাহ প্রেরিত নবী ও রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। মানবজাতির সত্য পথের দিশারী মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন বিশ্বশান্তির অগ্রদূত। তিনি 'সাইয়্যেদুল মুরসালীন', 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' ও 'উসওয়াতুন হাসানাহ্'।

আরব যখন চরম জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত, তখন সেই ঘোরতর অন্ধকারে ভূপৃষ্ঠে হেদায়েতের আলোকবর্তিকা নিয়ে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে ১২ রবিউল আউয়াল মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে মা আমিনার গর্ভে রাসূলুল্লাহর (সা.) শুভাগমন ঘটে। তাঁর ওপর অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনের আলোকে তিনি জাহেলি যুগের অন্যায়, অবিচার ও অজ্ঞানতার অবসান ঘটান। মানুষকে পরিচালিত করেন ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের আলোকিত পথে।

শান্তি, মুক্তি, প্রগতি ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে কেবল মুসলমান বা আরবদের জন্য প্রেরণ করা হয়নি, তাঁকে সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য প্রেরণ করা হয়। তাই পবিত্র কুরআনে তাঁকে বলা হয়েছে, তিনি 'রাহমাতুল্লিল আলামীন'। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করেছি।' (সূরা আল আম্বিয়া : ১০৭)।

মানবজাতির শিক্ষকরূপে রাসূলুল্লাহ (সা.) একাধারে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। তাঁকে যে সমগ্র মানবজাতির অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে, তা তাঁর সব কথায় ও কাজে সুস্পষ্ট। হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন একাধারে একজন আদর্শ পিতা, একজন আদর্শ স্বামী, একজন আদর্শ যোদ্ধা, একজন আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক এবং একজন আদর্শ ধর্মপ্রচারক। তাঁর জীবন ও চরিত্র ইতিহাসে এত স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাঁর কথা ও কাজের বিবরণ সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

সমাজে মহানবীর (সা.) শান্তি প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ ও পদ্ধতি ছিল অনন্য। যুদ্ধ-বিগ্রহ, কলহ-বিবাদ, রক্তপাত, অরাজকতা ইত্যাদি দূর করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির ভিত্তিতে তিনি একটি অনুপম আদর্শ কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

ইসলামী জীবনবিধানের মূল উৎস হচ্ছে কুরআন। আর রাসূলের (সা.) জীবন হচ্ছে কুরআনি আদর্শের বাস্তব রূপায়ন। এজন্য তাঁকে জীবন্ত কুরআন বা কুরআনের প্রতিচ্ছবি বলা হয়। মহান আল্লাহ তাই ঘোষণা করেন, 'রাসূলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।' যে আদর্শ দেড় হাজার বছর ধরে মানুষের মধ্যে জীবন গড়ার অতুলনীয় উৎস হিসেবে কাজ করে চলেছে। মানুষ কীভাবে আদর্শ জীবনযাপন করতে পারে, সুন্দর সমাজ ও দেশ গড়তে পারে, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে এক শান্তিময় বিশ্বের অধিবাসী হতে পারে– হজরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কর্ম দিয়ে, আচরণ দিয়ে, উপদেশ দিয়ে প্রকৃতপক্ষে তারই পথনির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাঁর মহান জীবনের প্রতিটি ধারায় অনুশীলনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসমূহে সমৃদ্ধ জীবনচরিতই হতে পারে আমাদের কল্যাণ লাভের জন্য এক অনন্ত প্রেরণার উৎস।

প্রিয় নবীজি নিজের ছাগলের দুগ্ধ নিজে দোহন করতেন। নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন। নিজের ছেঁড়া জুতা নিজে ঠিক করতেন। গৃহস্থলীর কাজকর্মও করতেন। তিনি বিনয় ও সরলতার বিস্ময়কর আদর্শ প্রতীক ছিলেন। তিনি মেঝেতে বসতেন, দেহরক্ষী ছাড়াই বাজারে যেতেন। এমনকি দরিদ্র জনগণ মাঝে মাঝে তাঁকে দাওয়াত দিত এবং তিনি তাদের সঙ্গে আহার করতেন। যা-ই দেয়া হতো কৃতজ্ঞতার সঙ্গে খেতেন। এই গুণের কথা সূরা আত তাওবার ৬১ নম্বর আয়াতে আমরা পাই– 'ওহে! তিনি সকলের কথা শুনেন, যে ধরনের ব্যক্তিই তাঁকে ডাকেন তিনি তার ডাকে সারা দেন।'

নবুয়্যত লাভের পর তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল, মাসের পর মাস তাঁর চুলায় আগুন জ্বলেনি। কেননা ঘরে রান্না করার মতো কিছু ছিল না। তাঁরা পানি বা খেজুর খেয়ে এবং মদীনাবাসীর দেয়া দুধ পান করে জীবনযাপন করতেন। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহর (সা.) জীবনচরিত। হজরত বিলাল (রা.) যিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন, তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) যখনই কোনো দিক থেকে হাদিয়াস্বরূপ কিছু পেতেন, তা গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন এবং কখনও নিজের জন্য কিছু রেখে দিতেন না।

কন্যাশিশুকে জীবন্ত করব দেয়া এবং দাসপ্রথা তিনিই প্রথম উচ্ছেদ করেন। নারীর মর্যাদা তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই ঘোষণা করেন মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।

চলমান বিশ্বে তার সুবিচার ও সুশাসন কায়েম থাকলে আজকের এই যে সামাজিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা তা বিরাজমান থাকত না। রাসূলুল্লাহ (সা.) উচ্চমর্যাদার বিষয়ে জগৎখ্যাত সকল মনীষীই ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অমুসলিম লেখক উইলিয়াম হার্ট তার 'দ্য হানড্রেড' গ্রন্থে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে বলেছেন– পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রভাবশালীদের তালিকায় আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বেছে নিয়েছি। আমার এ পছন্দ কোনো কোনো পাঠককে বিস্মিত করতে পারে। কিন্তু ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব, যিনি ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয়ক্ষেত্রেই সর্বাঙ্গীণ সাফল্য লাভ করেছেন।

বিশ্বনবীর জীবন ও দর্শন সবার জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ। প্রখ্যাত দার্শনিক বার্নার্ড শ হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানবতার ত্রাণকর্তা বলে আখ্যায়িত করে জোরালো ভাষায় স্বীকার করেছেন, ইসলমাই কেবল শান্তিময় পৃথিবী গড়তে সক্ষম।' সমস্যাজর্জরিত বর্তমান বিশ্বে সামাজিক শান্তি ও মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে তিনি যথার্থই বলেছেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর মতো কোনো ব্যক্তি যদি আধুনিক জগতের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন, তাহলে এমন এক উপায়ে তিনি এর সমস্যা সমাধানে সফলকাম হতেন; যা পৃথিবীতে নিয়ে আসত বহু কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও সুখ।

জীবনকে সুখময়, শান্তিময়, কল্যাণমুখী করতে হলে, পরিপূর্ণ মানবগুণে নিজের চরিত্রকে উজ্জ্বল করতে হলে, রাসূল (সা.)-এর জীবন থেকেই শিক্ষা নিতে হবে। এই জীবনের কোনো বিকল্প নেই। পবিত্র মিলাদুন্নবী (সা.)-এর পুণ্যময় দিনে আমাদের প্রত্যাশা হোক সর্বক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করা।

লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেসক্লাব।

সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব হজরত মুহাম্মদ (সা.)

-মুহাম্মদ ইয়াছিন আরাফাত

সফলতা অর্জনের জন্য মানুষ বহু পদ্ধতি, বহু কৌশল অবলম্বন করে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে সফল ব্যক্তিত্বদের অনুসরণ করা। সফল মানুষদের সবাই অনুসরণ করতে চায়। সফলতা যেখানে যে পদ্ধতিতে মানুষ ছুটে চলে সেখানে ধাবিত হয় সেই পদ্ধতি অনুসরণে। সফলতা মানুষের তীব্র আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। মানুষের সামগ্রিক কর্মতৎপরতাই সাফল্যের পেছনে ছুটে চলাকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। তাই তো মানুষ খুঁজতে থাকেন সফল মানুষদের। পৃথিবীতে যারা সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন তারা সকলের কাছেই গ্রহণীয়, বরণীয় এবং অনুসরণযোগ্য হয়েছেন। মানুষ অনুসরণ করতে চায় এমন ব্যক্তিত্বদের যাদের অনুসরণ করে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌছা যায়।

সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছার জন্য আমরা কতই না সফল ব্যক্তিত্বকে অনুসরণ করি। কত শত সফল ব্যক্তির জীবনী পড়ি। নিজে পড়ি অন্যকেও তা পড়তে, অনুসরণ করতে বলি। মাঝে মধ্যে আমাদের পিতা-মাতাও এমন সফল ব্যক্তিদের কথা শুনিয়ে সে অনুযায়ী আমাদের পথ চলতে বলেন। আমরা আমাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে এমন অনেক ব্যক্তিত্বের লেকচার শুনেছি যাদের অনুসরণে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের জীবনী আলোচনা করে আমাদের মোটিভেশন চালানো হয়েছে। আমরাও হরহামেশা লেখনীতে, বক্তব্য-বিবৃতিতে বহু সফল ব্যক্তিত্বের উদাহরণ টেনে অন্যকে উপদেশ দিই অনুসরণের। এই সকল উপদেশ, মোটিভেশন সফলতার পানে ছুটে চলা ব্যক্তির জন্য আশাব্যঞ্জক। কিন্তু নিরাশার দিক হলো, আমরা যাদের জীবনী পড়ে, যাদের সফলতার উদাহরণ টেনে সাফল্যের মোটিভেশন চালাই তাদের সফলতা জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিকে না হয়ে কোন না কোন একটা দিকে তারা সফলতার স্বাক্ষর রাখলেও তারাই আমাদের গোটা জিন্দেগীর অনুসরণীয় সফল ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়ে যান।

আমাদের অনেকেরই টেবিলে এ ধরনের অনেক সফল ব্যক্তিত্বের বইয়ের সমাহার থাকে। একবার আমি আমার এক বন্ধুর টেবিলে সফল ব্যক্তিদের জীবনীমূলক অনেক বইয়ের স্তূপ দেখে কৌতূহলবশত সবগুলো বই হাতে নিয়ে দেখলাম। বিশ্বের নামিদামি অনেক সফল ব্যক্তিত্বের বই ছিল সেখানে। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম সফল ব্যক্তিত্ব এবং মনীষীদের এত্তসব বই সংগ্রহের উদ্দেশ্য কী? প্রত্যাশিত উত্তরই পেলাম তার কাছে, এসব সফল ব্যক্তিত্বের অনুসরণে জীবনটাকে সফল করতে চায় সে। আমার বন্ধুটির কাছে জানতে চাইলাম আচ্ছা বন্ধু, সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব কে? যার জীবনে কোনো ব্যর্থতা ছিল না, যিনি সর্বক্ষেত্রেই সফল ছিলেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, যাকে নির্দ্বিধায় অনুসরণ করা যায়? আমার বন্ধুটি কিছুক্ষণ চিন্তা করেই জবাব দিল এমন সফল ব্যক্তিত্ব তো একজনই তিনি হলেন সর্বশেষ নবী মহামানব হজরত মুহাম্মদ (সা.)। বন্ধুকে শেষ প্রশ্নটি করলাম সত্যই যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে টেবিলে রাখা সফল ব্যক্তিদের বইয়ের সারিতে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সীরাতগ্রন্থ বা জীবনীমূলক বই নেই কেন? আমার বন্ধুটি এ প্রশ্নে খানিকটা বিব্রত হলো, মাথা নিচু করে বলল, আসলে বিষয়টি তো সেভাবে ভাবিনি।

যিনি জীবনের সব দিকেই ছিলেন সফল, সব বিভাগেই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। যিনি তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন-বৃদ্ধ– সব বয়সেই অনুকরণীয়। যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। আমরা বিষয়টি শতভাগ মুখে স্বীকার এবং অন্তরে বিশ্বাস করলেও তাঁকে অনুসরণ করতে আমরা অনেকেই ভুলেই যাই। তার জীবনালেখ্য দিয়ে সফল জীবনের চিত্র অঙ্কন করতে আমরা অনেকেই পিছপা হই। আমাদের বক্তব্য-বিবৃতি-লেখনীতে আমরা তাঁর উদাহরণ টেনে আনতে শঙ্কোচবোধ করি। কী দুর্ভাগ্য আমাদের! আমাদের পিতা-মাতাও তার জীবনী থেকে উদাহরণ আমাদের কমই দেন। শিক্ষকরা ক্লাসে যত বেশি পারেন বিভিন্ন সফল ব্যক্তিত্বের উদাহরণ দেন, কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উদাহরণ খুব কমই সামনে আনেন। তাহলে যাকে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকার করি, তাকে অনুসরণ না করে কীভাবে আমরা সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখি!

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবন। মানুষের জীবনের ব্যাপ্তি খুবই ছোট এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের। পৃথিবীর বয়স যত বাড়ছে মানুষের গড় আয়ু তত কমছে। ক্ষুদ্র জীবনেও সফল হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর সুন্দর স্বপ্ন আমাদের। ক্ষুদ্র এই জীবনে মানুষকে সফলতার সিংহাসনে আরোহণ করতে হলে বহু বাধা অতিক্রম করতে হয়। পার হতে হয় নানা সময়ে নানা সঙ্কট। জন্মের পর থেকেই মানুষকে প্রতিবন্ধকতা টপকাতে হয়। শিশু-কৈশোর, তরুণ-যুবক, বৃদ্ধ– এসব বয়সের গ িতে নানা বাধা প্রতিবন্ধকতা মাড়িয়েই মানুষকে সফলতার স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। একটি কথা আছে, মানুষের জীবনের যত বাঁক, বাধা-প্রতিবন্ধকতার তত হাঁক। এই বাধা প্রতিবন্ধকতার হাঁকডাক মাড়িয়েই মানুষকে সফলতার মঞ্জিলে পৌঁছতে হয়। কিন্তু যদি বলা হয় শিশু, কৈশোর তরুণ যুবক, বিবাহিত জীবন, বৃদ্ধ এবং মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ধাপেই সফল ছিলেন শ্রেষ্ঠ ছিলেন এমন একজন ব্যক্তিত্বের নাম বলো। হিসাব করে বললে দেখা যায়, সচরাচর আমরা যাদের নাম বলি

তারা কোনো একটি সময়ে কোনো একটি বয়সে কোনো এক বিষয়ে সফল ছিলেন। কিন্তু সব বয়সে সব সময়ে যিনি সফল ছিলেন, সব দিক থেকেই যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্বের অধিকারী তিনি হলেন সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)।

পৃথিবী সৃষ্টির শুর" থেকে এ পর্যন্ত যত বীর-মহাবীর, নেতা-মহানেতা, রাজা-মহারাজা, সমাজ সংস্কারক ও সফল ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটেছে, এঁদের সবাই সভ্যতার বিভিন্ন অংশে অসামান্য অবদান রেখেছেন। পৃথিবীতে তাদের বহু অমর কীর্তি স্থাপিত হয়েছে, তা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। এসব ব্যক্তি বহু জীবনদর্শন দিয়ে মানবজাতির উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন। এসব সফল ব্যক্তির অনুসরণ করেও অনেকেই সফলতার স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছেন। কিন্তু সফল এসব ব্যক্তিত্বের অবদান, চেষ্টা-সাধনা ও কৃতিত্ব অনেকাংশেই পূর্ণতা পায়নি। বরং তা ছিল আংশিক, অপরিপূর্ণ, জীবনের কোনো একটি বিষয়ে, কোনো একটি সময়ে বা ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু ইতিহাসে হজরত মুহাম্মদ (সা.) এমনই একজন মাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্র সফলতা ও কৃতিত্ব দিয়ে মানবজীবনের জন্য আদর্শ হয়ে রয়েছেন। তাঁর সফলতার এ অবদান শুধু ব্যক্তিজীবনেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্রীয়জীবন তথা সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সফল ব্যক্তিত্ব। একটি সুন্দর বসুন্ধরা বিনির্মাণে, একটি সফল ব্যক্তিত্বপূর্ণ জীবনগঠনে, পরিপূর্ণ অবদান, কীর্তি এবং দর্শন রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর জীবনেই।

অসংখ্য সফল ব্যক্তিত্বের জীবনী আমাদের সামনে রয়েছে। তাদের বহু সাফল্যের নজিরও রয়েছে আমাদের সামনে। কিন্তু এর কোনো একটিই মানুষের পরিপূর্ণ জীবনটাকে বদলায়নি। এর কোনো একটিই কোন ব্যক্তির জীবনে পূর্ণাঙ্গ সফলতা এনে দেয়নি; বরং প্রতিটি ঘটনাই আংশিক বা কিয়দংশ সফলতার মুখ দেখেছে। সফল ব্যক্তিদের প্রতিটি সাফল্যই ব্যক্তিকে পুরো না বদলিয়ে বা ভেতর থেকে না বদলিয়ে শুধু বাইরের পরিবেশটা বদলানোর চেষ্টা করেছে। বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাফল্যের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হলো, মানুষ ভেতর থেকে বদলে গিয়েছিল। শুধু বদলে যায়নি, বরং তাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনে সংঘটিত হয়েছিল আমূল পরিবর্তন। রাসূলের অনুসরণে একটি জাহেলি সমাজ আমূল পরিবর্তন হয়ে কল্যাণমুখী সমাজে পরিণত হলো। হজরত ওমর (রা)-এর মতো দোর্দ" প্রতাপশালী দাম্ভিক মানুষটি হয়ে গেলেন বিনয়ী সত্যনিষ্ঠ মানুষ। আওস এবং খাজরাজ গোত্রের দীর্ঘ ৪০ বছরের খুনকা বদলা খুনের নীতি পরিবর্তন হয়ে তারা হয়ে গেলেন পরস্পরের কল্যাণকামী। উচ্ছৃঙ্খল, মদখোর, হতাশ, যুবকরা রাসূল (সা.)-এর মতো ব্যক্তিত্বের অনুসরণে বিলাসী জীবনের মুখে পদাঘাত করে আদর্শিক জীবনযাপন করতে শুর" করলেন। একটি বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে এলো আলোকিত একটি সমাজ। এমন সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ছাড়া আর কে হতে পারেন?

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সফল এবং শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ছোটবেলা থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত রাসূল (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি ধাপই আমাদের জন্য অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয়। ছোটবেলায় শিশুদের মধ্যে রাসূল (সা.) ছিলেন আদর্শ শিশু। কারণ তিনি কখনো খেলার ছলেও শিশুদের আঘাত করেননি। রাসূল (সা.) যখন কিশোর বয়সে উপনীত হন, তখন তিনি আরবের জাহেলি সমাজের চিত্র দেখে ব্যথিত হন। সে সময়কার গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ বিগ্রহসহ বিধ্বস্ত সমাজের করুণ চিত্র রাসূল (সা.) উপলব্ধি করেন। কিশোর হওয়ার পরও তিনি সবাইকে সাথে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। কিশোর হয়েও সফল হন তিনি। প্রতিষ্ঠা করেন হিলফুল ফুজুল সংগঠন। ২৫ বছর বয়সে আরবের ধনাঢ্য মহিলা হজরত খাদিজা (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হজরত খাদিজা (রা.) ব্যবসার সকল দায়িত্ব রাসূল (সা.)-এর ওপর অর্পণ করেন। রাসূল (সা.) দক্ষতার সাথে সে দায়িত্ব পালন করেন। রাসূল (সা.)-এর হাত ধরে ব্যবসার ব্যাপক উন্নতি হয়। সে হিসেবে রাসূল (সা.) একজন সফল ব্যবসায়ীও বটে। ৪০ বছর ধরে চলা আওস এবং খাজরাজ গোত্রের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান রাসূল (সা.)। কাবাঘর মেরামতের সময় হাজরে আসওয়াদ কারা স্থাপন করবে এ নিয়ে সৃষ্ট সংঘাত ও উত্তেজনা রাসূল (সা.) সফলতার সাথেই সমাধান করেন।

৪০ বছর বয়সে নবুওয়ত লাভের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব আরো বেশি উদ্ভাসিত হয়। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রতিটি জীবনেই রাসূল (সা.) একজন শ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিজীবনে তিনি মহানুভব, পরোপকারী, দয়ালু, দানশীল ও হৃদয়বান। পারিবারিক জীবনে তিনি শ্রেষ্ঠ শিশু, শ্রেষ্ঠ কিশোর, শ্রেষ্ঠ যুবক, শ্রেষ্ঠ স্বামী, শ্রেষ্ঠ পিতা। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে একাধারে তিনি শ্রেষ্ঠ সফল রাষ্ট্রনায়ক, শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক, শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, শ্রেষ্ঠ সমরবিদ, শ্রেষ্ঠ কৌশলী, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী। মদিনায় রাষ্ট্রগঠনে রাসূলের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। মদিনা সনদ প্রণয়ন করে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা রক্ষায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। যুদ্ধ-বিগ্রহে বিজয়ী হয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে তিনি সাফল্যের নব দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তিনি সাফল্যের ষোলোকলা পূর্ণ করেছেন। এভাবে তার জিন্দেগির প্রতিটি ধাপের শ্রেষ্ঠত্ব ও সফলতা বর্ণনা করে সহজেই শেষ করা যাবে না।

রাসূল (সা.)-এর সীরাত বা জিন্দেগি আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে পড়ি তাতে শুধু আবেগতাড়িত হই। কারো ক্ষেত্রে এ আবেগ রাসূল (সা.)-কে জানতে উদ্বুদ্ধ করে মানতে নয়। এমন মুসলমানদের সংখ্যা নেহাত কম নয় যারা শুধু সওয়াব হাসিল করার জন্যই সীরাত তথা রাসূল (সা.)-এর জীবনীচর্চার আগ্রহ পোষণ করে থাকে। কোথাও কোথাও খুবই ধুমধামের সাথে

মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, কোথাও মিষ্টি-মুখা বিতরণ, কোথাও ফুলের ছড়াছড়ি, কোথাও আগরবাতি ও আতর-লোবানের মাত্রাতিরিক্ত ছড়াছড়ি এবং কোথাও বিচিত্র আলোকসজ্জা দ্বারা উক্ত বিশ্বাসেরই অভিব্যক্তি ঘটে। দুর্ভাগ্যবশত, এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রেরণা নিয়ে রাসূল (সা.)-এর জীবনী অধ্যয়ন করাতে আমরা খুব কমই সফল হচ্ছি। রাসূলের জীবনী থেকে জীবনের প্রতিটি ধাপের অনুসরণ করে তদনুসারে জীবনকে গড়ে তুলতে হবে– এরূপ মনোভাব দ্বারা আমরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছি না। ফলে জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা সাফল্যও পাচ্ছি না। এ কথা অনস্বীকার্য যে, মানুষ হয়েও তিনি এমন অতুলনীয় সাফল্যমন্ডিত জীবনের নমুনা পেশ করেছেন যা সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁর জীবনে ছিল অনেক গুণের সমাহার। তার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই যে, তার দৃঢ়তা-সাহসিকতা, নীতি-আদর্শ, কুরবানি-আত্মত্যাগ, দায়িত্বসচেতনতা, মানবতার সেবাসহ সামগ্রিক কাজই ছিল মানবতার কল্যাণে। তাই তো তিনি সফল হয়েছেন সর্বক্ষেত্রে, গড়েছেন এক পুণ্যময় জীবন, যা আমাদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে রয়েছে এবং তাঁর মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় আদর্শ রয়েছে।

আপনার প্রিয় ব্যক্তিত্ব কে? এমন প্রশ্নের জবাবে বহু লোককেই দেখেছি যারা তাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কেই বেছে নেন। কিন্তু সামগ্রিক জীবনে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ তারা অনুসরণ করেন না। তাদের জীবনাচরণ দেখলে সামান্যটুকুও বলার সুযোগ নেই যে, অমুকের ব্যক্তিত্ব হজরত মুহাম্মদ (সা.)। এসব ব্যক্তি প্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে রাসূলকে মনোনীত করেন ঠিকই, কিন্তু তার জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন না। অথচ হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ থেকে সমভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে একজন রাষ্ট্রনায়ক, একজন প্রশাসক, একজন শাসনকর্তা, একজন মন্ত্রী, একজন কর্মকর্তা, একজন মনিব, একজন চাকুরে, একজন ব্যবসায়ী, একজন শ্রমিক, একজন বিচারক, একজন শিক্ষক, একজন সেনাপতি, একজন বক্তা, একজন নেতা, একজন সংস্কারক, একজন দার্শনিক এবং একজন সাহিত্যিকও। সেখানে একজন পিতা, একজন সহযাত্রী ও একজন প্রতিবেশীর জন্য একই রকম অনুকরণীয় আদর্শ রয়েছে। মানুষ তার জীবনটিকে সাফল্যমন্ডিত করতে যে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম উৎকর্ষ অর্জন করা প্রয়োজন তার সবই আছে রাসূল (সা.)-এর ব্যক্তিত্বে। এজন্যই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব। সমগ্র মানব ইতিহাসে অনুসরণীয় 'শ্রেষ্ঠ মানুষ' কেবল এই একজনই।

রাসূল (সা.) যে অনুকরণীয়-অনুসরণীয় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তার ঘোষণা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূল (সা.)-এর জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।' (সূরা আহযাব : ২১)। রাসূল (সা.) যে সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তা সবসময়ই আলোচিত এবং স্বীকৃত। আল্লাহ মানুষের হেদায়েতের জন্য পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব, সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। মুসলমান তো বটেই, দুনিয়ার প্রায় সব অমুসলিম মনীষী, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, ঐতিহাসিকবেত্তা, গবেষক সবাই সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তি হিসেবে সাইয়্যেদুল মুরসালিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন তাদের বক্তব্য-বিবৃতি-লেখনীতে। আজকের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে সফল জীবন গঠন করার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ব্যক্তিত্ব হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত অনুসরণের বিকল্প নেই।

লেখক : এমফিল গবেষক।

মহানবী (সা.)-এর মহাবিপ্লবের ধারা ও প্রকৃতি

-ড. শাহ মুহাম্মদ আবদুর রাহীম

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে গোটা আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। শুধু আরব নয়, গোটাবিশ্ব যেন ঘৃণ্য দাসপ্রথা, সুদ-ঘুষ, জুয়া, মদ, লুণ্ঠন, ব্যভিচার, পাপাচার, অন্যায়-অনাচার ও মিথ্যাচারে ছেয়ে গিয়েছিল। এমনি এক দুর্যোগপূর্ণ যুগ-সন্ধিক্ষণে মহানবীর (সা.) আবির্ভাব। মহানবী (সা.) ঐসব অরাজকতার মূলোৎপাটন করে একটি সুন্দর, সুষ্ঠু ও আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ করে বিশ্বের বুকে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ঐতিহাসিক রেমন্ড লার্জ বলেন, প্রকৃতপক্ষে সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লবের প্রথম সূচনাকারী হিসেবে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকের নাম ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক গীবনও বিশ্বনবী প্রবর্তিত সংস্কারসমূহকে এক অতি স্মরণীয় বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেন। মহানবী (সা.)-এর এ মহাবিপ্লবের ধারা ও প্রকৃতির মৌলিক বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপ–

বিপ্লবের ধর্মীয় দিক

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু এবং শ্রেষ্ঠতম সংস্কারক। বিশ্বনবীর (সা.) আবির্ভাবকালীন ও তার পূর্বে বিশ্বের সর্বত্র ধর্মীয় অবস্থা ছিল শোচনীয়। তাওহিদের শিক্ষা কোথাও কার্যকর ছিল না। ব্যক্তিপূজা, প্রকৃতি পূজা, জড়পূজা এবং কল্পিত দেব-দেবীর পূজা চলছিল সর্বত্র। জাহেলিয়াতের তান্ডবলীলায় সর্বত্র মানবতার চির উন্নত শির

তুচ্ছ জিনিসের পদমূলে নত হচ্ছিল। মানবতার এহেন শোচনীয় অবস্থার যুগ সন্ধিক্ষণে পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা শিক্ষাগুরু মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-কে দুনিয়ায় পাঠালেন।

সর্বক্ষেত্রে একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা : ঈসা (আ.)-এর পর প্রায় ছয়শত বছর ধরে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের শিক্ষা পৃথিবীর কোথাও অবশিষ্ট ছিল না। মহানবী (সা.) বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানালেন মহান স্রষ্টার একত্ববাদের দিকে। সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, আইনদাতা ও নিয়ন্ত্রক একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি সর্বময় ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী। মহানবী (সা.)-কে তিনি তাঁর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'সার্বভৌমত্বের অধিকারী আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নেই।' মহানবী (সা.) মানবজাতিকে শিক্ষা দিলেন, আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকারের সাথে সাথে আল্লাহর ইবাদতে অত্মনিয়োগ করতে হবে। মহানবী (সা.) মানুষকে জীবনব্যাপী মহান আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে ব্যাপৃত থাকার শিক্ষা দিলেন। ইসলামী শরীয়তের মূল শিক্ষা কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত সম্পর্কে তাদের শিক্ষা দিলেন তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়তের বিধান চালু করলেন।

শিরকের মূলে কুঠারাঘাত : মহানবী (সা.) কয়েক যুগ ধরে লালিত পৌত্তলিকতা ও শিরকতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করেন। অসংখ্য দেব-দেবী ও মূর্তি রক্ষিত পবিত্র কা'বা গৃহকে পূতঃপবিত্র করে আবার মহান আল্লাহর একত্ববাদের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করেন। তিনি ধর্মীয় ক্ষেত্রে পৌত্তলিকতার নানা অনাচার ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে সমগ্র সমাজ সংগঠনকে শিরক মুক্ত করেন।

যাজকতন্ত্রের অবসান : অন্ধকার যুগে লোকদের ধারণা ছিল, জান্নাতের চাবিকাঠি একমাত্র ধর্মযাজকদের হাতে। তাদের খুশি করতে পারলে যত পাপই করা হোক না কেন জান্নাতে যেতে কোনো অসুবিধা হবে না। অলীক ধারণার অবসান ঘটান।

ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধারণার অপনোদন : ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধারণা ছিল, 'তারা যতই পাপকর্ম করুক না কেন, তাদের শাস্তি পেতে হবে না; পেলেও মাত্র চল্লিশ দিন কিংবা অল্প ক'দিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। কেননা তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন যীশু।' মহানবী (সা.) তাদের এ অলীক ও মিথ্যা ধারণার অপনোদন করে কোরানের বাণী শোনালেন, 'তোমাদের একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না।'

সকল নবী-রাসূলের প্রতি বিশ্বাস : মহানবী (সা.) শিক্ষা দিলেন, মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ও সৎপথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহপাক যুগে যুগে অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। সকল নবী-রাসূলের প্রতি সমানভাবে ঈমান আনতে হবে।

আখিরাতে বিশ্বাস : মহানবী (সা.) শিক্ষা দিলেন, এ দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়, এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, মৃত্যুর পর সবাই পুনরুত্থিত হবে এবং কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করবে ও কর্মফল ভোগ করবে। আখিরাত অনিবার্য। আখিরাতে বিশ্বাস ইমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তিনি জন্মান্তরবাদ বিশ্বাসের অবসান ঘটান।

বিপ্লবের সামাজিক দিক

মানবতার ভিত্তিতে সমাজ গঠন : বিশ্বনবী (সা.) দুনিয়ায় মানুষের প্রকৃত মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তন সাধন করেন। মহানবী (সা.) তাদের এহেন ভ্রান্ত ধারণার চির অবসান ঘটিয়ে আল কুরআনের ঘোষণা শোনালেন, 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু।' (সূরা হুজুরাত, ১৩)। মহানবী (সা.) মানুষে মানুষে গড়ে ওঠা কৃত্রিম অসাম্য, ভেদাভেদ, বংশমর্যাদার গর্ব বা কৌলিন্যের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি মানবতার আদর্শে সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলেন।

সংঘাতমুক্ত সমাজ : সমাজে চলতে থাকা দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অহেতুক রক্তপাত, লুণ্ঠন, যুদ্ধবিগ্রহের অবসান ঘটিয়ে মহানবী (সা.) একটি শান্তিময় সমাজ গঠন করতে সক্ষম হন।

শ্রেণী-বৈষম্যহীন সমাজ : মহানবী (সা.) উল্লেখ করেন, শুধু জন্ম-বংশ কিংবা ভাষা বা অঞ্চলের বিচারে মানুষের মর্যাদা ও প্রাধান্য হয় না। তাঁর ভাষায়- সকল মানুষ সমান, আর মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহর অধিক অনুগত ও মানুষের কল্যাণকামী। তিনি এ নীতির ভিত্তিতেই সমাজ গঠন করেন।

ঘৃণ্য দাসপ্রথার উচ্ছেদ : হজরত মুহাম্মদ (সা.)-ই সর্বপ্রথম দাসপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। দাসপ্রথা গ্রিক, রোমান, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মনিবগণ ছিল দাসদের জীবন-মরণের প্রভু। তাই তারা দাস-দাসীদের ওপর অমানুষিক আচরণ করত।

নারীজাতির মর্যাদা দান : মহানবী (সা.) নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মহানবীর (সা.) কল্যাণেই নারীজাতি সর্বপ্রথম পরিবারে ও সমাজজীবনে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদার আসন লাভ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, 'মায়েদের পদতলে সন্তানের জান্নাত।'

ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদ : মহানবী (সা.) ভিক্ষাবৃত্তি মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি সকলকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করার পরামর্শ দেন। তিনি ভিক্ষার হাতকে অভিশপ্ত মনে করতেন। তিনি বলেন, 'গ্রহীতার নিচের হাতের চেয়ে দাতার ওপরের হাত শ্রেষ্ঠতর।'

অশ্লীলতা ও অনাচারের মূলোৎপাটন : মহানবী (সা.) সমাজ থেকে যাবতীয় অনৈতিকতা, অশ্লীলতা, অনাচার, পাপাচার, ব্যভিচার, মদ, জুয়া, সুদ-ঘুষ ইত্যাদির মূলোৎপাটন করে একটি পবিত্র সুন্দর ও কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিপ্লব

আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা : মহানবী (সা.) মানুষের মনগড়া আইন ও নৈরাজ্যপূর্ণ শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শুধু দ্বীন ও ঈমানের ভিত্তিতে মদীনায় সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

আল কুরআনকে সংবিধান ঘোষণা : আল কুরআনকে মহানবী (সা.) ইসলামী রাষ্ট্রের মূল সংবিধান রূপে ঘোষণা করেন। বিদায় হজের ভাষণে তিনি বলেন, 'যারা কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে তারা পথভ্রষ্ট হবে না।'

লিখিত সংবিধান প্রণয়ন : মহানবী (সা.) মদীনায় গোত্রীয় সম্প্রীতি ও সংহতির জন্য সকলের সম্মতিক্রমে রাষ্ট্রীয় একটি লিখিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। এটাই মদীনা সনদ। একে পৃথিবীর প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয়।

শূরা-ই-নিজাম প্রতিষ্ঠা : মহানবী (সা.) শূরা-ই-নিজাম বা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ। তিনি পরামর্শভিত্তিক শাসনকার্য পরিচালনার রীতি প্রবর্তন করেন। তিনি বলেন, 'ঞযবহ পধহ নব হড় শযরষধভধঃয বীপবঢ়ঃ নু পড়হংঁষঃধঃরড়হ.' অর্থাৎ 'পরামর্শ ছাড়া খিলাফত নেই।'

কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন : মহানবী (সা.) গোত্রতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উচ্ছেদ করে কেন্দ্রীয় শাসন চালু করেন এবং মদীনাতে একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেন।

মৌলিক অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : সে যুগে 'জোর যার মুল্লুক তার', নীতি অনুসরণ করা হতো। এতে দুর্বলেরা নির্যাতিত ও নিগৃহীত হতো। মানবতার অকৃত্রিম বন্ধু মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) তা উচ্ছেদ করে সব মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে সমাজ হতে অপরাধ প্রবণতা চিরতরে বিলুপ্ত করেন।

নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি : প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে শান্তিতে বসবাস করার লক্ষ্যে মহানবী (সা.) সৎ ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেন।

অমুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা : মহানবী (সা.) অমুসলিম নাগরিকদের জানমাল, মানসম্মান ও নিজস্ব ধর্মানুষ্ঠান পালনের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করেন।

ঐশীতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয় : শাসনকার্যের সুবিধার্থে মহানবী (সা.) আরব দেশকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং উপযুক্ত শাসনকর্তা ও বিচারক নিযুক্ত করেন। মদীনার মসজিদে বসে তিনি নিজেও বিচার ও শাসনকার্যাদি সম্পন্ন করতেন। কুরআনের নির্দেশ, নিজের বিবেক-বুদ্ধি এবং পরামর্শকদের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি রাজ্য শাসন করে ঐশীতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। ঐতিহাসিক বোসওয়ার্থের (ইড়ংড়িৎঃয) মতে, 'যদি কেউ ঐশ্বরিক বিধানসম্মত শাসনবিধি প্রতিষ্ঠার গৌরব দাবি করতে পারেন, তবে তিনি হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া আর কেউই নন।'

অর্থনৈতিক বিপ্লবের মূলনীতি

ক. অর্থ উপার্জন নিয়ন্ত্রণ : মহানবী (সা.) আল কুরআনের মর্মানুযায়ী আয় উপার্জনের বৈধ পথনির্দেশনা দেন এবং অবৈধ উৎসসমূহকে বন্ধ করে দেন। যেমন– ১. হালাল উপার্জনকে উৎসাহিত করেন, ২. পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করার তাকিদ দেন, ৩. শ্রমের মর্যাদা এবং শ্রমিকের অধিকার ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'সর্বোত্তম আমল হলো বৈধ পন্থায় উপার্জন করা', ৪. ঘুষকে অবৈধ ঘোষণা করেন, ৫. প্রতারণা দ্বারা অর্থ উপার্জনের যাবতীয় উৎস বন্ধ ঘোষণা করেন, ৬. মজুদদারি ও কালোবাজারি বন্ধ ঘোষণা করেন, ৭. সুদকে হারাম ঘোষণা করেন, ৮. জুয়া, লটারি ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেন এবং ৯. মদ, শূকরসহ অবৈধ বস্তুর ব্যবসাকে হারাম করে দেন।

খ. অর্থ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ : মহানবী (সা.) অর্থ উপার্জনের উৎসসমূহ নিয়ন্ত্রণ করার সাথে সাথে অর্থ ব্যয়ের খাতগুলোর নিয়ন্ত্রণেরও ব্যবস্থা করেন। যেমন- ১. অপব্যয় রোধের ব্যবস্থা করেন। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেন, বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদও অপব্যয় করা যাবে না। কেননা আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।' (সূরা বনি ইসরাঈল : ২৭), ২. মদ-জুয়া ইত্যাদি গর্হিত কাজে অর্থ ব্যয় নিষিদ্ধ করেন, ৩. সুপথে ও কল্যাণের পথে অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ দান করেন, ৪. অর্থনৈতিক অধিকার ও হকদারের হক আদায় করার নির্দেশ দেন এবং ৫. দুস্থ-বিপন্ন মানবতার সেবায় অর্থ ব্যয় করার জন্য উৎসাহিত করেন।

গ. অর্থ সংরক্ষণে নিষেধাজ্ঞা : মহানবী (সা.)-এর অর্থনৈতিক সংস্কারের উল্লেখযোগ্য একটি দিক হচ্ছে– উপার্জিত অর্থ সম্পদ কল্যাণের পথে ব্যয় না করে সঞ্চয় ও পুঞ্জীভূত করাকে তিনি নিষেধ করেন।

ঘ. অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণ : মহানবী (সা.)-এর অর্থনৈতিক সংস্কারের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণও অন্যতম। যেমন– ১. জাকাত ব্যবস্থা প্রচলন, ২. খারাজ ও উশর ব্যবস্থা প্রবর্তন, ৩. গণিমত বা বিজিত সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা চালু, ৪. জিযিয়া কর ব্যবস্থার প্রবর্তন, ৫. আল-ফাই ব্যবস্থা প্রবর্তন। ৬. সাদকাহ ও ফিতরাহ ব্যবস্থা প্রবর্তন, ৭.

উত্তরাধিকার নীতির মাধ্যমে সম্পদের বণ্টন, ৮. শাসনকার্যের প্রয়োজনে অন্যান্য কর আরোপের ব্যবস্থা এবং ৯. সর্বপ্রকার অসাধুতা নিষিদ্ধকরণ।

বিপ্লবের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক

আরবের অধিবাসীরা কাব্যামোদী ছিল এবং কাব্য রচনা ও বর্ণনায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিল। কিন্তু তাদের রচনায় মৌলিক চিন্তাধারার অভাব পরিলক্ষিত হয়। আর তাদের কাব্যের বিষয়বস্তু অশ্লীল, শ্লেষপূর্ণ ও ব্যঙ্গাত্মক ছিল। আধুনিক যুগে শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, তা আরবদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড, তা বুঝতে পেরে হজরত মুহাম্মদ (সা.) বিদ্যার্জনকে প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক করেন। তিনি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলকে বুঝিয়ে দেন।

তিনি শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর জাগরণের সৃষ্টি করেন। তার ফলে মুসলমানগণ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মধ্যযুগে অপূর্ব সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শিক্ষা বিস্তার ব্যাপারে তিনি দুনিয়ার বুকে অনন্য আদর্শ রেখে গেছেন। তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশনার সারমর্ম হলো- সবার আগে শিক্ষা, জীবনব্যাপী শিক্ষা, শিক্ষা বাধ্যতামূলক, শিক্ষা সবার জন্য অর্থাৎ সর্বজনীন এবং শিক্ষাই সেরা।

মহানবী (সা.) সমাজ থেকে যাবতীয় অনৈতিকতা দূরীভূত করে সমাজের ভিত্তি নৈতিকতার ওপর স্থাপন করেন। তিনি ঘোষণা করেন, মিথ্যা সকল পাপের মূল। তিনি অনৈতিক কার্যকলাপ, পাপ-পঙ্কিলতা, অশ্লীলতা, ব্যভিচার-অনাচার ও যাবতীয় পাপাচার থেকে সমাজকে পবিত্র করে উন্নত নৈতিকতার পর্যায়ে উন্নীত করেন।

ইসলামই মানবতার মুক্তি সনদ

নবী মুহাম্মদ (সা.) মানবজাতিকে শিক্ষা দিলেন ইসলাম। এই ইসলামই বিশ্বমানবতার একমাত্র মুক্তি সনদ। মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত সকল দিক ও বিভাগে ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ বিধান রয়েছে। ইসলামের পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমেও মানুষ এ ধূলির ধরণীতেই পেতে পারে জান্নাতের সুখ-শান্তির ফল্গুধারা।

লেখক : গবেষক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক।

দীন প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কর্মকৌশল

-ডা. শিরিন আক্তার রুনা

আল্লাহ তায়ালার পরিচয় আমার পুঁজি,
পরিশুদ্ধ জ্ঞান আমার দীনের ভিত্তি
ভালোবাসা আমার মূলনীতি
আগ্রহ আমার বাহন
মহান আল্লাহর স্মরণ আমার সঙ্গী
আল্লাহর ওপর নির্ভরতা আমার ভান্ডার
নামাজের মধ্যে রয়েছে আমার দৃষ্টির প্রশান্তি
জ্ঞান আমার হাতিয়ার
ধৈর্য আমার ভূষণ,
আল্লাহর সন্তুষ্টি আমার গণিমত
বিনম্রতা আমার গৌরব
বিশ্বাস আমার শক্তি,
ন্যায়-পরায়ণতা আমার সহচর
আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যেই আমার মর্যাদা
সত্যের পথে সংগ্রাম আমার প্রকৃতি।

হজরত আলী (রা.) নবী করীম (সা.)-এর কাছে তার রীতিনীতি সম্পর্কে জানতে চাইলে এভাবে চমৎকার উত্তর দেন রাসূল (সা.)। সুবহানাল্লাহ! কী অসাধারণ, কী চমৎকার চারিত্রিক মাধুর্য। হ্যাঁ, মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী নিছক সাধারণ কোনো ব্যক্তি জীবনী নয়, বরং তা হচ্ছে এমন এক ঐতিহাসিক শক্তির জীবন বৃত্তান্ত যা একজন মানুষের আকারে আবির্ভূত হয়েছিল। এটা জনজীবন বিচ্ছিন্ন এমন এক দরবেশের কাহিনী নয়, যিনি লোকালয়ের এক প্রান্তে বসে শুধু নিজের সংশোধন ও আত্মগঠনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। বরং এই হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির জীবন কাহিনী, যিনি ছিলেন একটা সামষ্টিক আন্দোলনে চালিকাশক্তি। এটা শুধু একজন মানুষের নয়, বরং এ হচ্ছে নতুন মানুষ গড়ার কারিগর এ জীবন

কাহিনী। এই জীবন কাহিনীতে রয়েছে এক নতুন বিশ্ব নির্মাতার কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের বিস্ড়রিত বিবরণ। প্রখ্যাত লেখক নঈম সিদ্দিকী রাসূলের বৈশিষ্ট্য এভাবে তুলে ধরেছেন–

'রাসূল (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি দিক অন্যান্য দিকের সাথে পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ এবং প্রতিটি দিক একইরকম পূর্ণতা ও উৎকর্ষতা দ্বারা শোভিত। যেখানে গুর"গম্ভীরতার প্রতাপ রয়েছে যেখানে সৌন্দর্যের চমকও রয়েছে। সেখানে আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি রয়েছে বৈষয়িকতার সমন্বিত অবদান। পরকালের চর্চার পাশে হাত ধরাধরি করে রয়েছে অর্থনৈতিক চিন্ড়া ধারাও। দীনের সাথে আছে দুনিয়াও। এক ধরনের আত্মনিবেদিত ভাব থাকলেও সেই সাথে আত্মমর্যাদাবোধও রয়েছে অম্লান।

'আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী পাশাপাশি বিরাজ করছে আল্লাহর বান্দাদের প্রতি স্নেহ মমতা ও তাদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। কঠোর সামষ্টিক শৃঙ্খলার সাথে রয়েছে ব্যক্তির অধিকারের প্রতি সম্মানও। প্রগাঢ় ধর্মীয় চেতনা ও আবেগের সাথেই অবস্থান করতে সর্বাত্মক রাজনীতিও। জাতির নেতৃত্ব প্রদানে অষ্টপ্রহর ব্যস্ড় থাকলেও সেই সাথে দাম্পত্য জীবনের কর্মকা"ও সম্পাদিত হচ্ছে সুচার"ভাবে। মজলুমদের সাহায্যের পাশাপাশি জালেমদের প্রতিরোধের ব্যবস্থা রয়েছে সমানভাবেই।'

রাসূল (সা.)-এর জীবনচরিত আমাদের মধ্যে যথার্থ প্রতিফলন ঘটাতে পারে কেবল তখনই, যখন আমরা রাসূলের সমগ্র জীবন যে মহান কাজে নিয়োজিত ছিল এবং মহান লক্ষ্য বাস্ড়বায়নের সর্বাত্মক সংগ্রামে উৎসর্গিত ছিল, সেই একই লক্ষ্যে একই সংগ্রামে আমাদের জীবনকেও উৎসর্গ করতে পারব।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূল (সা.)কে প্রথম যে নির্দেশ দেন তা ছিল–

'পড়! তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'

(সূরা আলাক : ১)।

এবং পরবর্তী নির্দেশনা ছিল–

'হে চাদরাবৃত ব্যক্তি! জড়তা ছেড়ে ওঠ এবং মানবজাতিকে সতর্ক ও সাবধান কর'

(সূরা আল মুদ্দাসসির : ১-৩)।

রাসূল (সা.)কে দুনিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ আল্লাহ স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন

'তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত এবং দীনে হক দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি এ দীনকে অন্য দীনের ওপরে বিজয়ী করে দেন– মুশরিকদের নিকট তা যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন।' (সূরা তাওবা : ৩৩)।

উপরোক্ত আয়াতগুলোর দিকে খেয়াল করলেই খুব স্পষ্ট করেই বোঝা যায় রাসূল (সা.)কে এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে মানবজাতিকে সতর্ক করতে, পথ দেখাতে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পরিচয়, শ্রেষ্ঠত্ব মানব জাতির কাছে তুলে ধরতে তার আনুগত্য, হুকুম, নির্দেশের আলোকে পরিচালিত হতে। সর্বোপরি আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করতে, বিজয়ী করতে।

আর এই দীনকে বিজয়ী করতে, এই গুর"ত্বপূর্ণ বিরাট দায়িত্ব পালন করতেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। যে জ্ঞান দীন আন্দোলন পরিচালনায় সহায়ক শক্তি, কাজের কৌশল নির্ধারণের হাতিয়ার, সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নের মজবুত ভিত্তি। যে জ্ঞান রাসূল (সা.) অর্জন করেছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত আল কুরআনের মাধ্যমে। বুদ্ধি, বিবেচনা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, হিকমত, মেধা ও মননের অদ্ভুত এক সমন্বয় ছিল রাসূল (সা.)-এর চরিত্রে। নিজ জাতি ও সমাজের প্রতিটি সঙ্কটময় মুহূর্তে তিনি এই অনুপম বৈশিষ্ট্য, নৈতিকতা, বিচক্ষণতা, আধ্যাত্মিক ও মানবীয় গুণাবলীর দ্বারা সমাজকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করেছেন। কা'বা গাত্রে কৃষ্ণ কালো পাথর স্থাপন সংক্রান্ড় বিরোধ নিষ্পত্তিতে তার ওপর জনতার পূর্ণ আস্থা এবং তার প্রজ্ঞাপূর্ণ সমাধানের প্রতি গোটা আরব সম্প্রদায়ের সানন্দে সমর্থন ও অংশগ্রহণ থেকে মানুষ মহানবী (সা.)-এর সমাজসেবা ও সাংগঠনিক সমাজকল্যাণ কর্মসূচি এবং তার গণমুখী নীতির প্রমাণ পায়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত গোত্র, পর্যুদস্ড় জনগোষ্ঠী ও অনাথ পিতৃহীনদের পুনর্বাসন সংস্কার ইত্যাদি সর্বপ্রথম তিনিই আরবদের শিখিয়েছেন। হিলফুল ফুযুল বা ফজলগণের অঙ্গীকার তার সামাজিক কর্ম সাধনারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ড়। বিশ্বাস, আস্থা, জনপ্রিয়তার লাইম লাইটে উঠে আসাও কি একজন উদীয়মান জননেতা ও যুব ব্যক্তিত্বের সুনিশ্চিত কর্মকৌশলের প্রমাণ বহন করে না?

নবী করীম (সা.) চাচা আবু তালিবের ঘরে জীবনযাপন করলেও ব্যক্তিগত কর্ম ও দায়িত্ব পালন থেকে কখনোই পিছিয়ে যাননি। চাচার পরিবারের ঘরোয়া কাজে অংশগ্রহণ এবং তার পেশাগত দায়িত্বে সহযোগিতাই রাসূল (সা.)-এর মানবিক নৈতিকতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। চাচার সহযাত্রী হয়ে অখ" শামের উদ্দেশে বাণিজ্য যাত্রা তর"ণ মুহাম্মদের সমাজ ও জীবন ঘনিষ্ঠতারই বহিঃপ্রকাশ। তিনি যখন দৃষ্টি দিলেন বিশাল ভুবনে, দেখলেন জীবন সংগ্রামের বিস্ড়ৃত ময়দান। ব্যবসায়ী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলদের বাণিজ্য কাফেলার ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হয়ে গেলেন বাণিজ্যে। সুন্দর ব্যবস্থাপনা, সুদক্ষ পরিচালনা আর বিশ্বস্ড়তায় প্রচুর লাভ হলো বাণিজ্যে। বাণিজ্য কর্মীদের রিপোর্ট শুনে হজরত খাদিজা যুবক মুহাম্মদের সাথে বিয়ের প্রস্ড়াব পাঠালেন। মা খাদিজা হলেন নবুয়্যত পূর্বকালীন কর্মতৎপরতার একনিষ্ঠ সহায়িকা। নবী পরিবারের

সদস্যদের মধ্যে আরো ছিলেন ক্রীতদাস যায়েদ ইবনে হারিসা, যিনি নবীজীর পুত্র পরিচয় লাভ করেন, আর আদরের ছোট ভাই আলী (রা.)। চল্লিশ বছর বয়সে নবীজী নবুয়্যত লাভ করেন। যার আহ্বানে খাদিজা, আলী, যায়েদ প্রিয়নবীর প্রতি ঈমান এনে নতুন দীনের প্রথম মহিলা, কিশোর ও ক্রীতদাস সদস্যরূপে ইতিহাসে আসন লাভ করেন। আর বাইরের পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী হিসেবে মর্যাদা পান রাসূল (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সহচর, বন্ধু আবু বকর (রা.)। স্বাবলম্বী হওয়া, পরিবার গঠন, জীবিকার উপায় অবলম্বন, সামাজিক প্রতিষ্ঠার ভিত গড়া, পরিবার ও নিকটজনের আস্থা ও বিশ্বস্ড় তার চমৎকার এই অবস্থান কি উত্তম কর্মকৌশলের সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না?

রাসূল (সা.)-এর নবুয়্যত প্রাপ্তির পর সর্বপ্রথম তার নিকটাত্মীয়দের আল্লাহর উলুহিয়াত মেনে নেয়ার আহ্বান করেন। সত্যের দাওয়াত দানের সেই পদ্ধতি ছিল অসাধারণ। নবীজি নিজ গৃহে খানার দাওয়াত দিয়ে জমায়েত করলেন কুরাইশ হাশেমী নেতৃবৃন্দকে। আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা করলেন অতি বিনয় এবং আত্মবিশ্বাস ও বলিষ্ঠতার সাথে। কাজ হলো না তবে কম্পন সৃষ্টি হলো।

গোত্রবাসীর কাছে দাওয়াত পৌঁছালেন সেই সময়ের আরবের প্রচলিত নিয়মের আলোকেই। আবু কুবায়স পর্বতে আরোহণ করে ঘোষণা দিলেন তাওহীদের। ইসলামের প্রকাশ্য আহ্বান প্রচারের এ সূচনালগ্নে ব্যবহার করলেন ভাষা-বক্তৃতার এক নিটোল কৌশল। আমি যদি বলি এ পর্বতের পিছন থেকে এক দুর্ধর্ষ শত্রুদল ধেয়ে আসছে তোমাদের তছনছ করে দিতে, তোমরা কি বিশ্বাস করবে না? আরও বললেন, 'এক জীবন কাটিয়েছি আমি তোমাদের হয়ে। আমাকে তো তোমরা সত্যবাদী ও বিশ্বাসীরূপেই দেখেছো।' এভাবেই বিশ্বস্ড়তার একটি পরিবেশ তৈরি করে পৌঁছে দিলেন নতুন বার্তাটি।

রাসূল (সা.)-এর ভাষা, বক্তৃতা, অসাধারণ এক কর্মকৌশলের এক উত্তম উদাহরণ। তিনি ব্যাপক অর্থবোধক ও বিশ্লেষণ সাপেক্ষ বিষয়াদি অতি অল্প কথায় সহজে বোধগম্য ভাষায় ব্যক্ত করতেন। নবী করীম (সা.) জনগণের উদ্দেশে পথনির্দেশনামূলক ভাষণ দিয়েছেন। তার ভাষণ কখনো এতটা দীর্ঘ হয়নি যে শ্রোতাদের মনে বিরক্তি সৃষ্টি করবে অথবা এমন সংক্ষিপ্তও হয়নি যে শ্রোতাদের সঠিক বিষয়টি বুঝাতে অক্ষম হবে। তার পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণিসমূহের প্রতিটি শব্দই ছিল দুস্প্রাপ্য মণিমুক্তা সদৃশ। প্রতিটি বাক্যই ছিল ব্যাপক অর্থবোধক অথচ সহজবোধ্য। ভাষণে তিনি এমন হৃদয়গ্রাহী ভাষা উচ্চারণ করতেন যা শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করতো। বোঝার সুবিধার্থে গুর"ত্বপূর্ণ বাক্যসমূহ তিনবার উচ্চারণ করতেন। রাসূল (সা.)-এর এমন কিছু উক্তি তুলে ধরা হলো–

'মানুষের পাথেয়র মধ্যে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহভীতি।'

'মনের গভীরে প্রতিষ্ঠিত করার শ্রেষ্ঠ বিষয় হচ্ছে বিশ্বাস।'

'সৌভাগ্যবান হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে অন্যের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।'

'আত্মার প্রাচুর্যতাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচুর্যতা।'

'স্বল্পতম সম্পদ যা প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট তা ঐ বিশাল সম্পদের তুলনায় উত্তম যা মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব থেকে অমনোযোগী করে দেয়।'

'সুচিন্ড়িত ও দৃঢ় সংকল্পের কর্মই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম কর্ম।'

'সবচেয়ে বড় অন্ধ হলো সেই পথভ্রষ্টতা যা সত্য সঠিক পথ শেখার পরও মানুষ তা গ্রহণ করে।'

নবী করীম (সা.) মদীনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজা বাদশাহ, সম্রাট তথা শাসকবৃন্দের কাছে পবিত্র কুরআনের আহ্বান পৌঁছানোর লক্ষ্যে দূতের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করতেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে তিনি যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন সেখানে তিনি লিখেছিলেন 'মুসলিম হও তাহলে শান্ড়িতে জীবনযাপন করতে পারবে।'

এছাড়া রাসূল (সা.)-এর হাদীসের বিশাল ভা"ারের দিকে তাকালেও চমৎকৃত হতে হয় প্রাঞ্জল, সহজ, মাধুর্যম"িত বর্ণনা দেখে।

বিরোধিতা যখন চরম পর্যায়ে আরকাম (রা.) এফ ঘরে তখনও প্রিয়নবীর মিশন চলছেই। রাতের আঁধারে নতুন মুসলমানরা সমবেত হয় এই ঘরে, আবার ফর্সা হবার আগেই তাদের ফিরে যেতে হয় নিজ নিজ ঠিকানায়। রাসূল (সা.) দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! খাত্তাবের পুত্র ওমর অথবা আবুল হিকাম ওমর, এদের একজনকে ইসলামের জন্য কবুল করো।'

প্রভাবশালী ব্যক্তির দুর্বিনীত উত্থান ছাড়া শান্ড়, নিরীহ ও সরল মানুষের এ ছোট্ট কাফেলাটি অবরোধ ভাঙতে পারছে না। আঁচ করতে পেরেই নবীজি এ দোয়া করেছিলেন এবং খাত্তাব পুত্র ওমর ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের অন্ড়র্নিহিত শক্তিতে ব্যক্তিগত প্রভাব মিশিয়ে দার"ল আরকামের গোপন নামাজকে কায়েম করে দিলেন কাবা প্রাঙ্গণে।

জুলুম-নির্যাতন যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল তখন রাসূল (সা.) সাহাবীদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, তোমরা যদি মক্কা ভূমি ত্যাগ করে হাবশায় চলে যেতে পারো সেখানে এমন একজন বাদশাহ আছেন যার ওখানে কারো ওপর জুলুম করতে দেয়া হয় না। ওটা একটা ভালো দেশ। তোমাদের বর্তমান বিপদ মুসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকে দূর না হওয়া পর্যন্ড় তোমরা সেখানেই অবস্থান করো।

হিজরতের জন্য দেশ হিসেবে হাবশাকে বাছাই করাটাও রাসূল (সা.)-এর কর্মকৌশলের অনেক বড় একটি নমুনা। শুধু তাই না তিনি এমন কিছু সাহাবীদেরই হিজরতের জন্য বাছাই করেছিলেন যারা একদিকে ছিলেন নির্যাতিত তেমনি অপরদিকে ছিল উন্নত নৈতিকতার অধিকারী, সাহসী এবং বিচক্ষণ। হিজরতের পর বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে যখন সাহাবীদের ডাকা হয় তখন সাহাবীরা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ড় নেন যে তারা কাটছাট না করে কোনো কিছু না লুকিয়ে গোজামিলের আশ্রয় না নিয়ে স্পষ্টভাবে কুরআনের আয়াত ও ইসলামকে তুলে ধরবেন। এতে বাদশাহ যা সিদ্ধান্ড় নেয় নেবে।

বাদশাহ বিভিন্ন প্রশ্নে জাফর বিন আবু তালিব জাহেলি যুগের সমাজ চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি আল্লাহর রাসূলের শিক্ষায় তাদের জীবন যে অর্থবহ ও বাস্ড়বসম্মত পরিবর্তন এসেছে তাও উপস্থাপন করেছেন অত্যন্ড় হৃদয়গ্রাহী ভাষায় যা ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় বাদশাহ নাজ্জাশীর অন্ড়রে। আমর ইবনুল আসের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তির কূটনৈতিক চালের মোকাবিলায় হজরত ঈসা (আ.)-এর নিখুঁত পরিচয় যেভাবে জাফর ইবনে আবু তালিব তুলে ধরেন তা একদিকে যেমন বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে তেমনি খ্রিষ্টান জগতের কাছে ইসলামের দাওয়াত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আজকের এই আধুনিক যুগেও একটি রোল মডেলের ভূমিকা রাখতে পারে। দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বন করতে বলা হয়েছে তার সফল বাস্ড়বায়ন আমরা এখানেই দেখতে পাই।

রাসূলের প্রকাশ্য দাওয়াতের সূচনালগ্নেই বাতিল শক্তি অনুমান করে ফেলেছিল, আসছে হজের মৌসুমে মুহাম্মদ আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা হাজীদের মধ্যে কুরআন প্রচারের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। তাই নেতৃস্থানীয় কুরাইশদের এক সম্মেলন ডাকা হয় এবং মুহাম্মদ (সা.) যেন কুরআনের বাণী প্রচার করার সুযোগ না পায় সেজন্য ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ড় নেয়া হয় যে মুহাম্মদকে জাদুকর হিসেবে উপস্থাপন করা হবে এবং সবাইকে এটাই বোঝানো হবে– এ লোকটি এমন ধরনের বাণী প্রচার করছে যে মানুষ তার বাপ, ভাই, বিবি, বাচ্চা এমনকি গোটা খান্দান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এই সিদ্ধান্ড়ের আলোকে কুরাইশদের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল হাজীদের মধ্যে প্রচার অভিযানে নামে পড়ে।

বাতিল শক্তির কৌশলের প্রধান দিক সব সময়েই ছিল অপপ্রচার ও মিথ্যা প্রোপাগা"া যা আজকের দিনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কারণে নতুন মাত্রা পেয়েছে। কিন্তু সত্যের নিজস্ব একটা শক্তি আছে। আপন মহিমায় মিথ্যা প্রোপাগা"ায় সকল ধুম্রজাল ছিন্ন করে সত্য তার স্থান নিতে সক্ষম। আর আল্লাহর বিধান হলো :

'তারা পরিকল্পনা আটে তাদের সকল সামর্থ্য উজাড় করে আর তাদের মোকাবিলায় আল্লাহও একটা পরিকল্পনা করে থাকে তার শান অনুযায়ী।' (সূরা আন নামল : ৫০)।

সূরা আত তাওবার ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

'তারা আল্লাহর নূরকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায় কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে পূর্ণ করবেনই। কাফেরদের কাছে তা যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন।'

উপরোক্ত এই ঘোষণারই বাস্ড়ব প্রতিফলন ঘটে হজের সময়টাতে। কুরাইশদের মিথ্যা প্রচার প্রপাগা"ায় সবাইকে মুহাম্মদ (সা.)-এর কথা শুনতে, কাছে যেতে আগ্রহী করে তোলে। আল্লাহর রাসূল (সা.) এই সুবর্ণ সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগালেন। যার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে আকাবার শপথ অনুষ্ঠিত হয়। এটা ছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক চেতনায় উজ্জীবিত চুক্তি।

এতে রাসূল (সা.)-এর হিজরত করে মদীনায় চলে যাওয়া স্থির হয় এবং এমন সর্বাত্মক ত্যাগের মনোভাব প্রতিফলিত হয় যে, মদীনার আনসারগণ রাসূল (সা.)-এর জন্য সমগ্র দুনিয়ার সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত থাকার ঘোষণা করেন।

হিজরতের সময় হজরত আলী (রা.)কে বিছানায় শুইয়ে রেখে যান– এর উদ্দেশ ছিল যে কেউ বলতে না পারে যে, মুহাম্মদ আমাদের গচ্ছিত আমানত, টাকা পয়সা গহনাগাটি সাথে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। কঠিন বিপদের এই মুহূর্তেও আমানতদারিতার এই দৃষ্টান্ড় যুগে যুগে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

হিজরতের পথে মদীনায় যাওয়ার পরিচিত পথটি মক্কা থেকে উত্তরের দিকে চলে গেলেও রাসূল (সা.) গিরি গুহায় দক্ষিণের রাস্ড়াকে বেছে নেন। মজার বিষয় হলো সওর গিরি গুহায় আশ্রয় নেয়ার লক্ষ্যে নবিজী বেছে নিয়েছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী এই রাস্ড়াটি। যেন মনে হয় তিনি ইয়ামিন বা হাদরামাউত যাবেন বলে মক্কা ছাড়ছেন। কি চমৎকার কর্মকৌশল প্রয়োগ করলে নবী মোহাম্মদ (সা.)।

মদীনার পথে একলোক হজরত আবু বকর (রা.)কে ডেকে বললেন– 'আপনার সাথী লোকটিকে তো চিনতে পারলাম না?' খুবই সতর্কভাবে সাবধানী জবাব দিলেন, ইনি? ইনি আমার রাহবার। পথ দেখানো তার কাজ। শঙ্কা কেটে গেলে নবীজি মৃদু হাসলেন এবং এই রহস্যময় উত্তরে হর্ষ প্রকাশ করলেন। লোকটি বুঝতে পারলো যে, নবীজি বোধ হয় আবু বকরের মর" ভ্রমণে পেশাদার কোনো পথ প্রদর্শক।

সত্যিই তো তিনি রাহবার। সত্য পথের দিশারী। বাচনিক কৌশলের এ ঘটনার প্রতি ব্যক্ত সমর্থন থেকে আমরা রাসূল (সা.) এর আদর্শের প্রাণময়তার সন্ধান পাই।

মদীনায় হিজরতের পূর্বেই মুসআব ইবনে উমায়েরকে (রা.) ইসলামী আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে প্রেরণ করা হয় এবং হজ মৌসুমে মদীনা থেকে আগত ব্যক্তিবর্গের সাথে চুক্তির মাধমে মদীনায় প্রিয় নবী (সা.)-এর পূর্ণ পরিচিতি ও তার আনুগত্যের প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত হয় তখনই আল্লাহর নির্দেশে তিনি মুসলিম জনগোষ্ঠীসহ সে নগরীতে হিজরত করেন। মদীনার প্রত্যেক পরিবারের আকুল ইচ্ছা ছিল নবীজি তার ঘরেই আবাস গ্রহণ করবেন। সবার এই জোরদার আবেদন একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দিলে তিনি উটের সাহায্য নেন। তিনি বললেন, এর পথ ছেড়ে দাও, উটনীটিই আল্লাহর আদেশক্রমে সঠিক স্থানে গিয়ে থামবে। হজরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) যখন রাসূল (সা.)-এর বসবাসের জন্য নিজেদের বেতন হিসেবে দ্বিতল গৃহটি ছেড়ে দিচ্ছিলেন নবীজি বললেন, আমার জন্য উপরের নয়, নীচের অংশটি খালি কর। লোকজন আসবে, বৈঠক হবে, তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে ওপরের কোঠায় থাকো। মসজিদে নববীর জন্য যে জায়গাটিকে ক্রয় করা হয়, এটি সাহল ও সোহায়েল ভ্রাতৃদয় বিনা পয়সায় রাসূল (সা.) দিতে চাইলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি। পিতৃহীনদের দান নিয়ে ইসলামের প্রথম কেন্দ্রীয় মসজিদ নয়, টাকা দিয়ে এটা কিনতে হবে। সাহল ও সোহায়েল বিনিময় গ্রহণ করলো। গোত্রীয় অসন্তোষ নিরসনে উটের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া, বসবাসের জন্য গৃহের নিচের অংশ নির্ধারণ এবং মসজিদ নববী নির্মাণে অনাথদের ভূমি নগদ মূল্যে ক্রয় ইত্যাদি কর্মকৌশল নিঃসন্দেহে নিপুণ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

হিজরত উত্তরকালে মদীনায় ইসলামী সমাজ কায়েমের সূচনাপূর্ব মুহাজিরের পুনর্বাসন মদীনাবাসী আনসারের একজনকে একজন মুহাজিরের দায়িত্বভার দেয়ার সুন্দর ও সহজ নিয়মে যে চিরন্তন ধর্মীয় ও সামাজিক বন্ধন রচিত হয় তার প্রভাবে গোটা ইসলামী যুগেই তার সুফল অব্যাহত রাখে। এতে করে মদীনায় শরণার্থী শিবির গড়ে ওঠেনি যা পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় এক ঘটনা।

মদীনার প্রাচীন গোত্রগুলো নানা ধর্মাবলম্বী নাগরিক, বিভিন্ন পেশার অধিববাসী নিয়ে রাসূল (সা.) একটি ঐতিহাসিক সমঝোতা স্মারক রচনা করেন যা 'মদীনা সনদ' নামে পরিচিত। এই সামাজিক সংবিধান ছিল দল-গোত্র-ধর্ম স্বার্থে পেশা ও নীতি নির্বিশেষে সকল মদীনাবাসীর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দলিল।

এই কাজটি বিশ্বনবীর কর্ম পরিকল্পনা ও কৌশলের প্রকৃষ্টততম প্রমাণ রূপে আমার উল্লেখ করতে পারি।

মদীনার নগরকর্তা হলেন হজরত মুহাম্মদ (সা.)। তার সাথে ইহুদি, অগ্নিপূজক ও মুশরিকদের ও সুন্দর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান থেকে ইসলামের সার্বজনীন আদর্শ ও বিশ্বশান্তির ধারণা পাওয়া খুব সহজে হয়ে ওঠে। প্রতিরক্ষা, সামাজিক সুবিচার, পেশাগত স্বাধীনতা, নৈতিক স্বকীয়তা, ধর্মীয় স্বাধিকার ও নাগরিক আনুগত্য বা শৃঙ্খলার মূলমন্ত্র নিয়ে রচিত হয় এই বহুজাতিক বহুমাত্রিক দলিল। এর মাধমেই সম্ভব হয়েছিল ইসলামের ধর্মীয় জিহাদে অমুসলিম নাগরিকদের সামাজিক অংশগ্রহণ। অমুসলিম মুনাফিকদের দল নিয়ে প্রিয় নবী যাত্রা করেছিলেন হক ও বাতিলের লড়াইয়ে। ওহুদ প্রান্তরে পৌঁছার পথে দুর্বলচেতা মুনাফিকরা কেটে পড়ে, তথাপিও রাসূল (সা.) প্রকাশ্যে এদের সমালোচনা, বহিষ্কার বা বিচার করেননি কেননা ঐক্য, সংহতি ও সামাজিক শৃঙ্খলা একজন শাসকের ইমেজকে শত্রুশক্তির সামনে উজ্জ্বল ও প্রভাবশালী রূপে তুলে ধরে।

অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মঘাতী তৎপরতায় সংবাদ শত্রুদের মধ্যে সাহস ও শক্তির বৃদ্ধি করে। মক্কার মুশরিকরা মদীনা আক্রমণ পরিচালনা করে প্রিয় নবীর নব অংকুরিত সুখী সমাজের ভিত তছনছ করে দেবার পরিকল্পনা আঁটে। অর্থ রসদ ও অস্ত্রের যোগান দেয়ার জন্য তারা যৌথ বাণিজ্যের কাফেলাসহ আবু সুফিয়ানকে অক্রমণ চালানোর মাধ্যমে শত্রুর সমর শক্তি বিনাশ এবং নিজেদের ফেলে আসা সম্পদ ও অধিকার আদায়ের যৌক্তিকতা নিয়ে মদীনার প্রতিরক্ষাবাহিনী ঘুরে বেড়ায় মক্কা, সিরিয়া মহাসড়কে। গোপনে গোপনে খবর পেয়ে আবু সুফিয়ান সমুদ্রে তীর বেয়ে মক্কায় পৌঁছে যায়। কিন্তু আক্রমণের নেশা তাকে আবারো টেনে আনে নিরীহ মদীনার পানে। বদর প্রান্তরে যুদ্ধ বাঁধে। এরপর ওহুদ যুদ্ধ। যুদ্ধে রাসূল (সা.)-এর তাঁবু স্থাপন এবং জায়গা নির্ধারণ, সৈন্য বণ্টন, কাতারবন্দি, নেতৃত্ব ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেন।

সকল বিরোধী শক্তির সমন্বিত অভিযান, আহযাবের যুদ্ধে নবীজি তার অনুচর ইরানের সালমান ফারসির (রা.) পরামর্শ গ্রহণ করেন আরব বিশের অভিনব সমর পদ্ধতি। পরিখা খননের মাধ্যমে অরক্ষিত সীমান্তে ব্যারিকেড সৃষ্টির প্রয়াস। যা আরবীয় যোদ্ধাদের জন্য ছিল বিস্ময়কর। এছাড়াও প্রতিটি কাজে সাধনায় সংগ্রামে সাধারণ সৈনিকদের সাথে মহানবীর উদার অংশগ্রহণ, কাজের স্পৃহা গতি ও উৎকর্ষকে করে তুলতো বহুগুণে তেজী ও সাহসী। খন্দক বা পরিখা খননের সময় সাহাবীরা ক্ষুধাও তৃষ্ণার অবস্থাকে নবীজিকে অবহিত করলে তিনি নিজের পেটের দুখানা পাথর বেধে নিলেন পিঠকে সোজা রাখার জন্য যা ক্ষুধা কাতর সব সাহাবীরা অনুসরণ করল এবং সব সাহাবীদের ডেকে ঘোষণা করেন 'পরিখা খননে কোদাল চালনায় ছিটকে পড়া পাথর খন্ডের ওপর থেকে বিচ্ছুরিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমি পারস্যে রাজকীয় প্রসাদ দেখতে পাই। এ সবই তোমাদের করতলগত হচ্ছে অচিরেই।'

শত্রুর অর্থনৈতিক উৎস সমৃদ্ধির মূলে আঘাত, আক্রমণাত্মক, দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই, সহচরদের পরামর্শ ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো, ভিনদেশী প্রযুক্তি ব্যবহার, কর্মতৎপরতায় নিজের অংশগ্রহণ ইত্যাদি থেকেও উত্তম কর্মকৌশল ও সুন্দর পরিকল্পনার দিকনির্দেশনাই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বদরের বন্দীদের মধ্যে যারা মুক্তিপণ পরিশোধে অক্ষম, তাদের জন্য নবীজি শর্ত জুড়ে দেন- এরা প্রত্যেকে যেন মদীনার দশজনকে সাক্ষর ও শিক্ষিত করে তোলে। এই তাদের মুক্তিপণ। এ কেমন কর্মনৈপুণ্য। কত সুন্দর সমাধান!

নবুয়্যতের দশম বছর ছিল নবীজির জন্য শোকের বছর। এই বছরই তিনি তার অভিভাবক চাচা আবু তালিব এবং সুখ-দুঃখের বিশ্বস্ত সাথী বিবি খাদীজা (রা.)-কে হারান। বৈষয়িক ও মানসিক দুই দিক দিয়েই যারা ছিলেন রাসূলের (সা.) বড় অবলম্বন একদিকে মানসিক চাপ ও অপর দিকে কাফিরদের বেপরোয়া আচরণ মাত্রাতিরিক্ত জুলুমের অতীষ্ঠ হয়ে রাসূল (সা.) তাই যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন দিনে দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য। কিন্তু সেখানেও তায়েফের নেতৃবৃন্দের নির্দেশে গুন্ডা ও দুষ্টু প্রকৃতির যুবকরা এমনভাবে আহত করে যে তা বর্ণনাতীত। পাথরের পর পাথর মেরে রাসূল (সা.)-এর শরীরকে অসাড় করে দেয় এবং কিছু সময়ের জন্য রাসূল (সা.) বেহুঁশ হয়ে যান। আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত নবী মুহাম্মদ (সা.) ওতবা ও শায়বার আঙ্গুর বাগানের প্রাচীরের গা ঘেঁষে আঙ্গুর লতার ছায়ায় বসে পড়েন এবং খুবই চমৎকার মর্মস্পর্শী ভাষায় দোয়া করলেন। সাথে তায়েফবাসীর জন্য দোয়া করলেন তাদেরকে আল্লাহ যেন মাফ করে দেন। সেই মহানুভবতা, ক্ষমাশীলতা ইতিহাসের পাতায় যুগে যুগে অম্লান হয়ে থাকবে ।

রাসূল (সা.) এই মহানুভবতা ও কষ্টকর অবস্থা এবং সেই অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হয়ে জ্বীন জাতির একটি অংশ রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে তাওহীদের ঘোষণা দেন। এবং নিজেদের কওমের কাছে দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন ।

রাসূল (সা.) যখন আঙ্গুর বাগানে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে ছিলেন তখন ওতবা বিন রাবিয়া এবং শায়রা একটি বড় পাত্রে কয়েক গোছা আঙ্গুর পাঠালেন এক ইসায়ী গোলামের মাধ্যমে। রাসূল (সা.) গোলামের নাম পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দেন তার নাম আদ্দাস, ঈসায়ী এবং মিনওয়ার অধিবাসী। এরপর রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি মর্দে সালেহ ইউনুস বিন মাত্তাব বস্তির লোক? আদ্দাস জানতে চাইলে আপনি কিভাবে তাকে চেনেন? রাসূল উত্তর দিলেন, তিনি তো আমার ভাই, তিনিও নবী আর আমিও নবী। এই কথা শোনামাত্র আদ্দাস নবী (সা.)-এর দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করে ঈমানের ঘোষণা দিল। এবার রাসূল (সা.) মক্কার দিকে যাবার কৌশল নির্ধারণের চিন্তা করতে লাগলেন এবং হেরায় পৌঁছার পর বনি আবদে মানাফের একটি শাখা বনি নওফেলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মুতইম বিন আদির নিকট আব্দুল্লাহ বিন উবাইকেও পাঠালেন। কুরাইশদের যে পাঁচজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে আবু তালিবের বন্দী জীবনের অবসান ঘটানোর ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন মুতইম বিন আদী তাদের একজন। তিনি এ কঠিন বিপদের মুহূর্তে রাসূল (সা.)কে আশ্রয় দানের ঘোষণা করেন।

রাসূল (সা.) এর সফর ক্ষমাশীলতা, মর্মস্পর্শী দোয়া, গোলামের সাথে কথোপকথন, এবং মক্কায় ফিরে আসার যে কৌশলী ভূমিকা অবলম্বন করলেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং বাস্তবসম্মত।

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল কৌশলগুলো ইতিহাস সংরক্ষণ করেছে। রাসূল (সা.) সহস্রাধিক সাহাবীকে নিয়ে মক্কা সীমান্তে হুদাইবিয়ায় গিয়ে পৌঁছালেন। হজরত উসমান (রা.) গেলেন মক্কা নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে । প্রস্তাব : এবছর মোহাম্মদ (সা.) তার সহচরদের নিয়ে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করবেন । আত্ম রক্ষার তরবারি তাদের কোষবদ্ধ থাকবে । সমরসজ্জা থাকবে না । কিন্তু না, কাফের এতে রাজি হলো না। হুদাইবিয়ার নেতা সোহায়েল এলো সন্ধি চুক্তি সই করতে।

শর্ত: এ বছর নয় আগামী বছর ওমরা করবেন তারা । কোন ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা থেকে পালিয়ে গেলে তাকে মক্কাবাসীর হাতে তুলে দিতে হবে তবে কেউ মদিনা থেকে মুরতাদ হয়ে মক্কা পালিয়ে এলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না ইত্যাদি। উমরা ও মাতৃভূমি ভ্রমণের উদ্বেলিত উৎসাহে বিপত্তি আর বিনীত সন্ধি চুক্তির শোকে সাহাবীরা ক্ষুব্ধ এবং শোকাহত। হজরত ওমর উচ্ছ্বসিত আবেগে আপ্লুত হয়ে নবীজি কে জড়িয়ে ধরে অবোধ শিশুর মতো বলে উঠলেন, 'ও নবী! আমাদের মিশন কি সত্যনিষ্ঠ নয়? আপনি কি সত্য নবী নন ? তবে কেন এত অবমাননা, এত গ্লানি স্বেচ্ছায় মেনে নিতে হবে আমাদের?চ অব্যক্ত উচ্চারণের সাথে সব সাহাবী সোচ্চার-চ মর্যাদার লড়াইয়ে আমরা জীবন দিতে প্রস্তুত।'

অপূর্ব ধৈর্য ও অফুরন্ত স্থিরতা। শান্ত-সৌম্য অবয়বে আনত-নয়নে প্রিয় নবী (সা.) কেবলই অন্তর্মুখী। এতেই রয়েছে আমাদের সুস্পষ্ট বিজয়। মহাপ্রাপ্তি। এখানে শক্তি নয় যুক্তির হবে জয়। আবেগের নয় ত্যাগের। প্রাবল্যের নয় বিনম্রতার, সদাচারের।

তিনি সাহাবীদের মাথা মুড়িয়ে পশু কোরবানির নির্দেশ দিলেন। শোক ও অবদমিত উদ্বেলতায় সব অনড় ও নিশ্চল। নবীজি তাঁবুতে গিয়ে বিবি উম্মে সালমা বললেন ওরা যে আমার নির্দেশনা শুনছে না। উম্মে সালমা বললেন, আপনি মৌখিক

নির্দেশনা আর দেবেন না। নিজে গিয়ে এ আমলগুলো শুর“ করে দিন দেখবেন জানবাজ সাহাবীরা কর্মচঞ্চল হয়ে উঠবে নিমিষেই। আর ঘটলো তাই। দুই বছর পার হয়ে গেল। এর মধ্যেই সন্ধি চুক্তির সর্বপ্লাবী সুফল ইসলামকে বহুদূর এগিয়ে নিয়েছে। দুই হাজারের কম সাথী নিয়ে হুদায়ইবিয়ার অভিযাত্রী এবার দশ সহস্র সঙ্গী নিয়ে চলল মক্কা জয়ে। আল্লাহ কতই শক্তিমান, কত মহান।

রাসূল (সা.) বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে যখন মাজর“য রাহবান বানিয়েতে পৌঁছলেন এবং সেনা শিবির স্থাপন করলেন তখন প্রত্যেক সৈন্যকে নির্দেশ দিলেন প্রত্যেকে যেন আলাদা আলাদা চুলো জ্বালায় । কুরাইশদের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ যখন সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে আসলো তখন পাহাড় থেকে দশ হাজার চুলো জ্বলতে দেখে তারা স্ড়ম্ভিত হয়ে গেল। ভাবলো, কি সর্বনাশ এত বড় সেনাবাহিনী চলে এসেছে মক্কার দোরগোড়ায়? ভয়ে তাদের কণ্ঠ স্ড়দ্ধ হয়েই গেল। রাসূল(সা.)-এর এই কৌশল কুরাইশদের প্রচ” ভড়কে দিল এবং তা দেখে হতাশ করে দিল।

শত্রুর সাথে সংঘাতের চেয়ে কৌশলগত সমঝোতা ভালো। নীতিহীন প্রতিপক্ষের সাথে চুক্তিই উত্তম কেননা এটা তারা সহজেই ভঙ্গ করে এবং বিরোধী পক্ষকে অ্যাকশনে যাওয়ার বৈধতা এনে দেয়। পীড়িত হয়ে জনসমর্থন পাওয়া সহজ, আক্রমণের চেয়ে বিনম্র প্রত্যাবর্তন এ ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে সংগঠনকে গণমুখী করে। এসব কর্মকৌশলের ফলে হুদায়বিয়ার আপাত নতজানু সন্ধি বৃহত্তর ও চূড়ান্ড় বিজয়ের ভূমিকা রূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। সহকর্মীদের উচ্ছ্বসিত আবেগ নির“ত্তরে স্ড়মিত করে সময়ে এর সঠিক ব্যবহার প্রকৃত নেতার জন্য অবশ্য অপরিহার্য। কৌশলগত প্রয়োগ এ আদর্শও কম গুর“ত্বহ নয়।

মক্কা বিজয়ের পর সাধারণ ক্ষমা, আল্লাহর ঘরে আশ্রয় লাভকারীদের সুরক্ষা, অস্ত্র-সংবরণকারী স্বগৃহে অবস্থানকারীদের নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি এককালে চরম দুশমন আবু সুফিয়ানের বাড়িকেও নিরাপদ বলে ঘোষণা করা কত বড় কৌশল ছিল তা বলে বুঝানোর প্রয়োজন নেই। তাবুক অভিযান ইসলামের ইতিহাসে বিরাট তাৎপর্যের তাদের দাবি রাখে এবং এই অভিযানে রাসূল (সা.)-এর কর্মনীতি ও কর্মকৌশলও ছিল অসাধারণ।

তাবুক অভিযান এর সিদ্ধান্ড়টাও ছিল ব্যাপক অর্থবহ। রাসূল (সা.)-এর যুদ্ধনীতি ছিল তিনি কোন দিকে যাবেন এবং কার বির“দ্ধে যুদ্ধ হবে এটা শেষ পর্যন্ড় কাউকে বলতেন না কিন্তু এবার তিনি এ গোপনীয়তাটুকু রাখলেন না। পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন রোমের বির“দ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং সিরিয়ার দিকে যেতে হবে। তাঁবুক অভিযানটা ছিল ভাগ্যের চূড়ান্ড় ফায়সালা। এ সময় সাহস দেখাবার অর্থ দাঁড়ায় সারা দুনিয়ার ওপর এ আন্দোলনের বিজয়ের দরজা খুলে যাবে। অন্যদিকে এ সময় দুর্বলতা দেখাবার অর্থ হলো চিরদিনের জন্য সত্য লুটিয়ে পড়া। এমন একটা প্রতিকূল সময়ে তাবুক যুদ্ধের সিদ্ধান্ড় হয় যখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। আবহাওয়া যখন প্রচ” গরম, ফসল পাকা সময় এসে গেছে ,সওয়ারী ও সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা যখন বড়ই কঠিন ব্যাপার।

অর্থের অভাব ছিল প্রকট এবং দুনিয়ার দুইটি বৃহৎ শক্তির একটির মোকাবেলা করতে হচ্ছে তবুও আল্লাহর নবী এটাকে সত্যের দাওয়াতের জন্য জীবন-মৃত্যুর ফয়সালা করার সময় মনে করে এ অবস্থাতেই যুদ্ধ প্রস্ড়ুতির সাধারণ ঘোষণা জারি করে দেন এবং খুব চমৎকার একটা বক্তব্যের মাধ্যমে সাহাবীদের উজ্জীবিত করেন। তাবুক যুদ্ধে তিন সাহাবী, নারী, শিশু ও মুনাফিকরা ছাড়া সবাই অংশগ্রহণ করেন। রাসূল (সা.) দানের ব্যাপারে উৎসাহিত করার ফলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সামর্থের সবটুকু উজাড় করে দেয়। মুসলমানদের এই আত্মত্যাগ, মানসিক ও শারীরিক কষ্ট, পেরেশানী, পরিবেশের প্রতিকূলতা সব মিলিয়ে যে নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেই সময়ে মুসলমানরা যে সাচ্চা ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দেন তার ফল তারা তাবুকে হাতে হাতে পেয়ে যান।

কায়সার যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার আগেই মুসলমানরা মোকাবিলার সীমান্ড়ে পৌঁছে যায়। যার কারণে ভয় পেয়ে কায়সার তার সৈন্যবাহিনীর সরিয়ে নেয় । কায়সারের এভাবে পিছু হটে যাওয়ার ফলে নৈতিক বিজয় সূচিত হল এবং রাসূল (সা.) এ বিজয় থেকে রাজনৈতিক ও সামরিক ফায়দা হাসিলকে অগ্রাধিকার দেন। সেজন্যেই তিনি তাবুকে ২০ দিন অবস্থান করে রোম সাম্রাজ্য ও দার“ল ইসলামের মধ্যবর্তী এলাকায় যে বহু সংখ্যক ছোট ছোট রাজ্য এতদিন রোমানদের প্রভাবাধীনে ছিল, সামরিক চাপ সৃষ্টি করে তাদেরকে ইসলামী সাম্রাজ্যের অনুগত করেন। এর ফলে ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা সরাসরি রোম পর্যন্ড় বিস্ড়ৃত হলো। এভাবে রোম সাম্রাজ্যের সাথে একটি দীর্ঘমেয়াদী সংঘর্ষে লিপ্ত হবার আগেই ইসলাম সমগ্র আরবের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও বাঁধন মজবুত করে নেবার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে যায়। এটাই ছিল সবচেয়ে বড় লাভ।

মুতার যুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে সেনাপতি বাছাই এর প্রক্রিয়া ও যুদ্ধ কৌশল শেখানো, হুনায়েনের যুদ্ধে গনিমতের মাল বন্টনে নও মুসলিম, মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অতীব প্রতিপক্ষ পরিবারের ‘নব বন্ধু’ সদস্যদের অগ্রাধিকার প্রদান কৌশল ও প্রজ্ঞার সর্বোৎকৃষ্ট পর্যায়ে পড়ে।

কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাই রাসূল (সা.) এর কর্মকৌশল অতি উত্তম এক দৃষ্টান্ড়।

সাহাবীদের মধ্যে তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা আলোকে কাজ বন্টন করতেন। যেমন, খালিদ বিন ওয়ালিদকে, তিনি উপাধি দেন 'আল্লাহর তরবারী'। তার যুদ্ধ কৌশল, শক্তি, সাহস, বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতার আলোকে তিনি ময়দানের জন্য খালেদকেই বাছাই করে নেন। আরবের সেই সময় ছিল কাব্যচর্চার সোনালী যুগ। বাতিলপন্থী, মুশরিকরা যখন ইসলামকে ঘায়েল করার জন্য কবিতার বান ছুঁড়ে মারতো রাসূল (সা.) তখন রাসূল হাসসান বিন সাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে দায়িত্ব দিলেন চমৎকার কাব্যচর্চার মাধ্যমে বাতিলপন্থীকে উপযুক্ত জবাব এবং ঘায়েল করতে।

দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান, নৈতিকতার ধারক-বাহক ছোট্ট ওসামা বিন জায়েদকেও একটি যুদ্ধের সেনাপতি নির্বাচিত করেন যা রাসূল (সা.) দূরদৃষ্টির পরিচয় তুলে ধরে।

অহি লেখক হিসেবে নিযুক্ত করতেন উবাই ইবনে কাব (রা.), মুয়ায বিন জাবাল (রা.), যায়েদ বিন সাবিত (রা.), হজরত আমির ইবনুল আস (রা.) প্রমুখ সাহাবিকে যারা প্রচন্ড মেধা ও দৃঢ় শক্তির অধিকারী।

একটি জাতিকে উন্নত করতে হলে সামগ্রিকভাবে জাতিটিকে জ্ঞান সমৃদ্ধ করে তুলতে হয়। সত্যিকার অর্থে একটি জাতিকে উন্নত করতে হলে সেই জাতির বৈষয়িক ও নৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করতে হবে। আর পৃথিবীতে নীতি জ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে যারা আবির্ভূত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে সবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন রাসূল (সা.)।

অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণ জ্ঞান চর্চার গুরুত্ব প্রদান, জ্ঞানী ব্যক্তির মর্যাদা জ্ঞান বিতরণকারীর সমুহান কর্তব্য এবং বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে তার দিক নিদেশনা অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতিও রাসূল (সা.) কর্মকৌশলের অন্যতম একটি দিক।

তদানীন্তন বিশ্বের পরাশক্তি, পার্শ্ববর্তী রাজ্যের শাসকগণ প্রাদেশিক গভর্নরদের প্রতি পত্র দেয়ার মাধ্যমে তাদের সাথে ইসলামের প্রথম লেনদেন, শান্তি চুক্তি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সূত্রপাত করতে গিয়ে তিনি তার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার খলীফাগণের কর্মপন্থা নির্দেশ করে গেছেন।

আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্রের রাজধানী মদীনায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে প্রদেশভিত্তিক শাসক, বিচারক, রাজস্ব আদায়কারী, শিক্ষা ও সংস্কৃতি কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিযুক্ত করে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে দিয়ে তিনি ভবিষ্যৎ নেতৃত্বকে এগিয়ে যাওয়ার পথ ও প্রেরণা দিয়ে যান । শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র , আন্তর্জাতিক বিষয়দি বিচার, কৃষি, বাণিজ্য, কর্মসংস্থান ও সমর বিষয়ক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করে তিনি তার সকল দায়িত্ব সমাপ্ত করে হজরত আবু বকর (রা.)কে জাতির ইমাম নিযুক্ত করে যান। খোলাফায়ে রাশিদীনকে দিয়ে যান অনুসরণীয় আদর্শ প্রবক্তার স্বীকৃতি। বলে যান: দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি তোমাদের জন্য। এই দু;টি শক্ত করে আঁকড়ে থাকো পদচ্যুত হবে না।

এক. আল্লাহর কিতাব

দুই. আমার সুন্নাহ।

বিদায় হজে দিয়ে গেলেন তিনি পূর্ণতার ঘোষণা। শেষ ভাষণ পরিণত হল মানবতার মুক্তির চূড়ান্ত সনদ রূপে।

রাসূল (সা.)-এর পুরো জীবন সমস্ত কর্মতৎপরতাই ছিল হেকমতপূর্ণ, চমৎকার কর্মকৌশলে পরিপূর্ণ। যার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন একটা সুসংগঠিত ও সংঘবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয় । যার দলীয় শৃঙ্খলা ছিল অটুট এবং চারিত্রিক মান হয়ে উঠে উন্নত থেকে উন্নততর। এর যুক্তি খুবই ধারালো এবং আবেদন অসাধারণ রকমের চিত্তাকর্ষক। মক্কার সেই ছোট্ট চারা গাছটি পরিণত হয় বিশাল মহীরুহে।

রাসূল (সা.)-এর এই বিপ্লব শুধু বাইরের পরিবেশকেই বদলাইনি বরং ভেতর থেকে মানুষের মন মগজকেও পাল্টে দিয়েছেন এবং গড়ে তুলেছে এক একটা নতুন চরিত্র। প্রতিষ্ঠিত করেছে একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। ধর্মের সীমিত ও সংকীর্ণ ধারণার গন্ডি মাড়িয়ে তিনি পরিচালনা করেছিলেন একটি সর্বাত্মক আন্দোলন। কায়েম করেছিলেন দ্বীন তথা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানকে ।

রাসূল (সা.)-এর জীবন পরিপূর্ণ অনুসরণ, তার আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি, কর্মকৌশল সঠিকভাবে মেনে চলা, ধারণ করার মাধ্যমেই আমরাও পৃথিবী তৈরির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারি। সত্যের মশাল হাতে প্রতিটি অন্তরকে আলোকিত করে নতুন সম্ভাবনার একটি সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় সবাই। বাতিলের সমস্ত ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে তাগুতি শক্তিকে উৎখাত করে দৃঢ়তার সাথে জ্ঞান মেধা প্রজ্ঞা, হিকমত ও হিম্মতের সাথে এগিয়ে চলা আজ সময়ের দাবি।

'হে ঈমানদারগণ! সবরের পথ অবলম্বন করো, বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাও, হকের খেদমত করার জন্য উঠে পড়ে লাগো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।'

(সূরা আলে ইমরান : ২০০)

আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী সফল হবে ইনশাআল্লাহ।

লেখক : নারী অধিকার আদায়ে আন্দোলনের নেত্রী।

মুক্তিকামী মানবতার জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও প্রকাশ্য আদর্শ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)

-ড. মুহা. নজীবুর রহমান

বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাঁর সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রশংসা করে ঘোষণা করেছেন, 'আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।' (সূরা আল কলম : ৪)। অন্যত্র তিনি আরো ঘোষণা করেছেন, 'অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকালের সাফল্য প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।' (সূরা আল আহযাব : ২১)।

ইসলামের সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর জামানার লোকের সম্মুখে ছিল এবং তাঁর ইন্তিকালের পর বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় তা পুরোপুরি সংরক্ষিত হয়েছে। তাঁর জীবনের সামান্যতম অংশও এমন নেই যে, ঐসময়ে তিনি তাঁর দেশবাসীর দৃষ্টিসীমার বাইরে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ভবিষ্যতের প্রস্তুতিতে লিপ্ত ছিলেন।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের সকল বিষয়ই লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত আছে

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্ম, দুগ্ধপান, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, ব্যবসায়ে যোগদান, চলাফিরা, বিয়ে, নবুওয়ত-পূর্বকালের বন্ধু-বান্ধব, কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ ও চুক্তিতে অংশগ্রহণ, আল আমিন উপাধি লাভ, কা'বাগৃহে প্রস্তর স্থাপন, ধীরে ধীরে নির্জন প্রিয়তা, হেরাগুহায় নিঃসঙ্গ অবস্থান, অহি অবতরণ, ইসলামের দাওয়াত দান, প্রচার অভিযান, বিরোধিতা, তায়েফ সফর, মি'রাজ, হিজরত, যুদ্ধ, হুদায়বিয়ার সন্ধি, বিভিন্ন দেশে ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ, দ্বীনকে পূর্ণতা প্রদান, বিদায় হজ ও মৃত্যু-এর মধ্যে কোন সময়টি দুনিয়াবাসীর দৃষ্টিসীমার আড়ালে ছিল? তাঁর কোনো অবস্থানটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বেখবর ছিলেন? সত্য-মিথ্যা, ভুল-নির্ভুল, প্রত্যকটি বিষয়ই পৃথক পৃথক লিখিত আছে এবং প্রত্যকেই তা জানতে পারে।

মহানবী (সা.) এর ওঠাবসা, নিদ্রা-জাগরণ, বিয়ে-শাদী, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব, নামাজ-রোজা, দিবা-রাত্রের ইবাদত, যুদ্ধ-সন্ধি, চলাফেরা, সফর ও অবস্থান, গোসল, আহার-বিহার, হাসি-কান্না, বস্ত্র পরিধান, হাসি-ঠাট্টা, আলাপ-আলোচনা, নির্জনে ও জনসমাজে বিহার, মেলামেশা, আচার-ব্যবহার, দেহের বর্ণ ও গন্ধ, আকৃতি-প্রকৃতি, লম্বা-চওড়া; এমনকি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, একত্রে শয়ন ও পবিত্রতা অর্জন প্রভৃতি প্রত্যেকটা বিষয় সম্পূর্ণ প্রকাশিত, সর্বজনবিদিত ও সংরক্ষিত আছে। এখানে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত মাত্র একটি প্রাচীনতম কিতাব 'শামায়েলে তিরমিযী'র বিভিন্ন অধ্যায়ের শিরোনাম উল্লেখ করছি। এ থেকে আন্দাজ করা যায়, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্পর্কিত অতি তুচ্ছ বিষয়ও সংশ্লিষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর চেহারা ও গঠনাকৃতির আলোচনা, কেশ, পাকা কেশ, চুল আঁচড়ানো, চুলে খেজাব লাগানো, চোখে সুরমা লাগানো, পোশাক, জীবনযাপন, মোজা, পাপস, আংটি, মোহর, তলোয়ার, লৌহবর্ম, লৌহশিরস্ত্রাণ, পাগড়ি, পায়জামা, চলা, মুখে কাপড় ঢাকনা, বসা, বিছানা-বালিশ, হেলান দেয়া, আহার করা, রুটি, খাবার গোশত ও তরকারি, অজু করা, আহারের আগে ও পরে দোয়া পাঠ, পেয়ালা, ফল, কী কী পান করতেন, কীভাবে পান করতেন, খোশবু লাগানো, কীভাবে কথা বলতেন, কবিতা পাঠ, রাতে কথাবার্তা, নিদ্রা, ইবাদত, হাসি, রসিকতা, চাশতের নামাজ, গৃহে নফল নামাজ পড়া, রোজা, কুরআন পাঠ, রোনাজারি, বিছানা, নম্রতা, আচার-ব্যবহার, ক্ষৌরকাজ, নামসমূহ, জন্মতারিখ ও বয়স, মৃত্যুর বিষয়, মীরাস ও পরিত্যক্ত বস্তুর আলোচনা। এগুলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যক্তিগত অবস্থার বিবরণ। এর মধ্যে প্রত্যেকটি শিরোনামে কোথাও মাত্র কতিপয় এবং কোথাও বহু ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এ ঘটনাগুলোর প্রত্যেকটি দিক স্বচ্ছ ও দ্ব্যর্থহীন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের কোনো একটি মুহূর্ত পর্দারান্তরালে ছিল না। অন্তঃপুরে তিনি থাকতেন স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে এবং বাইরে আত্মীয়-বান্ধব ও ভক্তদের মজলিসে। দুনিয়ার বিরাট প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিও নিজের ঘরে সাধারণ মানুষই থাকেন। তাই ভল্টেয়ারের কথায় বলা যায়, 'কোনো ব্যক্তি নিজের ঘরে হিরো হতে পারে না।' বসওয়ার্থ স্মিথের মতে, 'এ নীতিটি কমপক্ষে ইসলামের পয়গাম্বরের ক্ষেত্রে সত্য নয়।'

প্রখ্যাত দার্শনিক গীবন বলেছেন, 'মুহাম্মদের মতো অন্য কোনো পয়গাম্বর তার অনুসারীদের এমন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করেননি। যারা তাঁকে মানুষ হিসেবে খুব ভালোভাবেই জানতেন, তাদের সম্মুখে তিনি হঠাৎ নিজেকে পয়গাম্বর হিসেবে পেশ করলেন। নিজের স্ত্রী, নিজের গোলাম, নিজের ভাই এবং নিজের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের সম্মুখে নিজেকে পয়গাম্বর হিসেবে পেশ করলেন এবং তারা বিনাদ্বিধায় তার দাবি মেনে নিলেন।'

মানুষের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার খবর স্ত্রীর চেয়ে অধিক আর কেউ জানতে পারে না। কিন্তু এটি কি একটি বাস্তব সত্য নয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়্যতের ওপর সর্ব প্রথম তাঁর স্ত্রী ঈমান এনেছিলেন? নবুয়্যত লাভের পূর্বে পনের বছর তিনি

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে জীবনযাপন করেছেন। তাঁর সম্পর্কে প্রতিটি বিষয় ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। এসব সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়্যত দাবি করার পর সর্বপ্রথম তিনিই তাঁর দাবির সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন।

অতি মহান ব্যক্তিও যিনি মাত্র একটি স্ত্রীর স্বামী, তিনিও স্ত্রীকে এই মর্মে ব্যাপক অনুমতি দানের হিম্মত রাখেন না যে, তুমি আমার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি অবস্থা ও ঘটনা জনসমক্ষে বিবৃত কর এবং যা কিছু গোপন আছে, তা-ও সকলের নিকট প্রকাশ করে দিও। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একই সঙ্গে ৯ জন স্ত্রী ছিলেন এবং তাদের প্রত্যেককে তিনি এ অনুমতি দিয়েছিলেন, নির্জনে আমার মধ্যে যা কিছু দেখ তা বিনাদ্বিধায় জনসমক্ষে বিবৃত কর। কপাটবদ্ধ ঘরের ভেতরে যা কিছু দেখ, খোলা ময়দানে তা সবাইকে শুনিয়ে দাও। এহেন চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের নবী কি আর কোথাও পাওয়া যাবে?

এগুলো হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যক্তিগত অবস্থা বর্ণনার শিরোনামসমূহ। হাদীস গ্রন্থসমূহ তাঁর পবিত্র চরিত্র, উন্নত গুণাবলী ও উত্তম আচার-ব্যবহারের বিস্তারিত বর্ণনায় ভরপুর। বিশেষ করে 'কাযী ইয়ায আন্দালুসী'র কিতাব 'আশ্‌শিফা' এ বিষয়ে সর্বোত্তম। ফ্রান্সের জনৈক ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদের মতে, 'কাযী ইয়ায আন্দালুসী'র 'আশশিফা' কিতাবটিকে কোনো ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা প্রয়োজন, তাতে ইসলামের পয়গাম্বরের প্রকৃত গুণাবলী সম্পর্কে আরো অধিক মানুষ অবহিত হবে। এ প্রয়োজনে সীরাতুন্নবী দ্বিতীয় খণ্ডে 'শামায়েল' অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শিরোনামসমূহ সংযোজন করা হয়েছে– রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 'পবিত্র চেহারা, নবুয়্যতের মোহর, পবিত্র কেশ, চলার ভঙ্গি, কথাবার্তা, হাসি, পোশাক, আংটি, বর্ম ও লৌহ শিরস্ত্রাণ, খাদ্য ও আহার পদ্ধতি, দৈনন্দিন আহার, উত্তম পোশাক, পছন্দনীয় রঙ ও অপ্রিয় রঙ, খোশবু ব্যবহার, সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও সওয়ার হবার আগ্রহ ইত্যাদি।

'নিয়মিত কার্যধারা' অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শিরোনামসমূহ সংযোজন করা হয়েছে : সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত যা করতেন, নিদ্রা, নৈশ ইবাদত, নিয়মিত নামাজসমূহ, বক্তৃতার ধরন, সফর, জিহাদ,পীড়িতদের খোঁজখবর নেয়া, সাধারণ সাক্ষাৎকার এবং সকলের সঙ্গে লেন দেন ও আদান-প্রদান ইত্যাদি।

'নবীর মজলিস' অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শিরোনামসমূহ সংযোজন করা হয়েছে : নবীর দরবার, নসিহতের মজলিস, মজলিসের আদব-কায়দা, মজলিসের সময়সূচি, মহিলাদের জন্য বিশেষ মজলিস, নসিহত করার ধরন-পদ্ধতি, মজলিসের অনন্দঘন পরিবেশ, সঙ্গ লাভের সুফল, কথা বলার ভঙ্গিমা, বক্তৃতাসমূহের ধরন, বক্তৃতাসমূহের প্রভাব।

'ইবাদত' অধ্যায়ে সংযোজিত শিরোনামসমূহ : দোয়া ও নামাজ, রোজা, জাকাত, সদকা, হজ, সর্বক্ষণ আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহ প্রেমের আনন্দ, যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহভীতি, রোনাজারি, আল্লাহপ্রেম, আল্লাহর ওপর নির্ভরতা, ধৈর্য ও শোকর।'

'নবী চরিত্র' অধ্যায়ে বিস্তারিত শিরোনামসমূহ : নবী-চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা, কর্মের দৃঢ়তা, সদ্ব্যব্যবহার, সদাচার ও ইনসাফ, দানশীলতা, ত্যাগ, মেহমানদারি, ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি ঘৃণা, সাদকা গ্রহণের অসম্মতি, তোহফা গ্রহণ, কারো অনুগ্রহভাজন না হওয়া, বলপ্রয়োগ বিরোধনীতি, আত্মপীড়ন অপছন্দনীয়, অপরের প্রচার ও অযথা-প্রশংসার প্রতি বিরূপ মনোভাব, সারল্য ও অনাড়ম্বরতা, কতৃত্বের বড়াই ও লোক দেখানো ভাব থেকে দূরে অবস্থান, সাম্য, নম্রতা, অপাত্রে সম্মান ও প্রশংসার প্রতি বিরূপতা, লজ্জাশীলতা, স্বহস্তে কাজ করা, হিম্মত ও দৃঢ়তা, সাহসিকতা, সত্যবাদিতা, প্রতিজ্ঞা পালন, মিতাচার ও অল্পে তুষ্টি, ক্ষমা ও ধৈর্য, শত্রুদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ও সদ্ব্যবহার, কাফের ও মুশরিকদের সাথে ব্যবহার, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে ব্যবহার, গরিবদের প্রতি ভালোবাসা ও সমবেদনা, জানের দুশমনের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন, শত্রুদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া, ছোটদের প্রতি স্নেহ, মহিলাদের প্রতি ব্যবহার, পশুর প্রতি দয়া, সাধারণভাবে সকলের জন্য করুণা ও ভালোবাসার প্রকাশ, অন্তরের কোমলতা, পীড়িতদের দেখাশোনা, মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সহানুভূতি, নম্রমেজাজ, সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা ও নিজের স্ত্রীদের সঙ্গে ব্যবহার।'

হাফিজ ইবনে কাইয়্যেম 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাল অবস্থা আরো বেশি তথ্যবহুলরূপে পেশ করেছেন। কেবল ব্যক্তিগত বিষয়াবলী সম্পর্কে তার আলোচ্যসূচির তালিকা এখানে উল্লেখ করছি, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যোগাযোগ পদ্ধতি, তাঁর আহার ও পানীয় গ্রহণের পদ্ধতি, তাঁর বিবাহ ও দাম্পত্য সম্পর্কের পদ্ধতি, নিদ্রা ও জাগরণ পদ্ধতি, সওয়ার হওয়ার পদ্ধতি, দাস-দাসীকে নিজের খিদমতের জন্য পেশ করার পদ্ধতি, তাঁর লেনদেন ও বেচাকেনার পদ্ধতি, মলমূত্র ত্যাগের নিয়মাবলী, দাড়ি বানাবার পদ্ধতি, গোঁফ রাখা ও ছাঁটার পদ্ধতি, তাঁর কথা বলার পদ্ধতি, তাঁর নিরবতা, তাঁর হাসি, তাঁর কান্না, তাঁর বক্তৃতার পদ্ধতি, তাঁর অজুর পদ্ধতি, মোজার ওপর মাসেহ করার পদ্ধতি, তায়াম্মুম করার পদ্ধতি, নামাজ আদায়ের পদ্ধতি, দুই সিজদার মাঝখানে বসার পদ্ধতি, সিজদা করার পদ্ধতি, শেষ বৈঠকে বসার পদ্ধতি, নামাজে বসার ও তাশাহুদের সময় আঙুল ওঠাবার পদ্ধতি, নামাজে সালাম ফেরাবার পদ্ধতি, নামাজে দোয়া করা, তাঁর ছোহ্-সিজদা করার পদ্ধতি, নামাজে 'সতর' নির্ধারণ করার পদ্ধতি, সফররত ও স্থির অবস্থা, মসজিদে ও গৃহে তার সুন্নাত ও নফল নামাজ আদায়ের পদ্ধতি, তাহাজ্জুদ বা ফজরের সুন্নাতের পর বিশ্রাম করার পদ্ধতি, তাহাজ্জুদ পড়ার পদ্ধতি, রাতের নামাজ ও

বেতের পড়ার পদ্ধতি, বেতেরের পর বসে নামাজ পড়ার পদ্ধতি, কুরআন পাঠের সময় তাঁর অবস্থা, তাঁর চাশতের নামাজ পড়ার পদ্ধতি, শোকরের সিজদা আদায় করার পদ্ধতি, তাঁর জুমার নামাজ পড়ার নিয়মাবলী, জুমার দিন তাঁর ইবাদতের পদ্ধতি, তাঁর খুতবাদানের পদ্ধতি, দুই ঈদের নামাজ আদায়ের পদ্ধতি, সূর্য গ্রহণের সময় নামাজ পড়ার পদ্ধতি, অনাবৃষ্টির কারণে নামাজ পড়ার পদ্ধতি, তাঁর সফরের পদ্ধতি, সফরে নফল নামাজ পড়ার পদ্ধতি, দুই নামাজকে এক সঙ্গে পড়ার পদ্ধতি, তাঁর কুরআন পড়ার ও শুনার পদ্ধতি, পীড়িতদের দেখার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, জানাজার ব্যপারে তাঁর পদ্ধতি, জানাজার সাথে তাঁর দ্রুতপদে চলার পদ্ধতি, তাঁর মৃতের ওপর কাপড় ঢাকা দেবার পদ্ধতি, কোনো লাশ আনা হলে সে সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ করার পদ্ধতি, তাঁর জানাজার নামাজের পদ্ধতি, শিশুদের জানাজা পড়ার ব্যাপারে তাঁর নিয়ম, আত্মহত্যাকারী ও জিহাদে প্রাপ্ত গনিমাতের অর্থ আত্মসাৎকারীর জানাজা না পড়া, জানাজার আগে আগে তাঁর চলার পদ্ধতি, অদৃশ্য লাশের জন্য তাঁর জানাজা পড়ার পদ্ধতি, জানাজার জন্য তাঁর দাঁড়াবার পদ্ধতি, শোক প্রকাশ ও কবর জিয়ারতের ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, রোজার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, রমজানে তাঁর অধিক ইবাদত করার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, চাঁদ দেখার সাথে সাথেই তাঁর রোজা ইফতার করার পদ্ধতি, চাঁদ দেখার সাক্ষী গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, সফরে রোজা না রাখার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, আরাফা দিবসে আরাফার কারণে তাঁর রোজা না রাখার এবং শুক্র, শনি ও রোববার রোজা রাখার পদ্ধতি, তার একাধিক্রমে রোজা রাখার পদ্ধতি, তার নফল রোজা রাখার ও তা ভেঙে যাবার পর আদায় করাকে ওয়াজিব না মনে করার পদ্ধতি, জুমার দিনটিকে রোজার জন্য বাছাই করার কারণে তাঁর পদ্ধতি, তাঁর এক বছরে দুটি ওমরা আদায় করার পদ্ধতি, তাঁর হজসমূহের অবস্থা, তাঁর স্বহস্তে কুরবানি করার পদ্ধতি, হজে তার কেশ মুন্ডনের পদ্ধতি, হজের দিনগুলোয় তাঁর খুতবা দানের পদ্ধতি, ঈদুল আজহায় তাঁর খুতবা দানের পদ্ধতি, ঈদুল আজহায় তাঁর কুরবানি দানের পদ্ধতি, আকীকার ব্যাপারে তার পদ্ধতি, নবজাতকের কানে আজান দেয়ার এবং তাঁর নাম রাখার ও খাতনা করার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, নাম ও কুনিয়াত (ডাক নাম) রাখার ব্যাপারে তার পদ্ধতি, কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা এবং শব্দ নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, তাঁর গৃহে প্রবেশ পদ্ধতি, তাঁর পায়খানায় প্রবেশের ও সেখান থেকে নির্গমণের পদ্ধতি, তাঁর কাপড় পরার পদ্ধতি, অজুর দোয়ার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, প্রথম তারিখের চাঁদ দেখার পর তাঁর দোয়া করার পদ্ধতি, খাবার পূর্বে ও পরে তাঁর দোয়া করার পদ্ধতি, আহারের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, অন্যের গৃহে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করার ব্যাপারে তার পদ্ধতি, সফরে দোয়া পাঠের পদ্ধতি, বিবাহের দোয়ার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, কোনো কোনো শব্দের ব্যবহার অপছন্দ করার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, যুদ্ধ ও জিহাদে তাঁর পদ্ধতি, কয়েদিদের ব্যাপারে তার পদ্ধতি, গুপ্তচর-কয়েদি গোলামের ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, সন্ধি করার, নিরাপত্তা দানের, জিযিয়া নির্ধারণ করার এবং আহলে কিতাব ও মুনাফিকদের সঙ্গে ব্যবহারের ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, কাফের ও মুনাফিকদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে তার ব্যবহারের পদ্ধতি, তাঁর দিল ও দেহের রোগ চিকিৎসার পদ্ধতি। এখানে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামান্য ও খুটিনাটি ব্যাপার সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত শিরোনামের তালিকা পেশ করলাম। এ থেকে আন্দাজ করা যায় যে, এ সমস্ত ছোট ছোট বিষয়কে যখন এভাবে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে, তখন বিরাট বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ কত বিস্তারিত বিবরণ এখানে বর্তমান। মোট কথা একটি মানুষের জীবনের যতগুলো দিক থাকতে পারে তার সব শিরোনামের তালিকা এখানে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত আছে।

অত্র আলোচনায় মুক্তিকামী বিশ্বমানবতার সামনে স্পষ্ট হয়েছে যে, 'মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও প্রকাশ্য আদর্শ' বলতে আমরা কী বোঝাতে চেয়েছি। ফলে আমাদের দাবির (মুক্তিকামী মানবতার জন্য) একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও প্রকাশ্য আদর্শ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনও তাঁর কোনো অবস্থা ও জীবনের কোনো ঘটনা পর্দারান্তরালে রাখার চেষ্টা করেননি। তিনি যেভাবে জীবনযাপন করতেন তা সবার নিকট প্রকাশিত ও পরিচিত ছিল এবং আজও আছে। তার প্রিয়তমা পত্নী আয়েশা (রা.) ৯ বছর তাঁর সঙ্গে বসবাস করেছেন। তিনি বলেন, 'যে তোমাকে বলে যে, মুহাম্মদ আল্লাহর নির্দেশাবলীর মধ্য থেকে কিছু লুকিয়ে রেখেছেন এবং মানুষের নিকট তা প্রকাশ করেননি, তাকে সত্যবাদী মনে করো না।' (সহীহ আল-বুখারী, নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর)। কেননা আল্লাহ বলেছেন, 'হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার করো; যদি না করো তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেন না।' (সূরা আল মায়েদা : ৬৭)।

দুনিয়ায় কোনো ব্যক্তিই তার সামান্যতম দুর্বলতার কথাও প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে চায় না। বিশেষ করে যে ব্যক্তি কোনো একটি জামায়াতের নেতৃত্ব এবং তাও আবার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দান করেন তিনি কখনও এ কার্যে ব্রতী হন না। কিন্তু কুরআন মজিদে এমন অনেক আয়াত আছে যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাহ্যিক ছোটখাটো ভুল-ত্রুটির জন্য তাঁকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এ সত্ত্বেও কুরআনের প্রতিটি আয়াত তিনি লোকদের শুনিয়েছেন। লোকেরা সেগুলো কণ্ঠস্থ করেছে। প্রত্যেকটি মসজিদে ও মেহরাবে সেগুলোর আবৃত্তি হয়েছে। আজও যেখানে মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম পরিচিত, সেখানে তাঁর অনুসারীদের মুখে ওগুলোও উচ্চারিত হচ্ছে। অথচ এ মামুলি ভ্রান্তিগুলোর উল্লেখ যদি কুরআনে না থাকতো,

তাহলে আজ দুনিয়া এগুলোর কথা জানতেই পারতো না। কিন্তু একটি পবিত্র জীবনের প্রত্যেকটি বস্তুরই প্রকাশ্য দিবালোকে আসার প্রয়োজন ছিল এবং তাই হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন-আচরণ আলোচনা করলেই আমরা দেখতে পাই যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবস্থা যত বেশি অবগত ছিলেন, তিনি তত বেশি শ্রদ্ধা ও অনুরক্তি প্রকাশ করেছেন। অন্যান্য সাধারণ নবীগণের ব্যাপারে এ নিয়ম ছিল না। সর্বপ্রথম অপরিচিত লোকেরাই তাঁদের ওপর ঈমান এনেছে। তারপর তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ক্ষেত্রে এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁকে সর্বপ্রথম তারাই মেনে নিয়েছেন যাঁরা তাঁর অবস্থা, চরিত্র ও অভ্যাসসমূহ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন এবং তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের ঈমান ও আকিদার কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। খাদিজা (রা.) তিন বছর পর্যন্ত 'শে'বে আবু তালিব' নামক উপত্যকায় অবরুদ্ধ ছিলেন। সেখানে তাঁকে ক্ষুধা, অনাহার ও অর্ধাহারের সম্মুখীন হতে হয়। যখন চতুর্দিক থেকে দুশমনরা পশ্চাদ্ধাবন করছিল তখন রাতের অন্ধকারে আবুবকর সিদ্দিক (রা.) ভীষণ বিপদের ঝুকি মাথায় নিয়ে তার সহযাত্রী হন। আলী (রা.) এমন বিছানায় শয়ন করেন, যা পরদিন সকালে রক্তরঞ্জিত হতে যাচ্ছিল। যায়েদ (রা.) এমন ক্রীতদাস ছিলেন, যিনি পিতার সন্ধান পাবার পর তাঁর অত্যাধিক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও নিজের আধ্যাত্মিক পিতাকে ত্যাগ করতে সম্মত হননি।

বিখ্যাত লেখক ক্যাডফ্রে হেগেল 'অ্যাপলজি ফর মুহাম্মদ' এ লিখেছেন, 'খ্রিস্টানরা যদি একথা মনে রাখে, তাহলে খুব ভালোই হবে যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর পয়গাম তার অনুসারীদের মনে এমন নেশার সৃষ্টি করেছিল, যা যীশুর প্রথম যুগের অনুসারীদের মধ্যে সন্ধান করা অর্থহীন। যীশুকে যখন শূলদণ্ডের ওপর চড়ান হলো, তখন তাঁর অনুগামীরা পলায়ন করল। তাদের ধর্মীয় নেশা কেটে গিয়েছিল এবং নিজেদের শ্রদ্ধেয় নেতাকে মৃত্যুর কবলে শৃঙ্খলিত রেখে তারা সরে পড়ল। অপরদিকে মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারীরা তাদের মজলুম পয়গাম্বরের চতুর্দিকে সমবেত হলো, তারা নিরাপত্তার জন্য নিজেদের জানমাল বিপদের মুখে নিক্ষেপ করে তাঁকে শত্রুদের ওপর বিজয়ী করলো।' (উর্দু অনুবাদ, পৃষ্ঠা.৬৬-৬৭,১৮৭৩ সালে বেরিলিতে মুদ্রিত)।

উপসংহার

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য ও তাঁর জীবনের অনুসৃতকে আল্লাহর ভালোবাসার মানদণ্ডে পরিণত করা হয়েছে। এক মুহূর্তের জন্য দ্বীনের নেশায় বা আবেগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রাণ দান করা সহজ। কিন্তু সারা জীবন প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রতিটি অবস্থায় তাঁর অনুসৃত পুলসিরাত এমনভাবে অতিক্রম করা- যেন কোনো পদক্ষেপেই সুন্নাতে মুহাম্মদী (সা.) থেকে সামান্য পরিমাণও এদিক-সেদিক না হতে পারে-এটা বড়ই কঠিন পরীক্ষা। এই অনুসৃত পরীক্ষায় সাহাবাগণ পূর্ণ সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং এ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই সাহাবা, তাবেঈন, তাবই তাবেঈন, মুহাদ্দিসগণ, ঐতিহাসিক ও নবীচরিত রচয়িতাগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি বিষয়, প্রতিটি কাজ সম্পর্কে জানা এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জানানো নিজেদের বিশেষ কর্তব্য মনে করেছেন, যেন প্রত্যেকটি মুসলমান সে অনুসারে চলার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করতে পারে। এ থেকে প্রমাণিত হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসারীগণের দৃষ্টিতে তাঁর জীবনে মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণ ও প্রকাশ্য সমাবেশ ঘটেছিলো। এজন্যই তো তাঁরা একমাত্র তাঁর অনুগমনকে পরিপূর্ণ মানবিকতার মানদণ্ড হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। ফলে চরম অরাজকতার মানব সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল একটি পরম প্রশান্তির বেহেশতি পরিবেশ, যা মানবতার ইতিহাসে স্পষ্টভাবেই লিপিবদ্ধ আছে। আজকের অশান্ত পৃথিবীতে বসবাসরত মুক্তিকামী মানবতার জন্যও একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও প্রকাশ্য আদর্শ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন, এটা ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত সত্য।

ইতিহাস সাক্ষী, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের মতো পরিপূর্ণ কল্যাণময় ও সকল খুঁটিনাটি চারিত্রিক বিষয়ের প্রকাশ্য আদর্শের আর একটি উদাহরণ কোথাও পাওয়া যায় না। মানবসভ্যতার সার্বিক জীবনে পরিপূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সব মানুষের জন্য বিশেষ করে মুসলমানদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিপূর্ণ জীবন অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। অন্যথায় মানবতার জীবনে নেমে আসবে চরম অশান্তির জাহান্নামের পরিবেশ। আল্লাহ আজকের বিশ্বমানবতাকে উল্লিখিত বিষয়টির আসল শিক্ষা কার্যকরী করার তৌফিক দিন। আমিন।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

ই-মেইল : dr.mdnajeeb@gmail.com

শিশুনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)

-শরীফ আবদুল গোফরান

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। তখন আরবের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকতো। সুদের ব্যবসা, লুটপাট, চুরি-ডাকাতি, নরহত্যা, নাচগান, মদপান– এসব তাদের পশুতে পরিণত করে। কন্যাসন্তানদের তারা জীবন্ত কবর দিতো। সে সমাজে শ্রমজীবীরা ছিল ক্রীতদাস। তখন খ্রিস্টান বাদশাহ আবরাহা রাজধানী সামা শহরে একটি বিরাট গির্জা নির্মাণ করে। অতঃপর পবিত্র কা'বাকে এই গির্জায় স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই উদ্দেশ্যেই সে কা'বা ধ্বংস করার জন্য ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কায় রওনা হয়। তার বাহিনীতে বেশকিছু হাতিও ছিল। তখন কা'বা ঘরের মুতাওয়াল্লি ছিলেন আবদুল মুত্তালিব। তিনি ছিলেন তখন মক্কার কুরাইশ বংশের সরদার। একদিন তিনি আছছিফাহ নামক স্থানে গিয়ে আবরাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি আবরাহাকে দেশে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আবরাহা তা শুনলো না। তখন আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদের পাহাড়ি অঞ্চলে চলে যেতে নির্দেশ দেন।

তখন কা'বায় ৩৬০টি মূর্তি ছিল। আবদুল মুত্তালিব সেগুলোকে উপেক্ষা করে কেবল আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলেন, 'হে আল্লাহ আপনার ঘর আপনি রক্ষা করুন'। তারপর তিনি পাহাড়ি অঞ্চলে চলে গেলেন। মন ভালো নেই আবদুল মুত্তালিবের। তিনি নিজ বংশের মানুষ ও কা'বার জন্য চিন্তিত। এ সময় আবরাহা মক্কার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। তখনই ঘটলো মহাকা–! মিনা ও মুজদালিফার মধ্যবর্তী মহাসসির নামক স্থানে তার বাহিনী পৌঁছলে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে তাদের ওপর বৃষ্টির মতো পাথরখ– ফেলতে লাগলো। ইতোমধ্যে ৫৫ দিন পার হয়ে গেছে। এ সময় আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবদুল্লাহর বিধবা পত্নী আমিনার গর্ভে এক পুত্রসন্তানের জন্য হয়। দিনটি ছিল ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল, সোমবার। শিশুটি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন সুবেহ সাদিক।

আবদুল মুত্তালিব প্রত্যূষেই খবর পেলেন যে, তাঁর এক নাতির জন্ম হয়েছে। তিনি খবর পেয়ে সাথে সাথে নাতিকে দেখার জন্য চলে এলেন। শিউরে বসে মনভরে দেখলেন নাতিকে। কিন্তু আনন্দশ্রুতে ভরে উঠলো বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিবের চোখ। শিশুর পিতা আব্দুল্লাহর কথা তাঁর স্মৃতিতে ভেসে উঠলো। কয়েক মাস আগেই আব্দুল্লাহর মৃত্যু হয়েছে। আবদুল মুত্তালিবের অনেকগুলো ছেলে থাকলেও তিনি আব্দুল্লাহকে বড় বেশি ভালোবাসতেন। মা আমিনার কুশল জিজ্ঞাসা করে বৃদ্ধ বিদায় নিলেন। সপ্তম দিনে কুরাইশদের রীতি অনুযায়ী আকিকার দিন এলো। পিতামহ শিশুটির নাম রাখলেন মুহাম্মদ। আর ইনিই তো হলেন আমাদের প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)। তখনকার দিনে আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিশুদের লালন-পালনের জন্য বেদুইনদের হাতে তুলে দেয়া হতো। মুহাম্মদ (সা.)-এর বেলায়ও তা হলো। তাঁকেও দুধ মায়ের হাতে তুলে দেয়া হলো। হালিমা আস সা'দীয়াহ শিশু মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে এলেন মরু বেদুইনদের মাঝে। ছয় বছর বয়সে মুহাম্মদ (সা.) ফিরে এলেন মা আমিনার কাছে।

কিছুদিন পর মা তাকে নিয়ে ইয়াসরিবে যান। স্বামীর কবর দেখা ও আত্মীয় বাড়িতে মাসখানেক থাকার পর আমিনা পুত্র মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে মক্কায় রওনা হন। কিন্তু দুঃখের পরিহাস আবওয়া নামক স্থানে মা আমিনাও মৃত্যুবরণ করেন। তখন উম্মে আইমান মুহাম্মদ (সা.)-কে মক্কায় নিয়ে আসেন।

এবার শিশু মুহাম্মদ (সা.) একা হয়ে গেলেন। কিন্তু দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁকে একা হতে দিলেন না। দাদা নিজেই তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি দাদা আবদুল মুত্তালিবের স্নেহ-যত্নে লালিত-পালিত হতে লাগলেন।

মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স আট বছর। এ সময় দাদা আবদুল মুত্তালিবও মারা যান। এবার চাচা আবু তালেব নিজেই ভাতিজা মুহাম্মদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় আযইয়াদ উপত্যকায় মুক্ত আকাশের নিচে শিশু মুহাম্মদ (সা.) মেষ চরাতেন। তিনি বারো বছর বয়সে চাচা আবু তালেবের সাথে সিরিয়া সফর করেন। আবু তালেব ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসার কাজে বিভিন্ন দেশ সফর করতেন। এ সময় শিশু মুহাম্মদ (সা.)ও চাচার সাথে ব্যবসার কাজে সফরে বের হতেন।

মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স যখন ১৫ বছর, তখন কুরাইশ ও কাইস গোত্রের মাঝে যুদ্ধ বেধে যায়। এই যুদ্ধের নাম 'হারবুল ফুজ্জার' বা অন্যায় যুদ্ধ। এ যুদ্ধ ৫ বছর স্থায়ী হয়। মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং তার চাচা আবু তালেবের সঙ্গে কুরাইশের পক্ষে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বয়স কম বলে যুদ্ধে মুহাম্মদ (সা.)-এর দায়িত্ব ছিল তীর কুড়িয়ে আনা। এই যুদ্ধে কুরাইশরা জয়লাভ করে।

এ যুদ্ধে বীভৎস দৃশ্য মুহাম্মদ (সা.)-কে সাংঘাতিকভাবে আঘাত করে। মক্কায় তখন কিছু তরুণ মিলে 'হিলফুল ফুজুল' বা শান্তিসংঘ নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। সমাজ থেকে কলহ, মারামারি ও অন্যায়-অবিচার উচ্ছেদ করে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি মুহাম্মদ (সা.)-এর উৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যৌবনের শুরুতে মুহাম্মদ (সা.) কতিপয় তরুণের সেই শান্তি উদ্যোগে যোগদান করে স্বীয় দায়িত্বের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার নজির স্থাপন করেন। এতে করে

পাল্টে যেতে থাকে যুব সমাজ। আর পাল্টাবেই না কেন? আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি অত্যন্ত উত্তম চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।' আচ্ছা এত সুন্দর এই মানুষটি আমাদের জন্য আদর্শ না হয়ে পারে? মোটেও না।

লেখক : কবি ও সিনিয়র সাংবাদিক।

তিনি প্রশংসিত

-নাজিব ওয়াদুদ

উত্তরমুখো চলেছিল ওরা– মক্কার একটি ব্যবসায়ী কাফেলা। গরমে, ক্লান্তিতে বেহুঁশপ্রায় অবস্থা। উট আর ঘোড়াগুলোও দুর্বল হয়ে পড়েছে, যেন পা আর চলে না।

যেদিকে চোখ যায় কেবল ধু ধু বালু আর বালু, কখনো উঁচু– এতোটাই উঁচু যে দেখে মনে হয় টিলা, বালুর পাহাড়, আবার কখনো ঢালু– ঢালু হতে হতে কোথাও কোথাও তা অগভীর পুকুরের মতো, কিন্তু তলায় পানির বদলে শুধুই বালু, খচখচে বালু। আরবের এই মরুভূমির আকাশ ঘোলাটে শাদা, সূর্যটা মাথার ওপর ধিকিধিকি জ্বলছে, তার তাপ এতোটাই তীব্র ও অসহনীয় মনে হয়; যেন নিচে মাথার একহাত উপরে নেমে এসেছে সেটা। মাঝে-মাঝে দমকা বাতাসে বালুর ঝড় ওঠে। তখন হাঁটু গেড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে মাথাগুঁজে দিতে হয় বালুর মধ্যে।

হঠাৎ একটা ছোট-খাট মরূদ্যান ওদের চোখে পড়লো। মরূদ্যান মানে কিছু গাছপালা, তার মানে ছায়া, আর সবচেয়ে বড়ো কথা পানি, হ্যাঁ, পানি। পানির অপর নাম জীবন তা এই মরুভূমির লোকদের চেয়ে কে আর বেশি বোঝে? ওরা ছুটে চললো মরূদ্যানের দিকে।

শুধু মরূদ্যান নয় এটা। বেশ কিছু লোকেরও বসবাস এখানে। লোকগুলো ভালো। ওদের বিশ্রাম করতে বাধা দিলো না। পিপাসা মিটিয়ে নিজেরা পানি পান করলো কাফেলার সবাই, ওদের উট আর ঘোড়াগুলোকেও পানি খাইয়ে তাজা করে তুললো। বিদায়ের মুহূর্তে কথায় কথায় ওরা জানতে পারলো সেখানে এক দরবেশ বাস করেন। তিনি হজরত ঈসার ঐশীগ্রন্থ ইঞ্জিলের অনুসারী। হজরত মুসার তাওরাত সম্পর্কেও অনেক জানেন তিনি। এ কথা শুনে কারো কারো কৌতূহল জাগলো। দরবেশরা জ্ঞানের আধার। সৎ পরামর্শ পাওয়া যায় তাদের কাছ থেকে। সুযোগ যখন এসেছে দেখা করা যাক না তার সঙ্গে। যদি কিছু উপদেশ পাওয়া যায় মন্দ কী! সবাই রাজি না হলেও কয়েকজন এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলো না।

দরবেশ বটে। চেহারায় সংযমের মালিন্য, কিন্তু ওর মধ্য থেকেই ভেসে উঠেছে এক রকম সৌম্য, উজ্জ্বল আভা। প্রত্যয়দীপ্ত চোখ, হাস্যময় মুখ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোত্থেকে এসেছ তোমরা?'

ওদের মধ্য থেকে একজন বললো, 'আমাদের বাড়ি মক্কায়।'

–'আহ! কী সৌভাগ্য তোমাদের!' ওদের সৌভাগ্যে নিজেকেও যেন সৌভাগ্যবান মনে করলেন তিনি, তৃপ্তিতে চোখ বুজলেন।

মক্কার লোকেরা অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। কিছু বুঝতে পারছে না ওরা।

চোখ খুললেন দরবেশ, তাকালেন আগন্তুকদের দিকে। ওদের অজ্ঞতায় তিনি অবাক হলেন না। বললেন, 'আল্লাহ শিগগিরই একজন নবী পাঠাবেন। তার জন্ম হবে মক্কায়, তোমাদেরই মাঝে।'

নবী মানে আল্লাহর মনোনীত মানুষ, আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া তার কাজ। মানুষকে অকল্যাণের পথ থেকে কল্যাণের দিকে, ধ্বংস থেকে উন্নতির দিকে, দোজখ থেকে বেহেস্তের দিকে পথ দেখানো তার দায়িত্ব। মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বকে খতম করে সকলকে আল্লাহর আইনের অধীনে এনে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি মানুষকে সংগঠিত করেন। এসব কথা তারা জানে, তারা অনেক শুনেছে। দরবেশের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ওদের কেউ কেউ আপ্লুত ও অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলো। উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তাকে আমরা চিনবো কী করে?'

–'তার নাম হবে মুহাম্মদ। তিনি তোমাদের এক নতুন জীবনের সন্ধান দেবেন। সেই জীবনযাপন করলে দুনিয়াতে মিলবে শান্তি, আখিরাতে পাবে মুক্তি।'

ওরা মক্কায় ফিরে এসে দরবেশের এই ভবিষ্যদ্বাণীর গল্প শোনালো। কেউ তা বিশ্বাস করলো, কেউ করলো না। কবে সে মুহাম্মদের জন্ম হবে, কার ঘরে, কার গর্ভে, কে জানে! কালক্রমে লোকজন ভুলেই গেলো সে কথা।

বেশ কিছু কাল পর।

বিষণ্ন মনে বসে আছেন আমিনা। মক্কার কুরাইশ বংশের বনু হাশিম গোত্রের প্রধান আব্দুল মুত্তালিবের পুত্রবধূ তিনি। ভাবছিলেন নিজের দুর্ভাগ্যের কথা। বিয়ের মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই স্বামী মারা যাবেন সে কি তিনি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন!

স্বামী আব্দুল্লাহ শুধু যে তারই প্রিয়জন ছিলেন তা-ই নয়, মক্কার সকলের কাছেই তিনি ছিলেন আদর ও সম্মানের পাত্র। ব্যবসায়ী কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইয়াসরিব (মদীনা) শহরে পৌঁছে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আমিনা ভাবছিলেন, এখন তার গর্ভে প্রিয় শিশু বেড়ে উঠছে। এতিম হয়েই সে জন্ম নেবে এই পৃথিবীর বুকে। এতো বড় দুঃখ তিনি সইবেন কী করে! এইসব সাত-পাঁচ ভাবনার মাঝে হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো তার পেটের মধ্যে থেকে যেন এক রাশ আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। ইদানীং অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্নও দেখছেন তিনি। কোনটা যে স্বপ্ন আর কোনটা যে বাস্ড়ব তা-ও যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। একদিন যেন তিনি শুনলেন, স্বপ্নের ভেতরে কেউ তাকে বলছে– 'তোমার একটি পুত্র সন্ড়ান হবে। তার নাম হবে মুহাম্মদ।' এসব অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার তাকে অবাক করে, কিছু ভয়ও পান, কিন্তু কাউকে বলতে পারেন না।

কিছুদিন আগে হস্ড়িযুদ্ধ হয়ে গেছে। এ তো যুদ্ধ নয়, আল্লাহর কেরামতি। আল্লাহর ঘর কা'বা ধ্বংস করতে এসেছিল আফ্রিকার আবিসিনিয়ার বাদশা আবরাহা। সে নিজেই ধ্বংস হয়ে গেলো। সে এক অদ্ভুত কাহিনী, রূপকথাকেও হার মানায়।

দুর্ধর্ষ বাদশা ছিল আবরাহা। একবার সে ইয়েমেন দখল করে নিল। সে দেখলো প্রত্যেক বছর একটা নির্দিষ্ট সময়ে গোটা আরব জাহান থেকে লোকেরা মক্কায় যায়।

–'কী ব্যাপার? চারদিক থেকে এতো সব লোক মক্কায় যায় কেন? কী আছে সেখানে?' বাদশা জানতে চাইলো।

খোঁজ নিয়ে তার সভাসদরা জানালো, মক্কায় একটা ঘর আছে, তার নাম কা'বা। সেটা আল্লাহর ঘর। নবী ইবরাহীম আর তার ছেলে নবী ইসমাইল এই ঘর তৈরি করেছেন। সেই থেকে গোটা আরব জাহানের লোকেরা পুণ্যলাভের আশায় তীর্থ করতে যায় সেখানে।

এ কথা শুনে আবরাহার খুব রাগ হলো। তার নিজের শহরের তুলনায় মক্কা লোকেদের কাছে বেশি গুর"ত্ব পাবে এ তার সহ্য হলো না। সে সোনা, র"পা, মূল্যবান মার্বেল পাথর দিয়ে একটা উপাসনালয় বানালো। তারপর রাজ্যময় ঘোষণা করে দিল– এখন থেকে আর মক্কায় নয়, এখানে আসবে তীর্থ করতে।

কিন্তু কেউ শুনলো না তার কথা।

ভীষণ ক্ষেপে গেলো আবরাহা। সভাসদদের ডেকে বলল, 'বোঝা যাচ্ছে কা'বা অটুট থাকা পর্যন্ড় আমার এখানে আসবে না কেউ।'

একবাক্যে ঘাড় নেড়ে সায় জোগালো সভাসদরা, 'ঠিক বটে। কা'বা থাকতে এখানে কেউ আসবে না তা বোঝা গিয়েছে।'

–'তাহলে ধ্বংস করো কা'বা ঘর, গুঁড়িয়ে দাও, নিশ্চিহ্ন করে দাও।'

সাজ-সাজ রব পড়ে গেলো। বিশাল হস্ড়িবাহিনী নিয়ে আবরাহা রওনা করলো মক্কা অভিমুখে।

আবরাহার অভিযানের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলো মক্কার লোকেরা। তারা যোদ্ধা জাতি হলে কী হবে, এ রকম বিশাল বাহিনীর সামনে তারা দাঁড়াবে কী করে! তাছাড়া আবরাহার সঙ্গে রয়েছে বিশাল হস্ড়িবাহিনী। হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট হয়েই তারা মারা যাবে। তারা ছুটলো তাদের প্রধান আব্দুল মুত্তালিবের কাছে।

হস্ড়িবাহিনী মক্কার অদূরে পৌঁছলে আব্দুল মুত্তালিব গেলেন বাদশার কাছে।

–'কী চাও তুমি?' তীক্ষ্ণ, দম্ভভরা প্রশ্ন আবরাহার।

আব্দুল মুত্তালিবের এক পাল উট মাঠে চরছিল, আবরাহার লোকেরা সেগুলো ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সে কথা বাদশাকে জানালেন তিনি। তারপর বললেন, 'আমার উট আমি ফেরত চাই।'

এ কথা শুনে আবরাহা তো ভীষণ অবাক। সে বলল, 'আমি এসেছি কা'বা ধ্বংস করতে, যাকে তোমরা, তোমাদের পূর্বপুর"ষরা, পবিত্র মনে করো, তার কথা না বলে তুমি কিনা বলছো কিছু উটের কথা!'

আব্দুল মুত্তালিব স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, 'দেখ, এই উটগুলো আমার, আর এই কা'বার মালিক হলো আল্লাহ, তার ঘর তিনিই রক্ষা করবেন। তুমি আমার উট আমাকে ফেরত দাও।' বাড়ি ফিরে তিনি লোকজনকে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে বললেন।

পরদিন সকালে আবরাহা তার বাহিনীকে মক্কা আক্রমণের নির্দেশ দিল। কিন্তু তার হাতির দল হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো, কিছুতেই সামনে এগোয় না। অন্য যে কোনো দিকে তারা ঠিকই যায়, কিন্তু মক্কার দিকে এক পা-ও তোলে না। পিটিয়েও হাতিগুলোকে মক্কার দিকে নেয়া সম্ভব হলো না। তারপর কোত্থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট ছোট আবাবিল পাখি ছুটে এলো, তাদের ঠোঁটে পাথরের টুকরো। সেই পাথর তারা ছুঁড়ে মারতে লাগল আবরাহার সেনাবাহিনীর ওপর। এমনিতেই হাতির আচরণে তারা হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল, পাখির পাথর-আক্রমণে তারা বিধ্বস্ড় হয়ে গেল। যারা বাঁচলো তারা যেদিকে পারলো পালিয়ে গেলো। এভাবে আল্লাহ কা'বা ঘরকে রক্ষা করলেন।

খ্রিস্টাব্দের ৫৭০ সালে ঘটে এই ঘটনা। সেই বছরই স্বামীকে হারালেন আমিনা। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে মন খারাপ হলেও তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, গর্ভ ধারণ করা সত্ত্বেও তার শরীর যথেষ্ট সবল ও সতেজ, কী এক শক্তি যেন তিনি তার ভেতরে অনুভব করেন, তাতে পুলকিতও হন তিনি। তার এই অনুভবের কথা, অদ্ভুত সব স্বপ্নের কথা তিনি কাউকে বলতে পারেন না।

রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ, সোমবার। ইয়াসরিবে এক ইহুদি ধর্মবেত্তা আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখে অভিভূত হলেন। এর আগে এটিকে কখনো দেখেননি তিনি। নক্ষত্রটিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণের পর তিনি নিশ্চিত হলেন, ধর্মগ্রন্থে যে মহামানবের শুভাগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এ তারই ইঙ্গিত। তাওরাত তাদের ধর্মগ্রন্থ। তিনি লোকদের ডেকে নক্ষত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিশ্রুত নবীর জন্ম হয়েছে।'

ওই একই দিন কা'বা শরীফের পাশ দিয়ে এক ইহুদি ধর্মবেত্তা যাচ্ছিলেন। সেখানে বসে গল্প-গুজব করছিলো কুরাইশ নেতারা। তিনি তাদের বললেন, 'একটু আগে কি কোনো শিশুর জন্ম হয়েছে? যদি হয়ে থাকে তাহলে তিনিই আল্লাহর প্রতিশ্রুত নবী।'

আরবজুড়ে এ-রকম অবাক করা সব কাণ্ড ঘটলো সেদিন, যেদিন আমিনা এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। আব্দুল মুত্তালিবের কাছে খবর গেল, তার প্রিয় পুত্রবধূর কোল আলো করে জন্ম নিয়েছে এক পুত্রধন। কিছুদিন আগে ইহধাম ত্যাগ করা তার প্রিয়তম পুত্র আব্দুল্লাহর বংশধর। তিনি তখন কা'বা ঘরে বসেছিলেন। পৌত্রের জন্মের খবরে ভীষণ খুশি হলেন তিনি। তৎক্ষণাৎ ভাবতে লাগলেন কী নাম রাখা যায়। একের পর এক নানান নাম তার সামনে আসে, কিন্তু পছন্দ হয় না। এইভাবে ছয়দিন পেরিয়ে গেল। সপ্তম দিনে, কা'বা ঘরে শুয়ে ছিলেন আব্দুল মুত্তালিব, স্বপ্নে দেখলেন, তাকে বলা হচ্ছে শিশুটির নাম হলো মুহাম্মদ। জেগে উঠে ভারি আশ্চর্য হলেন তিনি। যে-রকম নাম রাখতে তারা অভ্যস্ত এ নাম তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর অর্থ হলো 'প্রশংসিত', মানে সবাই যার প্রশংসা করে। চমৎকার নাম। পছন্দ হলো তার। এ নাম রাখায় আমিনাও খুব খুশি হলেন। তিনিও যে স্বপ্নে অনেক আগে থেকেই এই নামটাই শুনে আসছেন!

কুরাইশরা ভারি অবাক হলো। এ আবার কী ধরনের নাম! আব্দুল মুত্তালিব বললেন, 'চমৎকার নাম। আমি চাই দুনিয়ার মালিক আল্লাহ আর দুনিয়ার তাবৎ লোকের প্রশংসার পাত্র হোক আমার প্রিয় বংশধর।'

পরের কথা

আব্দুল মুত্তালিবের প্রত্যাশা সর্বাংশে পূরণ হয়েছে। আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে, আল্লাহর জীবনবিধান মানুষকে শিক্ষা দিয়ে ও তা প্রতিষ্ঠা করে, ইহকালের শান্তি ও পরকালের মুক্তির পথ দেখিয়ে, তার বংশধর সবার প্রশংসার পাত্র হয়েছেন। স্বয়ং আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করেছেন, ফেরেস্তারা আর দুনিয়ার সকল মুসলমান অহরহ তাঁর নামে দরূদ পাঠ করে, তাঁর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে বলে– সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর যেসব অমুসলমান তাঁর সম্পর্কে জানে, তারাও তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে। সত্যিই তিনি 'প্রশংসিত', যথার্থই তিনি মুহাম্মদ।

লেখক : কবি ও কথাসাহিত্যিক।

আল মাহমুদ

আমাদের মিছিল

আমাদের এ মিছিল নিকট অতীত থেকে অনন্তকালের দিকে।
আমরা বদর থেকে ওহুদ হয়ে এখানে,
শত সংঘাতের মধ্যে এ শিবিরে এসে দাঁড়িয়েছি।
কে জিজ্ঞেস করে আমরা কোথায় যাব?
আমরা তো বলেছি, আমাদের যাত্রা অনন্তকালের।
উদয় ও অস্তের ক্লান্তি আমাদের কোনদিনও বিহ্বল করতে পারেনি।
আমাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত।
আমাদের রক্তে সবুজ হয়ে উঠেছিল মোতার প্রান্তর।
পৃথিবীতে যত গোলাপ ফুল ফোটে, তার লালবর্ণ আমাদের রক্ত।
তার সুগন্ধ আমাদের নিঃশ্বাস বায়ু
আমাদের হাতে একটি মাত্র গ্রন্থ আল কোরআন।
এই পবিত্র গ্রন্থ কোনদিন, কোন অবস্থায়, কোন তৌহিদবাদীকে থামতে দেয়নি

আমরা কী করে থামি?
আমাদের গন্ড়ব্য তো এক সোনার তোরণের দিকে, যা এই ভূপৃষ্ঠে নেই।
আমরা আমাদের সঙ্গীদের চেহারার বিভিন্নতাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না।
কারণ আমাদের আত্মার গুঞ্জন হু হু করে বলে,
আমরা এক আত্মা, এক প্রাণ।
শহীদের চেহারার কোন ভিন্নতা নেই।
আমরা তো শাহাদাতের জন্যই মায়ের উদর থেকে পৃথিবীতে পা রেখেছি।
কেউ পাথরে, কেউ তাঁবুর ছায়ায়, কেউ মর"ভূমির উষ্ণবালু কিংবা সবুজ কোন ঘাসের দেশে।
আমরা আজন্ম এই মিছিলেই আছি।
এর আদি বা অন্ড় নেই।
পনেরশত বছর ধরে সভ্যতাগুলোর উত্থান-পতনে আমাদের পদশব্দ থামেনি।
আমাদের কত সাথীকে আমরা এই ভূপৃষ্ঠের কন্দরে কন্দরে রেখে এসেছি।
তাদের কবরে ভবিষ্যতের গুঞ্জন একদিন মধুমক্ষিকার মতো গুঞ্জন তুলবে।
আমরা জানি।
আমাদের ভয় দেখিয়ে শয়তান নিজেই অন্ধকারে পালিয়ে যায়।
আমাদের মুখায়বে আগামী ঊষার উদয়কালের নরম আলোর ঝলকানি।
আমাদের মিছিল ভয় ও ধ্বংসের মাঝে বিশ্রাম নেয়নি নেবে না।
আমাদের পতাকায় কালেমা এ তাইয়েবা
আমাদের এই বাণী কাউকে কোনদিন থামতে দেইনি
আমরাও থামবো না।

মুহাম্মদ (সা.)-ই একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ
-ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমতের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মানবজাতির হেদায়েতের জন্যে আম্বিয়া (আ.) প্রেরণ। সর্বশেষ মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে, বিধায় নবী প্রেরণের প্রয়োজনীয়তাও আর নেই। পৃথিবীতে আল্লাহর রহমতের ধারা মহানবীর উম্মতের মাধ্যমে প্রবহমান থাকবে। সুতরাং ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রে ইত্তেবায়ে মুহাম্মদ (সা.)-ই হচ্ছে মোকাম্মেল দীনের বাস্তবরূপ। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।'
আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য এবং মনোনীত জীবনব্যবস্থা হচ্ছে আল-ইসলাম। সকল নবীই আসমানী ধর্ম ইসলাম এবং এক ইলাহ আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। যুগের পরিবর্তনের সাথে এই ধর্মের বিভিন্ন হুকুম-আহকামের পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে। সর্বশেষ নবী এবং রাসূল সাইয়্যেদুনা মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে ইসলাম সর্বাধুনিক, সুনিপুণ, পরিপূর্ণ এবং চূড়ান্ত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে।
হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন, 'আমার ও নবীগণের নীতিবর্গ রূপ কাহিনী হচ্ছে একটি প্রাসাদের মতো, যা সুন্দরভাবে নির্মিত হয়েছে; কিন্তু নির্মাণের মধ্যে একটি ইটের স্থান ফাঁকা রাখা হয়েছে। প্রাসাদটির পর্যবেক্ষকগণ চারদিকে ঘুরেফিরে নির্মাণশৈলী দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে; কিন্তু তারা ইটের এই ফাঁকা স্থানটি দেখেনি। অতঃপর প্রাসাদের ঐ ফাঁকা স্থানটি আমার দ্বারা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তেমনি আল্লাহর পয়গম্বরগণের মধ্যে আমাকে দিয়ে পয়গম্বরিত্ব সমাপ্ত করা হয়েছে।' আরেকটি বর্ণনায় তিনি বলেন, 'আমিই হচ্ছি প্রাসাদের ইট এবং নবীগণের (আ.) সমাপ্তিসূচক সিলমোহর।'
বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)–
দুনিয়াতে নবীদের প্রেরণের যে কারণ তা শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ক্ষেত্রে নেই। তিনি বিশ্ববাসীর জন্যে প্রেরিত। 'আর আমি তো কেবল তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।' (সূরা সাবা : ২৮)। তাঁর আগমনের মধ্য দিয়ে মানবজাতির জন্যে অন্য নবীর প্রয়োজন বিলুপ্ত করা

হয়েছে। তিনি যে বার্তা নিয়ে এসেছেন, তা আজও সংরক্ষিত। তাঁর বাণীসমূহ নিখুঁত ও সম্পূর্ণ এবং তাঁর শিক্ষা, সতর্কবাণী ও আদেশাবলি সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য। মানবসমাজের এমন কোনো দিক নেই যেখানে তাঁর নির্দেশাবলি প্রযুক্ত হয়নি। মানবীয় আচরণ ও কার্যাবলির উন্নয়নে তাঁর উপদেশ সর্বদা উজ্জ্বল ভাস্কর। সুতরাং তিনিই অনন্তকালের অনুসরণীয় আদর্শ।

মুহাম্মদ (সা.) মানবজাতির জন্য মডেল

মানবজীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে মুহাম্মদ (সা.) অন্যতম মডেল। আল্লাহ বলেন, 'আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে ছিল একটি উত্তম আদশ।' (সূরা আহযাব : ২১)। মূলতঃ যারা আহযাব যুদ্ধে সুবিধাবাদী ও পিঠ বাঁচানের নীতি অবলম্বন করেছিল তাদের শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশেই নবী করীম (সা.)-কে এখানে আদর্শ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা ছিলে ঈমান, ইসলাম ও রাসূলের আনুগত্যের দাবিদার। তোমাদের দেখা উচিত ছিল, তোমরা যে রাসূলের অনুসারীদের অন্ড়র্ভুক্ত হয়েছ, তিনি এ অবস্থায় কোন ধরনের নীতি অবলম্বন করেছিলেন। যদি কোনো দলের নেতা নিজেদের নিরাপদ থাকার নীতি অবলম্বন করেন, নিজেই আরামপ্রিয় হন, নিজেই ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দেন, বিপদের সময় নিজেই পালিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিতে থাকেন, তাহলে তার অনুসারীদের পক্ষ থেকে এ দুর্বলতাগুলোর প্রকাশ যুক্তিসঙ্গত হতে পারে।

কিন্তু রাসূলল্লাহ (সা.)-এর অবস্থা এই ছিল যে, অন্যদের কাছে তিনি যে কষ্ট স্বীকার করার জন্য দাবি জানান তার প্রত্যেকটি কষ্ট স্বীকার করার ব্যাপারে তিনি সবার সাথে শরিক ছিলেন, সবার চেয়ে বেশি করে তিনি তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমন কোনো কষ্ট ছিল না, যা অন্যরা বরদাশত করেছিল, কিন্তু তিনি করেননি। খন্দক খননকারীদের দলে তিনি নিজে শামিল ছিলেন। ক্ষুধা ও অন্যান্য কষ্ট সহ্য করার ক্ষেত্রে একজন সাধারণ মুসলমানের সাথে তিনি সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অবরোধকালে তিনি সর্বক্ষণ যুদ্ধের ময়দানে হাজির ছিলেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও শত্রুদের সামনে থেকে সরে যাননি। বনি কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতার পরে মুসলমানদের সন্ড়ান ও পরিবারবর্গ যে বিপদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তার সন্ড়ান ও পরিবারবর্গও সেই একই বিপদের মুখে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তিনি নিজের সন্ড়ান ও পরিবারবর্গের হেফাজতের জন্যও এমন কোনো বিশেষ ব্যবস্থা করেননি যা অন্য মুসলমানের জন্য করেননি। যে মহান উদ্দেশে তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে ত্যাগ ও কুরবানির দাবি করেছিলেন সে উদ্দেশ্যে সবার আগে এবং সবার চেয়ে বেশি করে তিনি নিজে নিজের সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাই যে কেউ তাঁর অনুসরণের দাবিদার ছিল তাকে এ আর্দশ দেখে তারই অনুসরণ করা উচিত ছিল। এ দৃষ্টিতেই তাঁর রাসূলের জীবন মুসলমানদের জন্য আদর্শ বরং শর্তহীন ও অবিমিশ্রভাবে তাকে আদর্শ গণ্য করেছেন। কাজেই এ আয়াতের দাবি হচ্ছে, মুসলমানরা সকল বিষয়েই জীবনকে নিজেদের জন্য আর্দশ জীবন মনে করবে এবং সেই নিজেদের চরিত্র ও জীবন গড়ে তুলবে।

'খাতামুন নাবিয়্যিন' মুহাম্মদ (সা.)

মহানবী (সা.)-এর নবুওয়ত ও রিসালাত ছিল সার্বজনীন, সকলের জন্যে পরিব্যাপ্ত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরে আর কোনো নবী আসবে না। মহান আল্লাহ বলেন, "বল, 'হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল, যার রয়েছে আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হেদায়েত লাভ করবে।"

"এ কুরআন তো এমন নয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ তা রচনা করতে পারবে; বরং এটি যা তার সামনে রয়েছে, তার সত্যায়ন এবং কিতাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, যা সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে।" (সূরা ইউনুস : ৩৭)।

"আর আমি আপনার ওপর কিতাব নাজিল করেছি, শুধু এজন্যে যে, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করছে, তা তাদের জন্যে আপনি স্পষ্ট করে দিবেন এবং (এটি) হেদায়েত ও রহমত সেই কওমের জন্যে যারা ঈমান আনে।" (সূরা নাহল: ৬৪)।

আল্লাহ বলেন, "মুহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।" (সূরা আহযাব : ৪০)।

আল্লামা আবু আল কাসিম মাহমুদ ইবনে উমর আল যামাখশারী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'আল-কাশশাফ'-এ বলেন, 'খাতামুন নাবিয়্যিন' এর অর্থ সকল নবী (আ.)-এর মধ্যে সর্বশেষ নবী। ইবনে হায়য়ান তাঁর 'আল-বাহার আল মুহীত' গ্রন্থে লিখেন, "এর অর্থ এই যে তাঁর পর আর কোনো নবী আসবেন না।" মুহিয়াস-সুন্নাহ হুসাইন ইবনে মাসউদ তাঁর তাফসির গ্রন্থ 'মা'আলিম আল তানযীল'-এ লিখেন, 'খাতাম' অর্থ তাদের মধ্যে অর্থাৎ নবীদের মধ্যে শেষ। এভাবে আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে সাথে নবুওয়তের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তারপর আর কোনো নবী আসবেন না। হাফিয মইনুদ্দিন ইবনে কাছীর বলেন, "এই আয়াত এই সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ ('নাম') যে মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আর কোনো নবী আসবেন না।" এ সম্পর্কে এক বিপুলসংখ্যক সাহাবি (রা.) ও তাবেয়ীনদের মাধ্যমে বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আল্লামা শাহাবুদ্দিন সাইয়াদ মাহমুদ তাঁর 'রুহুল-মা'আনী' গ্রন্থে লিখেছেন, "যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর শেষ নবী হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, তারা কাফের এবং ইসলামী রাষ্ট্রে তাদেরকে অবশ্যই হত্যা করা বাঞ্ছনীয় হবে।"

মহানবী (সা.) হচ্ছেন নবীদের সীলমোহর। কারণ তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে অহি বা আল্লাহ তায়ালার আদেশ নির্দেশ নাজিল হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া তাঁর অনুসারীগণই নবী (আ.)গণের সকল মহান দায়িত্ব চিরকাল পালন করে যেতে থাকবেন।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। (সূরা, ৩ : ১১৩)। আল্লাহ বলেন, "আর আমি তো তোমাদের সৃষ্টিকূলের জন্যে রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।" (২১ : ১০৭)।

"রমজান মাস, যাতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে মানুষের জন্যে হেদায়েতস্বরূপ এবং হেদায়েতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।" (সূরা বাকারা : ১৮৫)।

হজরত ইরবাদ ইবনে সারিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহ কর্তৃক আমি যখন শেষ নবী হিসেবে লিপিবদ্ধকৃত তখন আদম (আ.) ছিল মাটিতে মিশ্রিত। আমি তোমাদেরকে আমার প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করছি– ইবরাহীম (আ.)-এর আহ্বান, ঈসার (আ.)-এর সুসংবাদ এবং আমাকে গর্ভধারণকালে আমার মায়ের দেখা সুস্বপ্ন এবং তাঁর গর্ভ থেকে বহিঃগর্ভ আলো, যা সিরিয়ার রাজপ্রসাদসমূহ আলোকিত করেছিল।

অতএব এটা যখন স্পষ্ট যে, মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন সকল নবী ও রাসূলের মধ্যে শেষ নবী এবং তারপর আর কোনো নবী ও রাসূল পৃথিবীতে আসবেন না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশ্বাস সম্পর্কে এখানে একটি বিষয়ের স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন এবং তা হচ্ছে ঈসা (আ.)-এর পৃথিবীতে অবতরণ। তিনি ও মহানবী (সা.)-এর অনুসারী হিসেবেই পৃথিবীতে অবতরণ করবেন।

অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থে মুহাম্মদ (সা.)

পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই যেখানে হজরত মুহম্মদ (সা.)-এর কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়নি। হিন্দুধর্ম সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম বেদ। বেদ এবং অন্যান্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থে অসংখ্যবার হুজুর (সা.)-এর কথা বলা হয়েছে। তাকে বলা হয়েছে, তিনি হলেন মামা ঋষি বা শেষ ঋষি। তাঁর নাম বলা হয়েছে 'নরসংসা' (আহমেদ নামেও তাকে ডাকা হয়েছে)। এটি একটি সংস্কৃত শব্দ, নর হলো, মানুষ আর সংসা হলো, প্রশংসার যোগ্য। অর্থাৎ এমন একজন মানুষ যিনি প্রশংসার যোগ্য। এই নরসংসাকে ইংরেজি করলে হয়, অ সধহ যিড় রং ঢ়ৎধরংবড়িৎঃযু. আর নরসংসাকে হুবহু আরবি করলে হয়, 'মুহাম্মদ' (সা.)। আরও বলা হয়েছে তাঁর পিতার নাম 'বিষ্ণুইয়াস', এটিরও হুবহু আরবি করলে দাঁড়ায় 'আবদুল্লাহ' যা ছিল হুজুর (সা.)-এর পিতার নাম। তাঁর মাতার নাম বলা হয়েছে 'সুমতি', যার হুবহু আরবি করলে দারায় 'আমেনা', যা ছিল হুজুরের মাতার নাম। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্যবার হুজুর (সা.)-এর কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বাইবেলেও অসংখ্যবার হুজুর (সা.)-এর কথা বলা হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্টে বুক অফ ডুইট্রনমি অধ্যায় ১৮, ভার্সতে, আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.)-কে বলছেন, 'আমি তোমার ভ্রাতাদিগের মধ্য থেকে আরেকজন নবী আনবো, যে হবে তোমারই মতো। আর সে নিজে কিছু বলবে না, আমি যা তাকে বলতে বলবো সে শুধু তাই বলবে।' বুক অব আইজাহা অধ্যায় ১৯ ভার্স নাম্বার ১২তে বলা হয়েছে, 'এবং কিতাবখানি নাজিল করা হবে তাঁর উপর যিনি নিরক্ষর। তাকে বলা হবে পড় তোমার প্রভুর নামে, সে বলবে আমি তো পড়তে জানি না, আমি নিরক্ষর।'

বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত

বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বিদায় হজের ভাষণে গোটা মুসলিম উম্মাহ এবং তামাম মানবজাতির উদ্দেশে দুটো মৌলিক আমানত রেখে গেছেন। এর একটি হচ্ছে পবিত্র আল কুরআন এবং অপরটি হচ্ছে সিরাতে রাসূল (সা.)। আল্লাহ তায়ালা খাতামুন নবীঈন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সা.) পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত হেদায়েত সহকারে মানবজাতির কাছে সিরাজাম মুনিরা করে পাঠিয়েছেন। প্রতিটি ঈমানদীপ্ত মুসলমানকে পবিত্র আল কুরআন এবং রাসূলের (সা.) পথ ও পাথেয় নিবিড়ভাবে অনুসরণ করার মধ্যেই ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি এবং আল্লাহর রেজামন্দি নিহিত। তাঁর মহোত্তম চরিত্র মাধুর্যকে অনুসরণ করে জীবনকে আলোকিত না করলে আল্লাহর রহমত পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন– 'হে রাসূল! আমি আপনাকে বিশ্বজগতের অনুগ্রহ ব্যতীত প্রেরণ করিনি। অন্যত্র বলা হয়েছে, অবশ্যই আপনি উত্তম ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী।'

কিতাবুল্লাহর অনুসরণ

হজরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে ঐশী দিকদর্শন পরিপূর্ণ নির্যাস মন্থিত হয়ে আল কুরআনে। মহানবী (সা.) তাঁর কর্মময় ও সংঘাতসংকুল সংগ্রামী জীবনের ২৩ বছরে ইসলামের পরিপূর্ণ রূপায়ন করে দেখিয়েছেন যে, ইসলাম নিছক কিতাববন্দী কিংবা আধ্যাত্মবাদও নয়। সেই আলোকধারায় পথ চলাই মুসলমানদের জন্য একমাত্র করণীয়। এজন্যই

একজন মুসলমান যিনি পবিত্র কালেমা উচ্চারণ করে তৌহিদ ও রিসালাতের সাথে জীবনকে গ্রন্থিত করেন, তার সার্বক্ষণিক এরাদাই থাকে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) আদর্শকে অনুসরণ করা। ইসলাম হচ্ছে প্রত্যেক মানুষ এবং সকল সৃষ্টিজীব, এমনকি প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্যও বাস্তবায়নযোগ্য জীবনব্যবস্থা। আকিমুদ্দিন-এর প্রতিষ্ঠা ছাড়া এর বাস্তব কল্যাণ ও সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) রাসূলের (সা.) জীবন সম্পর্কিত এক ভাষ্যে বলেছেন, তোমরা কি কুরআন পড়নি, আল-কুরআনই হচ্ছে তাঁর জীবনচরিত। পবিত্র কুরআনে রাসূলের (সা.) জীবনকে সিরাজাম মুনিরা বা উজ্জ্বল দীপ্তিময় আলোকপ্রভা এবং বিশ্বমানবের মুক্তির দিশারী, সৃষ্টিকুলের জন্য রাহমাতুললিল আলামীন হিসেবে ঘোষণা করেছেন। পবিত্র অহির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার কালাম আত্মস্থ করার আগেই কুরাইশ তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্য, বিশ্বস্ততা, মানবতা, ও আমানতদারীর জন্য 'আল আমিন' অভিধায় ভূষিত হয়েছিলেন। নবুয়্যতী জিন্দেগীর আগেই যুবক মুহাম্মদ (সা.) পুণ্যবতী ধনাঢ্য নারী খাদিজাতুল কোবরার (রা.) ব্যবসা কাফেলার সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেন। নবুয়্যত প্রাপ্তির পর মক্কার কুরাইশ কাফেররা নবীজিকে (সা.) হত্যার পরিকল্পনা করলেও তাঁর আল আমিন উপাধি বাতিল করতে পারেনি।

হজরত মুহাম্মদ (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন প্রায় দেড় হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআন আজও দেদীপ্যমান, উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর। হজরত জিবরাইল (আ.) যেভাবে ভাষায় ও বর্ণনারীতিতে আল কুরআনকে রাসূলের (সা.) কাছে বহন করে এনেছিলেন সেভাবেই পবিত্র কুরআন গ্রন্থিত হয়ে অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান। লাখো কোটি মুসলমানের ঘরে ঘরে এবং হাফেজ এ কুরআনের ক্বলবের সুরক্ষিত দুর্গে বিরাজমান। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সা.) যে মুসলিম উম্মাহ তৈরি করে রেখে গেছেন এবং যাদের প্রতি আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে রাসূলের (সা.) আদর্শ অনুসরণ করার নির্দেশ রেখে গেছেন, মুসলমানরা সে নির্দেশ কতটুকু পালন করতে পারছে? এ প্রশ্ন আজ উঠছে। মুসলমানরা বহু আগেই বিশ্ব নেতৃত্বের অবস্থান থেকে সরে গেছে। কারণ তারা কুরআন ছেড়ে দিয়েছে। এখন মুসলমান পরিচয়টাই যেন মুসলমানদের জন্য দেশ বিদেশে বিপদ ও বিপর্যয়ের কারণ। আল্লাহ বলেন, "আমি এ কুরআন তোমার প্রতি এজন্য নাজিল করিনি যে, তুমি বিপদে পড়বে।"

আজ একদিকে পশ্চিমের অমুসলিম বিশ্বে নও-মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে মুসলিম দেশসমূহের শাসকবৃন্দ ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে মুশরেক নাসারাদের আদর্শ গ্রহণ করে আপসের পথ ধরেছে। অশিক্ষা, অনৈক্য মুসলিম উম্মাহর বড় সমস্যা। এ অবস্থায় সত্যিকার ঈমানদার মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তারপরও মুসলমানদের বর্তমানের আজাব গজব থেকে বাঁচতে হলে রিসালাতী আদর্শের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ছাড়া সম্ভব নয়। এটাই সিরাতুন্নবী (সা.)-এর শিক্ষা ।

আজকের দুনিয়ায় ইসলাম-ই হচ্ছে সবচেয়ে গতিশীল, মানবিক ও প্রাকৃতিক জীবন বিধান। ইসলাম সত্য ও মানবতার পক্ষে, বিশ্ব প্রকৃতির শৃঙ্খলার পক্ষে। ইসলাম একমাত্র শোষিত শ্রমিক, শৃঙ্খলিত দাস, ধর্মীয় অনাচার, শোষণে জর্জরিত মানবতা, অধিকারহারা নারী এবং সকল জাতির মজলুম মানুষের মুক্তির পয়গাম নিয়ে এসেছে। ইসলামকে বন্দুকের টার্গেট বানিয়ে দুনিয়া বাঁচবে না, শান্তিও আসবে না। দুনিয়াবাসীকে এ সত্য বোঝানোর দায়িত্ব উম্মতে মুসলিমাকে নিতে হবে।

কুরআনুল কারীম কোনো মানবরচিত কিতাব নয়। বিরুদ্ধবাদীদের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, কেউ যদি একে কোনো মানবরচিত কিতাব বলে মনে করে, তবে কুরআনুল কারীমের সূরার অনুরূপ একটি সূরা অথবা একটি আয়াত রচনা করে আনুক। এ চ্যালেঞ্জ আজও বিদ্যমান। কিন্তু কারো পক্ষে তা গ্রহণ সম্ভবপর হয়নি হবেও না। এ কিতাব তুলনাহীন, অফুরন্ত রহস্যের অধিকারী ও চিরন্তন। এ পবিত্র কিতাবের যত অধিকসংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ লেখা হয়েছে অন্য কোনো কিতাবের এতো তাফসীর লেখা হয়নি এবং হওয়ারও কথা নয়। এ কিতাব যত তিলাওয়াত করা হয় পৃথিবীতে, অন্য কোনো কিতাব তত তিলাওয়াত করা হয় না। এ পবিত্র কিতাবে মতো অন্য ধর্মগ্রন্থের হাফিজ নেই। পৃথিবীর লাখ লাখ মসজিদের মিনার থেকে যখন আজান-ধ্বনি উচ্চারিত হয় তখন আল্লাহর একত্ববাদের শাহাদাতের পর বিশ্বনবী (সা.)-এর রিসালাতেরও সাক্ষ্য প্রচার করা হয়। তাঁর নাম বহুল প্রচারিত ও বহুল প্রশংসিত। আল্লাহর আরশেও তাঁর পবিত্র নাম অংকিত রয়েছে। তিনিই সকল মানবগোষ্ঠীর নেতা।

সম্মানিতদের সেরা তিনি

আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে তাঁর হাবীবকে অতি সম্মানের সঙ্গে সম্বোধন করেছেন। নবী-রাসূল মুয্যাম্মিল ও মুদ্দাচ্ছির ইত্যাদি উপাধি ব্যতীত কোথাও 'ইয়া মুহাম্মদ' তাঁর নাম নিয়ে আহ্বান করেননি। তাঁর দুশমনদের দুর্ব্যবহার ও কটূক্তির উত্তর আল্লাহপাক স্বয়ং দিয়েছেন, "তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব'- 'ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দু'হাত। 'ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার'- 'নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ'। 'মা ওয়াদ্দা আকা রাব্বুকা ওয়ামা কালা' তোমার প্রতিপালক তোমাকে ত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি' ইত্যাদি আয়াতে এর প্রমাণ রয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, মানবতার বন্ধু হজরত মুহাম্মদ (সা.) অতি অল্প সময়ে পৃথিবীতে যে বিপ্লবী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করলেন, সেখানে বর্ণ ও গোত্রের ভেদাভেদ নেই, নেই কোনো স্বজনপ্রীতি, নেই দলের লোকদের কোনো ছাড়। ইনসাফের বেলায়, নাগরিক অধিকারের বেলায় সবাই সমান। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন একটি আল্লাহ-ভীরু সমাজ, আখিরাতে বিশ্বাসী আল্লাহপ্রেমিক জিহাদী দল; যাঁরা দীনের ব্যাপারে কাউকে ভয় করেন না। সত্যের ওপর যাঁরা অটল। ন্যায়বিচার, সাম্য, সদ্ব্যবহার, জনসেবা, আল্লাহর বন্দেগীতে সদা মশগুল; তাওহীদের ওপর অটল, শিরক-বিদআত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তমন। যারা নবী পাকের জিন্দেগীকে অনুসরণ করছে, তাঁরাই পৃথিবীর মানুষকে মানবজাতিকে আলোকবর্তিকারূপে কাজ করে দেখিয়েছেন সত্যের সেরা রাজপথ। আসুন, হজরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনাদর্শ অনুসরণ করে একটি কল্যাণকর, সুখী সমৃদ্ধশালী ও শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তুলি।

লেখক : সাংবাদিক, সমাজসেবক।

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সৃষ্টিকারী এক অনন্য ব্যক্তিত্ব রাসূল (সা.)

-মোমতাহানা সুরভি

রাসূল (সা.), শুধুমাত্র একজন ধর্ম প্রচারকের পরিচয়ে যাকে সীমাবদ্ধ করা যাবে না। কোনো আংশিক, একপেশে, সঙ্কীর্ণ সংস্কার আন্দোলন তিনি পরিচালনা করেননি। বরং তার নবুয়্যতী জিন্দেগীর পুরোটা সময়জুড়ে মানব জীবনের প্রতিটি অঙ্গনকে তিনি একই আদর্শের রঙে রঙিন করে তা জুড়ে দিয়েছিলেন নির্ভুলের কেন্দ্রের সাথে। সেই সময়ের জাহেলি সব পঙ্কিলতা থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার শুদ্ধতায় ধুয়ে মুছে ফেলে এক পরিশুদ্ধ জীবনের সাথে পরিচয় করে দিয়েছিলেন এই মহামানব। এই সংস্কার আন্দোলন থেকে বাদ যায়নি সাহিত্য, সংস্কৃতির মতো গুর"ত্বপূর্ণ উপাদানগুলোও। ইসলামী সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চার অনন্য এক নজরানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাসূল (সা.)-এর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রাসূল (সা.)

'সংস্কৃতি' শব্দটি 'সংস্কার' অর্থে ব্যবহৃত। সংস্কার মানেই পরিশুদ্ধ প্রচেষ্টা। মানব সংস্কৃতি মানেই সুন্দরের মাঝে বিকশিত এক জীবনের প্রতিচ্ছবি। ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির অথবা সামাজিক গোত্রের বিশিষ্টার্থক আর্থিক, বস্তুগত, বুদ্ধিগত এবং আবেগগত চিন্ড়া ও কর্মধারার প্রকাশ। শিল্প ও সাহিত্যই একমাত্র সংস্কৃতির অন্ড়র্ভুক্ত বস্তু নয়, মানুষের জীবনধারা ও সংস্কৃতির অঙ্গ। মানুষের অধিকার, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসও সংস্কৃতির অঙ্গ।

রাসূল (সা.) যে সমাজে প্রেরিত হয়েছিলেন, সেই আরব সমাজের তৎকালীন পরিস্থিতি একটু চিন্ড়া করা যাক।

আরবের সমগ্র অঞ্চলই ছিল সভ্যতার আলোবিহীন। অন্ধকার জাহিলিয়াতের ঘুম থেকে তখনো সেখানকার মানুষ জেগে ওঠেনি। অন্যায়, জুলুমের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ রক্ষাই তখন আরব সমাজের মূল সাংস্কৃতিক নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। অন্যায়, অরাজকতার কোনো সীমা ছিল না। অশ্লীলতা আর বেহায়াপনার মূল উপকরণ হয়ে গিয়েছিল শিল্প এবং সাহিত্য। প্রবৃত্তির লালসা পূরণই ছিল আরবদের মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সে কারণেই এই সময়কে 'আইয়্যামে জাহিলিয়াত' বা জাহিলিয়াতের যুগ বলা হয়। সর্বত্রই তখন প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল মানব সমাজকে সত্যিকার অর্থে পরিশুদ্ধকারী এক অনন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লবের।

রাসূল (সা.) তার নবুয়্যতি জিন্দেগীর পুরোটা জুড়েই এক এক করে মানব জীবনের প্রতিটি দিককেই পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর এই অনন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অসাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন–

রাসূল (সা.)-এর এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছিল সামগ্রিক, অখ", অবিভাজ্য। ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ নয়, বরং একই আদর্শের রঙে তিনি রঙিন করেছিলেন পুরো সমাজব্যবস্থাকে। তিনি এমনই এক অসাধারণ শিক্ষক ছিলেন যিনি তার সাহাবীদের চুল পরিপাটি করে রাখা, পোশাক পবিত্র রাখা, নিজ সন্ড়ানদের আদর-স্নেহ করার মতো বিষয়গুলো শিখিয়ে দিতেও কার্পণ্য করেননি। তিনি দেখিয়ে গেছেন কীভাবে পারস্পরিক হক-অধিকার আদায়ে কতটা যত্নশীল ও সতর্ক হতে হয়। তিনি দেখিয়েছেন নিজের ঘরের স্ত্রী, পরিজন এমনকি দাস-দাসীদের সাথে কতটা ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা যায়। দেখিয়েছেন আল্লাহর সাথে নিজের আত্মাকে সম্পর্কিত করে প্রশান্ড়ি পাওয়া যায়, আল্লাহর ইবাদতে কীভাবে নিজেকে বিনোদনের খোরাক দেয়া যায়, মুচকি হাসির শালীনতা, কণ্ঠস্বরের মার্জিত বহিঃপ্রকাশের মতো বিষয়ও তাঁর প্রশিক্ষণ থেকে বাদ যায়নি। মদ-জুয়ায় আসক্ত আরব জাতিকে তিনি আল্লাহর ইবাদতের প্রেমে প্রেমিক করে তুলেছিলেন। মসজিদভিত্তিক অনন্য এই ইসলামী সংস্কৃতি ও পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক আদর্শের এক অনুপম দৃষ্টান্ড় স্থাপন করেছিল।

- রাসূল (সা.)-এর সাংস্কৃতিক আদর্শের মূলে ছিল-

তাওহীদ
রিসালাত
আখিরাত

তাওহীদ : তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ আরব সমাজের পৌত্তলিক, শিরক এর ওপর প্রতিষ্ঠিত জীবনকে করে তুলেছিল কুসংস্কারমুক্ত, বিভ্রান্তিমুক্ত, পাপাচারমুক্ত। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সঠিক পরিচয়কে মেনে নিতে সক্ষম হয়েছিল যে ঈমানদারগণ তারাই জাহেলী সংস্কৃতির বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের জন্য সর্বোত্তম কল্যাণকামী মহান প্রভুর শ্রেষ্ঠতম জীবনাচরণের অনুসারী হয়ে যেতে পেরেছিল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে মেনে নিতে না পারলে মানুষ তার পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনে নানা প্রভুর ভ্রান্ত মতাদর্শের দাসত্ব শুরু করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের সূত্রপাত। যে কারণে রাসূল (সা.) তৎকালীন সমাজের এই প্রধান সমস্যার মূলেই প্রথম কুঠারাঘাত করেছিলেন। তাঁর দাওয়াতের প্রথম এবং প্রধান ভাষ্যই ছিল সব ইলাহর থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহর প্রভুত্বকে মেনে নিয়ে তাঁর একক দাসত্বকে মেনে নেয়ার প্রতি আহ্বান।

রিসালাত : রাসূল (সা.)-এর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আরেকটি মূল আদর্শ ছিল রাসূল (সা.)-এর রিসালাতের অনুসরণ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে এমন একজন অসাধারণ শিক্ষক হিসেবেই প্রেরণ করেছিলেন, যিনি ছিলেন আল্লাহর নির্দেশনা বাস্তবায়নের সর্বোত্তম জীবন্ত এক মডেল। তিনি যা বলতেন, সাথে সাথে তা করেও দেখতেন। সে কারণেই কুরআনে বলা হয়েছে–

'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।' (সূরা আহযাব : ২১)।

সব যুগের, সব জাতির জন্যই রাহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে প্রেরিত এই মহামানবের সমগ্র জীবনই ইসলামী সংস্কৃতির এক বাস্তব নমুনা।

আখিরাত : আখিরাত তথা পরকালীন জীবনে বিশ্বাস ছিল ইসলামী সাংস্কৃতিক আদর্শের অন্যতম একটি নৈতিক ভিত্তি। এই বিষয়টি মানুষের জীবনাচরণকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, নৈতিক শৃঙ্খলে বেঁধে দেয় যে, আখিরাতে বিশ্বাসী মানুষ নিছক দুনিয়াপ্রেমে মশগুল নিজের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পূরণ থেকে বিরত হয়ে যায়। আখিরাত বিশ্বাসী মানুষের নৈতিক ভিত তাই পরিশুদ্ধ এক সাংস্কৃতিক প্রাসাদের সূচনা করে অতি সহজে।

রাসূল (সা.) প্রতিষ্ঠিত সমাজ ছিল সকল অশ্লীলতা, বেহায়াপনার স্পর্শ মুক্ত একটি সমাজ। একটি শুদ্ধ সংস্কৃতির জন্য এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাকওয়া ও আখিরাতমুখী মুসলিম সাহাবারা তখনকার জাহেলী আরব সমাজে, যেখানে কিনা নগ্ন অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করাকে পুণ্য মনে করা হতো, ব্যভিচার করা ছিল সামাজিক আভিজাত্য সেই ধরনের সমাজে নিজের পূতঃপবিত্র জীবনাচরণ দ্বারা অশ্লীলতা মুক্ত অনবদ্য এক সাংস্কৃতিক জীবনের সূত্রপাত। মদপানের মতো অশ্লীলতার বীজ ছড়ানো অভ্যাসগুলো থেকেও ঈমানী তেজে বলীয়ান মানুষগুলো ফিরে আসতে পেরেছিল কুরআন ও সুন্নাহর অসাধারণ আনুগত্যকারী হিসেবে।

- সর্বোপরি ইসলামী সেই সমাজের মূল আদর্শিক ভিত স্থাপিত ছিল-

কুরআন এবং সুন্নাহর ওপর।

কুরআন হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলামীন, যিনি কিনা সর্বজ্ঞানী মানুষের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকামী এক সত্তা, তাঁর থেকে সরাসরি প্রদত্ত এক সর্বোত্তম জীবনবিধান। কুরআনের এই অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যে সহজেই আকৃষ্ট হয়েছিল তখনকার শুদ্ধ সাংস্কৃতির প্রেমে পাগলপারা মানুষগুলো। এমনকি কাফেররাও মনে মনে এই কিতাবের আদর্শিক, ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। আর রাসূল (সা.) তো ছিলেন আল্লাহর সরাসরি মনোনীত রাসূল। যার প্রদর্শিত সুন্নাত ছিল কুরআনেরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি, সঠিক আমলগত প্রতিফলন। রাসূল (সা.)-এর পরম কল্যাণকামী চরিত্র, নিজ আদর্শের প্রতি অসাধারণ দৃঢ়তা এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এনে দিয়েছিল অসাধারণ প্রাণশক্তি। তাই তো কুরআন আর সুন্নাতের প্রতিটি ব্যক্তিই ছিল সুস্থ সংস্কৃতির জীবন্ত মডেল। আর রাসূল (সা.) প্রচারিত দীন বা জীবন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব সরাসরি কুরআনেই এসেছে।'

'আমি আমার রাসূলকে কেবলমাত্র এ উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছি এবং তাদের ওপর কিতাব ও মানদণ্ড নাজিল করেছি যাতে মানবজাতি ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।' (সূরা আল হাদীদ : ২৫)।

তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মনোনীত সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ ও ন্যায়ভিত্তিক দীন প্রচারক হিসেবে রাসূল (সা.)-এর রিসালাত ছিল শ্রেষ্ঠতম সাংস্কৃতিক মানদণ্ড।

ইসলামী সাহিত্য চর্চায় রাসূল (সা.)-এর ভূমিকা

ইসলামের দৃষ্টিতে সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি দুটো। এক. আল্লাহর কালাম, দুই. রাসূলের সুন্নাহ।

আল্লাহর কালামের দৃষ্টিতে সাহিত্য দু'প্রকার : শ্লীল ও অশ্লীল। একটি মানব কল্যাণকামী, অপরটি মানবসভ্যতার জন্য ক্ষতিকারক, ধ্বংসাত্মক ও অকল্যাণকর। একটি বিভ্রান্ড় চিন্ড়ার ধারক, অপরটি সত্য ও সুন্দরের পথপ্রদর্শক। ইসলাম শ্লীল ও সুর"চিপূর্ণ সাহিত্য বিকাশের সহায়ক কিন্তু অশ্লীল ও কুর"চিপূর্ণ সাহিত্য ইসলামের দৃষ্টিতে পরিত্যাজ্য।

সূরা আশ শোয়ারায় আল্লাহ বলেন, 'এবং কবিদের অনুসরণ করে যারা তারা বিভ্রান্ড়। তুমি কি দেখ না যে তারা প্রতি ময়দানেই উদ্ভ্রান্ড় হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং এমন কথা বলে যা তারা করে না? তবে তাদের কথা আলাদা, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে, আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।' (সূরা আশ শোয়ারা : ২২৫-২২৭)।

কবিতার জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সাহাবী কবিদের প্রতি ছিল মহানবীর কঠোর নির্দেশ। হজরত আয়েশা (রা.) আরো বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) বললেন, 'তোমরা কাফির মুশরিকদের নিন্দা করে কাব্য লড়াইয়ে নেমে পড়ো। তীরের ফলার চেয়ে তা আরো বেশি আহত করবে তাদের।'

রাসূল (সা.) সাহাবীদের সম্বোধন করলে উঠে দাঁড়ালেন হাসসান বিন সাবিত (রা.)। বললেন, 'আমিই রইলাম তার জন্যে, আপনি জিভ মেলে ধরেন।' পুনশ্চ বলে উঠলেন, 'আল্লাহর শপথ! বুসরা থেকে শুর" করে সান'আর নিভৃত বস্ড়ি পর্যন্ড় আমার কথা নির্ঘোষিত হবে আজ থেকে, ইনশাআল্লাহ'। সবাক প্রশ্ন তুলে ধরলেন মহানবী (সা.), 'তা বেশ কিন্তু আমি সে যে কুরাইশ গোত্রের। তাহলে কীভাবে ওদের ব্যঙ্গ তুমি?' জবাব এলো, 'ময়দার পাকানো ম" থেকে যেভাবে চুল বেছে আনা যায়, দেখবেন, আপনাকে ওদের থেকে পৃথক করব।'

কা'ব ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসূল (সা.) আমাদের নির্দেশ দিলেন, যাও, তোমরা মুশরিকদের প্রতিপক্ষে কবিতার লড়াইয়ে লেগে যাও। কারণ মুমিন জিহাদ করে জান-মাল দিয়ে। মুহাম্মদের আত্মা যার হাতের মুঠোয় তার শপথ! তোমাদের কবিতা তীরের ফলা হয়ে তাদের কলজে ঝাঁঝরা করে দেবে।'

এভাবে রাসূল (সা.) ঐশী কালামের অনুগত কাব্যকলাকে উৎসাহিত করেন। তাঁর নেতৃত্বে নব উত্থিত সমাজ বিপ্লবে সাহাবী কবিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে এক নব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন।

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) বিভিন্ন সময়ে কবি ও কবিতা সম্পর্কে এমন কিছু মন্ড়ব্য করেছেন, শ্রেষ্ঠ কাব্য সমালোচকদের চাইতেও যা হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক। সেসব মন্ড়ব্যের কয়েকটি তুলে ধরছি–

'উট থামাতে পারে তার সকর"ণ ক্রন্দন।
কিন্তু আরবরা তাদের কবিতার সুর থামাতে পারে না।'

রাসূলে কারীমের (সা.) আগমন হয়েছিল মানুষের মধ্যে যেসব কু-প্রবৃত্তি আছে তা দূর করে সেখানে সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করার জন্য। সভ্যতার বাগানে সুবাতাস বইয়ে দেয়ার জন্য তিনি বিশ্ব ইতিহাসে যে বিপ্লব সাধন করেন তার মূল ছিল মানবজাতির চারিত্রিক সংশোধন। তাই সুসমাজ সৃষ্টির স্বার্থে কবিতার শ্লীল-অশ্লীলতার বিষয়ে রাসূল (সা.) সবসময় ছিলেন সদা সচেতন।

অশ্লীলতা বর্জনের ব্যাপারে সাহাবীদের প্রতি আল্লাহর নবীর কঠোর নির্দেশ ছিল। তিনি বলেছেন, 'ইসলাম গ্রহণের পরও যে অশ্লীল কবিতা ছাড়তে পারল না, সে যেন তার জিভটাই নষ্ট করে ফেলল।'

তিনি আরো বলেছেন, 'অশ্লীল কবিতা দিয়ে তোমাদের দেহ মন ভর্তি করার চেয়ে রক্ত পুঁজ দিয়ে পরিপূর্ণ করা অনেক ভালো।'

'নিশ্চয়ই কবিতা হচ্ছে সুসংবদ্ধ কথামালা। কাজেই যে কবিতা সত্য-আমিশ্রিত সে কবিতা সুন্দর। আর যে কবিতা সত্য বিবর্জিত সে কবিতার মধ্যে কোনো মঙ্গল নিহিত নেই।'

তিনি অনুরূপভাবে কবি লবীদ ইবনে রবিআহর (মৃত্যু ৬৬১ খ্রি.) একটি কবিতা রাসূল (সা.) খুব বেশি পছন্দ করতেন। এ কবিতার একটি পঙক্তি ছিল, 'জেনে রাখ আল্লাহ ছাড়া আর সব কিছুই বাতিল।' এ সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর মন্ড়ব্য : 'কবিতায় যেসব সত্য কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে সত্য কথাটি হচ্ছে লাবীদের এই কবিতাটি।'

হাদীস শরীফের বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, কবিদের খেতাব প্রদান এবং সভাকবি করার রেওয়াজ মহানবী (সা.)-এর আমলেও ছিল। রাসূলে মকবুল (সা.) তার প্রিয় সাহাবী কবিদের মধ্যে থেকে কবি হাসসান বিন সাবিত (রা.)-কে তার সভাকবির মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং তাকে বলা হতো 'শায়ের"র রাসূল' বা রাসূলের কবি।

মহানবী (সা.) কবি ছিলেন না। নবী হিসেবে কাব্যচর্চা তার জন্য শোভনও ছিল না। কিন্তু তারপরও রাসূল (সা.) কখনও কখনও টুকরো মিসরা বানিয়ে আবৃত্তি করতেন। খন্দক যুদ্ধে সাহাবীদের সঙ্গে পরিখা খনন করতে করতে রাসূল (সা.) গেয়েছিলেন–

'আল্লাহর নামে শুর" করি এই কাজ,
যার অসিলায় পেলাম পথের দিশা-

করি যদি কেউ অন্যের এবাদত
ভাগ্যে জুটবে দুর্ভাগ্যের গভীর অমানিশা।
প্রভু আমাদের মহামহিম, মহান চিরদিন
আমাদের দীন উত্তম আর চির অমলিন।'

রাসূল (সা.) কবিদের উৎসাহিত করেই ক্ষান্ড় হননি, তিনি তাদের যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা দিতেন। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, মসজিদে নববীর ভেতরে শুধুমাত্র কবিতা পাঠ করার জন্য মহানবী (সা.) একটি আলাদা মিম্বর তৈরি করেছিলেন যেখান থেকে কবি হাসসান বিন সাবিত (রা.) সাহাবীদের কবিতা পাঠ করে শুনাতেন।

কবিতা লেখার পুরস্কার হিসেবে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন হাসসান বিন সাবিত (রা.)। তার কবিতা শুনে রাসূল (সা.) ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'হে হাসসান! আল্লাহর কাছ থেকে তোমার জন্য পুরস্কার রয়েছে জান্নাত।'

যেখানে আল্লাহ পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ একটি সূরার নামকরণ 'আশ শোয়ারা'- 'কবিরা যেখানে কবিদের চূড়ান্ড় সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন সেখানে কাব্যচর্চা তথা সাহিত্য সাধনাকে গৌণ ভাবার কোনো অবকাশ নেই। রাসূল (সা.)ও তাই সত্যের স্বপক্ষে একদল কলম সৈনিক সাহাবাদের উত্তম পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

আজকের পৃথিবীতে সাহিত্য ও সংস্কৃতির মতো সভ্যতা বিনির্মাণকারী উপাদানগুলো নানা পঙ্কিলতার আবর্তে আবর্তিত। ফলে চিন্ড়াশীল মহল সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে শুদ্ধিকরণের সংগ্রামে দিনরাত প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তাদের জন্য আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনবদ্য বিপ্লব নিঃসন্দেহে অনন্য অনুসরণীয় এক দৃষ্টান্ড়। অপসংস্কৃতি ও অপসাহিত্যের আবিলতা থেকে মুক্ত হতে আমরা আজ আবার অনুসরণ করতে পারি এই মহামানবের অসাধারণ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংস্কার আন্দোলনকে।

তথ্যসূত্র :
* মানবতার বন্ধু রাসূল (সা.) -নঈম সিদ্দিকী।
* ইসলামী সংস্কৃতি -আসাদ বিন হাফিজ।
* ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃতি ও স্বরূপ -ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম।
* ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.)।
লেখক : নারী অধিকার আদায়ে আন্দোলনের নেত্রী।

সাহসিকতা ও বীরত্বের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত রাসূল (সা.)

-এম. মুহাম্মদ আবদুল গাফফার

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে। মানুষ পৃথিবীতে প্রাথমিক অবস্থায় এক সম্প্রদায়ভুক্তই ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁরা বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, ধর্ম, মত ও পথের অনুসারী হয়ে যায়। এই মর্মে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ঘোষণা করেন, 'প্রথম দিকে সব মানুষ একই পন্থার অনুসারী ছিল। (পরবর্তীতে বিভিন্ন পন্থার অনুসারী হলে) তখন আল্লাহ নবী প্রেরণ করলেন, তাঁরা সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা ও বক্র পথের পথিকদের জন্য আজাবের ভয় প্রদর্শনকারী ছিল এবং তাদের সঙ্গে সত্য গ্রন্থ নাজিল করেন, যেন সত্য সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল তার চূড়ান্ত ফয়সালা করতে পারে।' (সূরা বাকারা : ২১৩)। পবিত্র কুরআনুল কারীমের এ আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী বোঝা যায়, পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর দেয়া বিধানকে লঙ্ঘন করে নিজেরা যে পন্থা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন তা পরিপূর্ণভাবেই ভ্রান্ত। এই ভ্রান্ত পথ থেকে মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য পৃথিবীতে আল্লাহ ধারাবাহিকভাবে নবী ও রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ প্রেরিত পয়গম্বরগণ মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করে গেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত এ মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁরা শারীরিক মানসিক নির্যাতনসহ দেশান্তর হয়েছেন এবং অনেকে অতি নির্মমভাবে শাহাদাতবরণ করেছেন। যুগে যুগে আম্বিয়া কেরামগণের অনুসারীরা এ কাজের আঞ্জাম দিতে গিয়ে তারাও জালেমদের হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

আল্লাহর দ্বীনের পূর্ণতাদানের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সর্বশেষ রাসূল হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তিনি পৃথিবীতে এসে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে এ জমিনে প্রতিষ্ঠার জন্য বিরোধী শক্তির যে অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন ও মিথ্যাচারের মুখোমুখি হন, তা অতি বিরল। আল্লাহর দ্বীন পৃথিবীর মাটিতে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁকে বহুসংখ্যক রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। মহানবী (সা.) এর অনুসারীগণও দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে

জুলুম, নির্যাতন ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন ও হচ্ছেন তার দৃষ্টান্তও অতুলনীয়। এ দায়িত্ব বিশ্বনবী (সা.)-এর উম্মত হিসেবে মুসলিম জাতির জন্য পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এ মর্মে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ঘোষণা করেন, 'তোমরাই পৃথিবীর সর্বোত্তম জাতি, যাদের মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে, তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখো।' (সূরা আল ইমরান : ১১০)। আল্লাহর দ্বীনকে তাঁর জমিনে বিজয়ী করতে হলে দৃঢ় ঈমান ও সাহস ও জানমাল কুরবানির জজবা থাকা অবশ্যই জরুরি। দুশমনদের মোকাবিলায় সাহস, শৌর্যবীর্য তথা বীরত্ব প্রদর্শন করতে না পারলে বাতিল শক্তির দাপটে টিকে থাকা তো দুরূহ বটেই, সম্ভবপর যে নয় তাতে আর সন্দেহ কি? এ মর্মে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন, 'হে ঈমানদার লোকেরা! কোনো (শত্রু) বাহিনীর সাথে যখন তোমাদের প্রত্যক্ষ মোকাবিলা হয়, তখন যেন দৃঢ়তা সহকারে দাঁড়িয়ে থাকো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো, তাহলে অবশ্যই তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।' (সূরা আনফাল : ৪৫)। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা জমিনে তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য যেসমস্ত নবী ও রাসূল পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, তাদেরকে ইলম, হিকমত, সাহস ও বীরত্বসহ যাবতীয় মানবিক গুণাবলী দিয়েই মানুষের রাহবার হিসেবে দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত করেছিলেন। এক্ষেত্রে মহানবী (সা.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবার জন্য উত্তম আদর্শ ও অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। এ মর্মে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ঘোষণা করেন, 'এতে সন্দেহ নেই যে, তুমি নৈতিকতায় অতি উচ্চমর্যাদায় অভিষিক্ত।' (সূরা কালাম : ৪)।

এরপর কুরআনুল কারীমের অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ঘোষণা করেন, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর চরিত্রেই রয়েছে উত্তম আদর্শ।' মহানবী (সা.)-কে হত্যার উদ্দেশে আবু জেহেলের নেতৃত্বে কাফিলরা আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর বাসভবন রাতের অন্ধকারে ঘেরাও করেছিল, তখন রাসূল (সা.) স্বীয় বিছানায় না ঘুমিয়ে হজরত আবু বকর (রা.)-কে সাথে নিয়ে সাওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওদিকে রক্তপিপাসু মুশরিক সম্প্রদায় আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে না পেয়ে হন্যে হয়ে তাঁর খোঁজে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। একপর্যায়ে তারা গুহার সন্নিকটে এসে পড়লো; এমনকি তাদের পা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। যদি মুশরিকরা নিচের দিকে তাকায় তাহলে মহানবী (সা.) ও আবু বকর (রা.)-কে দেখে ফেলতে পারে। এ শঙ্কায় হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বিষয়টি আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সাথে আলাপ করছিলেন। মহানবী (সা.) সাহস ও আল্লাহর ওপর দৃঢ় আস্থার সাথে যে কথা বলেছিলেন পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তা এরকম– উল্লেখ করেছেন, তিনি মুসলমানদের লক্ষ করে ঘোষণা করেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা যদি নবীর সাহায্য না করো, তাহলে সেজন্য কোনো পরোয়া নেই। কেননা আল্লাহ সে সময় তাঁর সাহায্য করেছে। যখন কাফিররা তাঁকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল, যখন সে মাত্র দু'জনের দ্বিতীয়জন ছিল, (আর) যখন তাঁরা দু'জন গুহায় অবস্থান করছিল, যখন সে তাঁর সঙ্গীকে বলতেছিল : চিন্তাভাবনা করো না আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি মনের গভীর প্রশান্তি নাজিল করলেন ...।' (সূরা তাওবা : ৪০)।

পবিত্র কুরআনুল কারীমের এ বর্ণনা থেকে যে কথাটি পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল, তা হলো আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান, তাওয়াক্কুল ও আস্থা রেখে সাহসের সাথে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলার কৌশল অবলম্বন করলে স্বাভাবিকভাবেই যে আল্লাহর সাহায্য আসে, তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। এজন্যই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা মুসলিম জাতিকে বাতিল শক্তির মোকাবিলায় সর্বক্ষণ সজাগ ও প্রস্তুত থাকার নির্দেশ জারি করেছেন। এ মর্মে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ঘোষণা করেন, 'আর তোমরা যত দূর সম্ভব বেশি শক্তিশালী ও সাদা সজ্জিত বাধা ঘোড়া তাদের (শত্রুর) সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত করে রাখো, যেন উহার সাহায্যে আল্লাহর এবং নিজেদের দুশমনদের আর অন্যান্য এমন সব শত্রুদের ভীত শঙ্কিত করতে পারো যাদের তোমরা জান না, কিন্তু আল্লাহ জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে উহার পুরোপুরি বদলি তোমাদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তোমাদের সাথে কখনোই জুলুম করা হবে না।' (সূরা আনফাল : ৬০)। এ আয়াতের মর্মার্থ হলো বাতিল শক্তির মোকাবিলার জন্য সুসজ্জিত ও সুসংগঠিত রণসজ্জায় প্রস্তুত থাকতে হবে এবং অর্থ-সম্পদও অকাতরে ব্যয়ের মানসিকতা থাকতে হবে।

মহানবী (সা.)-এর সাহস ছিল সবার চেয়ে অনেক বেশি। মহানবী (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করে একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। সদ্য প্রতিষ্ঠিত এ ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তথা জনপদটির ওপর শত্রুদের লোলুপ দৃষ্টি তথা আগ্রাসী কার্যক্রম সর্বস্তরের জনতার মধ্যে একটি ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করতো। আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ছিলেন সুদৃঢ় বৃক্ষের মতো অটল ও সবার জন্য অভিভাবক। সান্ত্বনাদাতা ও আল্লাহ প্রদত্ত রহমতের ছায়াস্বরূপ। এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত আছে– কাতাদা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে শুনেছি কোনো এক সময় মদীনাতে ভীতি ও ত্রাস দেখা দিলে নবী (সা.) আবু তালহার মানদূর নামক ঘোড়াটি চেয়ে নিয়ে তার পিঠে আরোহণ করে গোটা মদীনা টহল দেয়ার পর বললেন, কই কোনো ভীতি ও ত্রাসের কারণ তো দেখতে পেলাম না।' (সহীদ আল বুখারী : ২৬৫২)।

মহানবী (সা.) এর সাহসিকতা ও বীরত্বের অসংখ্য বর্ণনা কুরআনুল কারীম, হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উহুদ যুদ্ধের বেদনাদায়ক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। যে যুদ্ধে বিশ্বনবী (সা.)-এর শুধু ৭০ জন বিশিষ্ট সাহাবী কুশলী যোদ্ধাই শাহাদাত বরণ করেননি। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সা.)ও মারাত্মকভাবে আহত হন। তাঁর মুখমন্ডল রক্তে ভিজে যায়, সামনের দাঁত ভেঙে যায়। শত্রুদের তরবারীর আঘাতে শিরোস্ত্রাণ দু'চোয়ালের মধ্যে ঢুকে পড়ে, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। যুদ্ধরত মুজাহিদগণ আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন তা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) স্বীয় অবস্থান থেকে সরে যাননি; বরং দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা অবলোকনসহ সৈন্যদের শত্রুর অগ্রবর্তী অবস্থানে পাল্টা মারণাঘাত হানার আদেশ করে যাচ্ছিলেন। শত্রুর বার বার আঘাতে মহানবী (সা.) যখন পাহাড়ের পাদদেশের একটি গুহায় পড়ে গেলেন এ পর্যায়ে মুজাহিদগণ আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে সাথে নিয়ে পর্বতের ঘাঁটিতে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন পর্বতের ঘাঁটিতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তখন উবাই ইবনে খালাক সেখানে পৌঁছলো। সে একজন বড় যোদ্ধা বলে গর্ব করতো। সে তাঁর আওজ নামক ঘোড়াকে দৈনিক ৪০ কেজি করে ভুট্টা খাইয়ে তরতাজা করেছিল এজন্য যে সে ওটাতে চড়েই বিশ্বনবী (সা.)-কে হত্যা করবে। যা হোক, উবাই ইবনে খালাক পর্বত ঘাঁটিতে এসে বললো, 'হে মুহাম্মদ এযাত্রা তুমি প্রাণে বেঁচে গেলেও তোমার নিস্তার নেই।' মুসলমানগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এ লোকটিকে সহানুভূতি দেখানো কি আমাদের কারো জন্য সঙ্গত? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'ওকে আসতে দাও।' সে রাসূলুল্লরাহ (সা.)-এর কাছে এলে, তিনি হারেস ইবনে সিন্মার কাছ থেকে বর্শা নিলেন, বর্শা হাতে নেয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভয়ঙ্কর পাঁয়তারা করলেন যে, উট প্রবল জোরে নড়ে উঠলে তাঁর পিঠের ওপর বসা বিষাক্ত ভিমরুলের ঝাঁক যেমন ছত্রভঙ্গ হয়ে উড়ে যায়। আমরাও (সাহাবীগণ) ঠিক তেমনি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে দূরে সটকে পড়লাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর ওপর বর্শার আঘাত হানলেন। আঘাত খেয়ে উবাই ইবনে খালাক তার ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়লো এবং বেশ কয়েকটা গড়াগড়ি খেলো– (সিরাতে ইবনে হিশাম) পরবর্তীতে সে মারা যায়।

মহানবী (সা.)-এর সাহস ও বীরত্বের বহুসংখ্যক দৃষ্টান্তের মধ্যে হুনাইন অভিযানের ঘটনা খুবই স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ৮ম হজিরীতে মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) জানতে পারলেন রণকুশলী হাওয়াযিন ও তাঁর মিত্র গোত্রগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আল্লাহর রাসূল (সা.) মুসলিম বাহিনী নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। তিহমার পার্বত্য উপত্যকার মধ্য দিয়ে মুসলিম মুজাহিদগণ এগিয়ে যাচ্ছিলেন। রাতের অন্ধকার কেটে ভোরের আলো তখনো দেখা যায়নি। শত্রুসেনারা আগেই এ উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং সঙ্কীর্ণ দুর্গম গিরিগুহায় ও তার আশপাশে লুকিয়ে পূর্ণ রণপ্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষমাণ ছিল। ঐ পথে মুসলিম বাহিনী এসে পড়তেই শত্রুরা হঠাৎ একযোগে মুসলিম বাহিনীর ওপর প্রচন্ড হামলা চালালো। হামলার আকস্মিকতায় হতবুদ্ধি হয়ে সৈন্যগণ যেদিকে পারলো উঠিপড়ি করে ছুটে পালাতে লাগলো এবং একজন আরেকজনের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই করলো না। কারো দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করার যেন ফুরসত নেই। (সিরাতে ইবনে হিশাম)। এ সময় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে মহানবী (সা.) দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আল্লাহর রাসূল (সা.) রণক্ষেত্রের ডানদিকে সরে দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন, 'হে সৈনিকরা! তোমরা কোথায় যাচ্ছ? আমার কাছে এসো! আমি আল্লাহর রাসূল! আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ। কীসের জন্য উটের ওপর উট হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল? এ সময় রণক্ষেত্র প্রায় ফাঁকা হয়ে পড়েছিল। এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে– 'আবু ইসাহাক (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি যারা ইবনে আযেবকে জিজ্ঞেস করলো, হে আবু উমারা! আপনি কি হুনাইন যুদ্ধের দিন জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করেছিলেন? আমি শুনলাম এ কথার পর যারা তার জবাব দিলেন! তিনি বললেন, সেদিন তো রাসূলুল্লাহ (সা.) পলায়ন করেননি। তাঁকে ঘিরে মুশরিকগণ চতুর্দিক হতে আক্রমণ করতে লাগলে তিনি সওয়ারী হতে অবতরণ করে বলতে থাকলেন আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়। আমি আব্দুল মুত্তালিবের (মতো নেতার) বংশধর। যারা বর্ণনা করেন, সেদিন তাঁর চেয়ে কঠিন বীরবাহু আর কাউকে দেখা যায়নি। (সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং-২৮১৫। আজকে গোটা মুসলিম জাহানের জন্য জরুরি যে, মহানবী (সা.) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

লেখক : সদস্য, দারুল ইসলাম ট্রাস্ট, দরগা রোড, সিরাজগঞ্জ।

রাসূল (সা.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি

-সুমাইয়া তাসনীম

ওই সময় মানবসভ্যতার বিকাশধারা হঠাৎ করেই থমকে দাঁড়িয়েছিল বিশ্বজুড়ে। নৈতিকতা-মূল্যবোধে নেমে এসেছিল চরম অবক্ষয়। নিষ্ঠুরতা, অন্যায়, অনাচার ও পাপাচারের অন্ধকার জেঁকে বসেছিল চারদিকে। 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিতে ক্ষমতাবানদের দোর্দণ্ড প্রতাপ ও অত্যাচার-নির্যাতনের সীমা ছাড়িয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ধর্মীয় বিশ্বাসে কুসংস্কারের অতিশয্যে মানবতা ছিল দিশেহারা।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষার প্রহর গুনছে একজন মানবতার মুক্তির দিশারি। ঠিক তখনই অন্ধকারাচ্ছন্ন-তৃষ্ণার্ত মরুর বুকে আলোর ঝর্ণাধারা হয়ে এলেন রাসূল মুহাম্মদ (সা.)। হাজার বছরের জমে থাকা অন্ধকারকে দুই যুগের চেষ্টায় রূপ দিলেন আলোতে। গঠন করলেন সুবিচার ও ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক কাঠামো। প্রতিষ্ঠা করলেন নৈতিক মূল্যবোধ ও উন্নত চরিত্রের অসাধারণ মানুষের সমন্বিত রাষ্ট্র, পৃথিবীর ইতিহাসে যা অভূতপূর্ব ও অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। কী এমন বীজ বুনে দিলেন তিনি, যার দরুন ঘটলো অভাবনীয় বিস্ময়কর এ ঘটনা।

রাসূল (সা.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পদক্ষেপসমূহ

গোটা আরবে তখন মাত্র ১৭ জন ব্যক্তি শিক্ষিত ছিল। অশিক্ষিত, মূর্খ একটি জাতিকে শিক্ষিত করার প্রকল্পে রাসূল (সা.) কয়েকটি পদক্ষেপ নেন। যেমন– ১. শিক্ষার্জনের ব্যাপারে গণসচেতনতা গড়ে তোলেন এবং মূর্খতার ওপর বিদ্যমান থাকা ও শিক্ষিতরা তাদের শিক্ষাদান না করা; দুটোকেই আল্লাহর নির্দেশ ও শরিয়ত পরিপন্থী কাজ বলে গণ্য করেন। একই সাথে শিক্ষার্জনের গুরুত্ব ও উপকারিতা তুলে ধরেন। ২. নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বদর যুদ্ধে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ হিসেবে দশজন নিরক্ষরকে লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব দেন। একটি সম্প্রদায়েরর অজ্ঞতা দূর করার জন্য সম্প্রদায়টিকে এক বছর সময় দেন। ৩. শিক্ষা প্রদানের সুবিধার্থে জায়গায় জায়গায় শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। যেমন– দারুল আরকাম শিক্ষাকেন্দ্র, ফাতিমা বিনতে খাত্তাব শিক্ষাকেন্দ্র, মসজিদে আবু বকর শিক্ষাকেন্দ্র, মসজিদে কুবা ও গামিম শিক্ষাকেন্দ্র প্রভৃতি।

রাসূল (সা.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য

আরব জাতিকে বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেন রাসূল (সা.)। এ অবস্থানে উঠিয়ে আনার পেছনে তিনি চমৎকার প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। না হলে হয়তো অনমনীয়, যুদ্ধপ্রিয়, আত্মঘাতী সম্পন্ন একটি জাতির কোমল, বিনয়ী ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়ার মতো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতো না। তাঁর ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো ছিল নিম্নরূপ–

১. রাসূল (সা.) তাঁর মজলিসে উপস্থিত লোকদের এমনভাবে শিক্ষা দিতেন– আলিম, জাহিল, শহরবাসী, মরুবাসী, বেদুঈন, আরবী, আজমী, বৃদ্ধ, শিশু, সবাই পূর্ণরূপে পাঠ গ্রহণ করতে পারতেন। তার সকল কথা সবার অন্তরে গেঁথে যেত।

২. প্রত্যেকটি কথা থেমে থেমে বলতেন। গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রয়োজনে তিনবার বলতেন। তাড়াতাড়ি বা বিরতিহীনভাবে বলতেন না। সব ধরনের শিক্ষার্থী যাতে একই সাথে শিখে নিতে পারে।

৩. কারো কোথাও ভুল হয়ে গেলে নরম সুরে বুঝিয়ে দিতেন; যাতে শিক্ষার্থী অস্থির বা পেরেশানি না হয়ে যায়।

৪. তার শিক্ষা মজলিসে কারোর ভুল হলে বা অযাচিত প্রশ্নের কারণে হাসতে মানা ছিল; যাতে শিক্ষার্থী লজ্জিত না হয়।

৫. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে তার শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন। কখনো তিনি প্রশ্ন আকারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন বিষয় উপস্থাপন করে চিন্তা তৈরি করতেন এবং পরে উত্তর নিজেই জানিয়ে দিতেন; আবার কখনো শিক্ষার্থীদের সুযোগ করে দিতেন, যাতে করে তারা চাহিদামাফিক জেনে নিতে পারে।

৬. শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শেখার সুযোগ দিতেন এবং নিজে শুনতেন। একবার এমন একজন শিক্ষার্থীকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন।

৭. হাতেকলমে শিক্ষাদান রাসূল (সা.)-এর অন্যতম শিক্ষাদান পদ্ধতি। হারাম হওয়ার বিষয়টির প্রতি জোর দেয়ার জন্য নিষিদ্ধ বস্তু হাতে নিয়ে উঁচু করে ধরিয়ে দেখিয়ে দিতেন। এতে নিষিদ্ধ হওয়া বিষয়টি শ্রোতাদের মনে শক্ত করে গেঁথে যেত। সাথে সাথে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে যেত।

৮. বক্তৃতা বা লেকচার প্রদান করতেন। অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কোনো কথা প্রশ্ন ছাড়াই নিজে নির্দিষ্ট বিষয়ে জানতেন; যাতে ঐ বিষয়ে শ্রোতাদের মধ্যে কোনো সন্দেহ সংশয় হওয়ার সুযোগ না থাকে।

৯. কখনো প্রশ্নকারী যতটুকু জানতে চাইলে তার চেয়ে বেশি জানাতেন তাঁর বুঝ ক্ষমতা ও চাহিদার আলোকে।

১০. সাধারণত তিনি সংক্ষিপ্ত কথায় তাৎপর্যপূর্ণ মর্মার্থ প্রকাশ করতেন। কিন্তু প্রশ্নকারীর প্রজ্ঞা-বিচক্ষণতা কম থাকলে ব্যাখ্যামূলক উত্তর দিতেন প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে।

১১. প্রশ্নকারী একবারের জবাবে বুঝতে না পারলে আবার বিস্ড়রিত বলতেন।
১২. কোনো শিক্ষার্থীর প্রশ্নের জবাবে অন্যদের সুযোগ দিতেন; যাতে তাঁর দেয়া প্রশিক্ষণ কতটা কাজে লেগেছে তার ফিডব্যাক নেয়ার জন্য, কখনো প্রশ্নের জবাব কীভাবে হয় সে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যও এমন করতেন।
১৩. শিক্ষার্থীদের মেধা, পরিবেশ ও বিচক্ষণতার আলোকে উত্তম প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর পরিচিত বস্তু, ঘটনার দৃষ্টান্ড় পেশ করে শিক্ষা দিতেন এতে তাদের বুঝতে সহজ হতো।
১৪. শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবেশকে উৎসাহব্যঞ্জন ও অনুকূল রাখার জন্য মাঝে মাঝে রসিকতা ও কৌতুক মিশ্রিত কথা বলতেন।
১৫. কথা বা বিষয়বস্তুর গুর"ত্ব বোঝাতে মাঝে মাঝে শপথবাক্য ব্যবহার করতেন, কখনো বলার ভঙ্গি ও অবস্থার পরিবর্তন করতেন, কখনো কথার পুনরাবৃত্তি করতেন।
১৬. শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ও নির্দিষ্ট বিষয়ে সজেতন করে তোলার জন্য নাম ধরে ডাকতেন, কখনো নির্দিষ্ট কারো হাত ধরতেন, কাঁধ ধরতেন।
১৭. শিক্ষার্থীদের আগ্রহ যতক্ষণ অবশিষ্ট থাকতো, ততক্ষণই শেখাতেন। বিরক্তি তৈরি হবে এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করতেন না।
১৮. কখনো কখনো গল্প আকারে বিষয়ের উপস্থাপন করতেন জীবনঘনিষ্ঠ অতীত কোনো গল্প উপস্থাপন করতেন শিক্ষার্থীদের শেখানোর উদ্দেশ্যে।
১৯. কখনো কোনো বিষয় বা বস্তুকে শ্রোতার সামনে অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধকভাবে তুলে ধরে নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি উদগ্রীব ও মনোযোগী করতেন।
২০. কোনো বিষয় প্রথমে সংক্ষেপে এবং পরে বিস্ড়রিত বর্ণনা করতেন, যাতে মূলকথা ব্যাখ্যার আড়ালে হারিয়ে না যায় ও শিক্ষার্থী বুঝতে পারে তাকে কী শেখানো হচ্ছে।
২১. কখনো ভীতিপ্রদর্শন কখনো উৎসাহমূলক কথা দিয়ে শেখাতেন।
২২. লজ্জাজনক বিষয়ে শেখানোর ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ভূমিকার অবতারণা করতেন এবং অল্প শব্দের ব্যবহার করে ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে বোঝাতেন।
২৩. ক্ষেত্রবিশেষে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মানুষিক ভারসাম্য সৃষ্টি করে শিক্ষা দিতেন। বিশেষ করে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মন মানষে কোনো অসার চিন্ড়া বদ্ধমূল হয়ে থাকলে।
২৪. মাঝে মাঝে মাটি ও ধুলার ওপর দাগ কেটে বিশেষ কোনো বিষয় সাহাবীদের বুঝিয়ে দিতেন। আধুনিক যুগে যেমন বোর্ড ব্যবহার করা হয়।
২৫. কথা ও কাজের মাধ্যমে জীবনের সব ক্ষেত্রে; বিশেষত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পর্যায় ক্রমে ও ধাপে ধাপে শিক্ষার কথা বলতেন।
২৬. শিক্ষার্থীদের মানসিক, জীবনাচরণ, মেধার প্রতি লক্ষ রেখে একই বিষয় বিভিন্নভাবে শিখিয়েছেন। যেমন– সর্বোত্তম ইসলাম বলতে কাউকে বলেছেন, ক্ষুধার্তকে আহার করানো; আবার কাউকে বলেছেন, সালামের প্রচলন।
২৭. শেখানোর পর শিক্ষার্থীদের পঠিত বিষয়ে পরীক্ষা নিতেন। ভুল হলে শুধরে দিতেন ও উৎসাহ দিতেন।
২৮. প্রাথমিক ও মৌলিক জ্ঞানার্জনের যোগ্য ব্যক্তিদের বিশেষ কারো মন মানসিক বিষয়ে পারদর্শী হওয়ার জন্য উৎসাহ দিতেন। যেমন বংশ বিদ্যা, হস্ড়লিপি বিদ্যা, তাফসীর, হাদীস, কিরাত বহু ভাষা ইত্যাদি।
২৯. অসহায়, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে নির্বিঘ্নে শেখার সুযোগ করে দিতেন।
৩০. যা শেখাতেন তার প্রথম আমল নিজে করে দেখাতেন।

রাসূল (সা.)-এর শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূল সুন্নতের অনুসরণ এবং আখিরাতে জবাবদিহির চেতনা তৈরির মাধ্যমে পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে তৈরি করা।
সময় ও সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে জীবন ও কর্মসূচি, সৎ চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ।
বিশ্বস্ড়, উদ্যমী, সাহসী।
উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করা।
সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যথাযোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা।
ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ সাধন করা।
সবার শিক্ষার্জন ও মেধা বিকাশের সুযোগ নিশ্চিত করা।

হুনাইন বিন আলী (রা.) একবার তার পিতার নিকট জানতে চাইলেন– সাহাবায়ে কেরাম (রা.) উপস্থিত লোকদের সাথে রাসূল (সা.)-এর আচরণ কেমন ছিল? জবাবে আলী (রা.) বললেন, 'রাসূল (সা.) ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল ও নম্র স্বভাবের। তার ব্যবহার ছিল অতিশয় কোমল। তিনি কটুভাষী ও পাষাণ হৃদয় ছিলেন না। ঝগড়া, ছিদ্রান্বেষী এবং অতিরঞ্জিত প্রশংসাকারীও ছিলেন না। তিনি অনাকাঙ্ক্ষিত কথার প্রতি কর্ণপাত করতেন না। কোনো প্রত্যাশাকারীকে সম্পূর্ণ নিরাশ করতেন না; আবার প্রতিশ্রুতিও দিতেন না।'

তিনি অবশ্যই তিনটি জিনিস থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছেন– ঝগড়া, প্রথা বা সম্পর্কে আধিক্য এবং অহেতুক কথা বা কাজ।

তিনি মানুষকে ঐ তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত রেখেছেন– 'কারো দুর্নাম করতেন না, কারো দোষারপ করতেন না এবং কারো দোষ অনুসন্ধান করতেন না।'

তিনি কেবল এরূপ কথাই বলতেন, যা থেকে সওয়াবের আশা করতেন।

আয়েশা (রা.) তাকে কুরআনের প্রতিচ্ছবি বলেছেন।

আর তিনি নিজে নিজেকে চিনিয়েছেন এভাবে– 'আল্লাহর পরিচয় আমার পুঁজি, বুদ্ধি আমার দ্বীনের মূল, ভালোবাসা আমার ভিত্তি। আকাঙ্ক্ষা আমার কান, আল্লাহর স্মরণ আমার বন্ধু, আস্থা ও বিশ্বাস আমার সাথী, জ্ঞান আমার অঙ্গ, ধৈর্য আমার পোশাক, আল্লাহর সন্তুষ্টি আমার জন্য অতি বড় নেয়ামত, বিনয় আমার সম্মান, পার্থিব সম্পদ নিস্পৃহতা আমার পেশা, প্রত্যয় আমার শক্তি, সত্যবাদিতা আমার সুপারিশকারী, আনুগত্য আমার রক্ষাকবচ, জিহাদ আমার চরিত্র আর নামাজ আমার চক্ষুশীতলকারী।'

জিন্দেগী ভর তার একান্ড় অনুগামী ও শিক্ষার্থীদের এ শিক্ষাই প্রদান করেছেন নিরলসভাবে।

সেজন্যই খুনে রক্তপিপাসু মানুষেরাই পরিণত হলো মানুষের জানমালের রক্ষকে, লুটেরা জাতিই পরিণত হলো দানশীল হিসেবে, নিষ্ঠুর ব্যক্তিবর্গই হয়ে গেল ইতিহাসের সবচেয়ে দয়ার্দ্র। এটিই তার মহান শিক্ষার অভূতপূর্ব সাফল্য। যার অনুসরণে বর্তমান সমাজও পরিণত হতে পারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমাজে।

লেখক : প্রবন্ধকার।

মুহাম্মদ (সা.)-এর শিশুপ্রীতি

-আলতাফ হোসাইন রানা

৫৭০ ঈসায়ী ১২ রবিউল আউয়াল, সোমবার সুবহে সাদিকে আমাদের প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) রাহমাতুল্লিল আলামীন কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের পথপ্রদর্শক হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চেয়ে ভালো ও উত্তম মানুষ কোনোদিন পৃথিবীতে আসেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত আসবেও না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর ওপর সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল কুরআন অবতীর্ণ করেন। হজরত মুহাম্মদ (সা.) সকল মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ। যে কথা আল্লাহ তায়ালা নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।' (সূরা আহযাব : ২১)।

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম চরিত্রের সবগুলো গুণাবলীর মধ্যে শিশুপ্রীতি ছিল অন্যতম। রাসূল (সা.) ছোটদের কী পরিমাণ ভালোবাসতেন, ভাবতেন, শিশু-কিশোরদের প্রতিভার, অসীম ভালোবাসার, ভাবনার এবং তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তারই সামান্য কিছু উল্লেখ করা হলো–

শৈশবকাল মানবজীবনের মূল ভিত্তি এবং শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ ও উত্তরাধিকারী। ইসলামে শৈশবকাল ও শিশুদের প্রতি কর্তব্য পালন এবং যথাযথ পরিচর্যার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলাম আমাদের সন্তানদের জন্য স্বাধীন ও স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ শিক্ষা দেয়। পবিত্র কুরআনুল কারীমে সূরা কাহাফে বলা হয়েছে, 'ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বা শিশুরা দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য।'

শিশুদের প্রতি আমাদের প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর স্নেহ ও মমত্ববোধ ছিল গভীর। রাসূল (সা.)-এর মন ছিল শিশুদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) শিশুদের কত গভীরভাবে ভালোবাসতেন, তা বোঝা যায় একটি হাদীস থেকে। হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে এক শিশুকে আনা হলে তিনি তাকে চুম্বন করেন এবং বলেন, এরা মানুষকে ভীরু ও কৃপণ করে দেয় আর এরা হলো আল্লাহর ফুল।

রাসূলে কারীম (সা.) শিশুদের প্রতি কোমল ব্যবহার নিজে করেছেন এবং অন্যদেরও করবার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র মদীনা শহরের শিশুরা বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে খুব ভালোবাসতেন। হজরত মুহাম্মদ (সা.)ও মদীনার শিশুদের

বেশ ভালোবাসতেন। তিনি যখনই শিশুদের দেখতেন, তখনই তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন এবং শিশুদের সব কথা তিনি মনোযোগের সাথে শুনতেন।

পরনে ছেঁড়া-ময়লা কাপড়, অত্যন্ত মলিন, দুঃখ-ব্যথায় ভারাক্রান্ত পথের পাশে দাঁড়িয়ে যে এতিম শিশুটি কাঁদছিল, তা দেখে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) শিশুটির নিকট যান। ছেলেটির সব কথা শুনে তার মাথায় ও শরীরে তাঁর পবিত্র হাত বুলিয়ে বললেন, তুমি আর কেঁদো না, কষ্টবোধ করো না, আর চিন্তা করো না। সব কিছু ভুলে যাও। তোমার পিতা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন– এজন্য দুঃখ করো না। আজ থেকে আমি তোমার পিতা হয়ে গেলাম। মায়ের অভাবও তোমার থাকবে না। আমার স্ত্রী তোমার মা হয়ে গেলেন। এমনকি আমার প্রিয় কন্যা ফাতেমা (রা.) হবে আজ থেকে তোমার বোন। এতিম অসহায় শিশুটি মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মুখ থেকে এমন আদরমাখা কথা শুনে খুশিতে মেতে উঠলো। শিশুটির হৃদয়ের দুঃখ আর ব্যথা-বেদনার যে কষ্ট ছিল, তা পলকের মধ্যেই আনন্দ আর খুশিতে পরিবর্তিত হয়ে গেল যেন। হজরত (সা.) শিশুটির হাত ধরলেন এবং তাকে নিয়ে নিজ ঘরে ফিরে গেলেন এবং নবীর ঘরেই পরম মমতা, স্নেহ-ভালোবাসায় প্রতিপালিত হতে লাগলো। এমন মহানুভবতার পরিচয় কেবল রাসূল (সা.) জীবনেই আমরা দেখতে পাই।

রাসূল (সা.) যেমন শিশুদের ভালোবেসেছেন, স্নেহ-মমতা দিয়েছেন; তেমনি তার উম্মতদেরও শিশুদের প্রতি স্নেহ এবং ভালোবাসতে বলেছেন। হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, একবার হজরত আকরা তামিমী (রা.) রাসূলের (সা.) নিকট আসেন। রাসূল (সা.) সে সময় এক ছোট বালককে আদর করছিলেন। হজরত আকরা তামিমী (রা.) তাকে বললেন, আপনার নিজেদের ছেলেমেয়েদের আদর করেন, আল্লাহর শপথ! আমার দশ-দশজন সন্তান রয়েছে, এদের কাউকেও আমি কোনোদিন চুমু দেইনি। জবাবে রাসূল (সা.) বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা যদি তোমার হৃদয় থেকে ভালোবাসা ও দয়ার প্রবণতা কেড়ে নেন, তাহলে আমি কী করতে পারি।' অন্য এক ঘটনায় আমরা দেখতে পাই– জনৈক ব্যক্তি তার দুই সন্তানের একজনকে আদর করলো এবং অন্যজনকে আদর করলো না। এটা দেখে রাসূল (সা.) তাকে বললেন, তুমি উভয়ের মধ্যে সমতা বিধান করলে না কেন? হজরত মুহাম্মদ (সা.) আরো বলেন, 'তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করো। তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো।' (মুসনাদে আহমদ)।

একবার মসজিদে খুতবা দেয়ার সময় আমাদের প্রিয়নবী রাসূল (সা.)-এর দৌহিত্র হাসান-হুসাইন লাল জামা পরে কম্পিত পায়ে নানার দিকে এগিয়ে এলেন, রাসূল (সা.) এদের দেখে আর থাকতে পারলেন না। তিনি খুতবা বন্ধ রেখে তাদের কোলে তুলে সামনে এনে বসিয়ে তারপর খুতবা শুরু করলেন। রাসূল (সা.) তার নিজ কন্যা ফাতেমা (রা.)-কে খুবই স্নেহ করতেন। রাসূল (সা.) প্রায়ই বলতেন, ফাতেমা আমার কলিজার টুকরো। মহানবী (সা.) বলেন, 'কন্যা হলো সুগন্ধি ফুল। আমি তার সুবাস নিই। আর তার রিজিক তো আল্লাহর হাতে। সাহাবী হজরত আনাস (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)-এর চাইতে আর কাউকে সন্তানদের প্রতি এত অধিক ভালোবাসা প্রকাশ করতে দেখিনি। শুধুমাত্র নিজের ছেলেমেয়েই নয়, অন্যসব শিশুকেও রাসূল (সা.) খুবই ভালোবাসতেন, পরম আন্তরিকতায় আদর-ভালোবাসা দিতেন, তাদের কোলে তুলে নিতেন, সুন্দর নাম রাখতেন, মুখে খেজুর চিবিয়ে দিতেন।

প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) কেবল কোমলমতি শিশু-কিশোরদের আদর-স্নেহ করেছেন তা নয়, তাদের সুশিক্ষা প্রদানেরও নির্দেশ প্রদান করেন। শিশুদের জন্য তিনি কী উত্তম কথাই না বলেছেন। রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা নিজেদের সন্তানদের স্নেহ কর এবং তাদের শিষ্টাচার শিক্ষাদান কর। হজরত মুহাম্মদ (সা.) আরো বলেন, সন্তানদের সদাচার শিক্ষা দেয়া, দান-খয়রাতের চেয়েও উত্তম। রাসূল (সা.) আরো জোর দিয়ে বলেন, 'যে ছোটদের আদর-মমতা করবে না, সে আমার উম্মত নয়।'

শৈশব ও কৈশোরকাল হচ্ছে ছোটদের মানসিক বিকাশের উপযুক্ত সময়। শিশুদের কোমল ও পবিত্র মনে একবার যদি কোনো খারাপ ধারণা প্রবেশ করতে পারে, তবে তা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনেও থেকে যায়। তাই আমাদের প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) শিশু-কিশোরদের সঙ্গে খেলাচ্ছলেও মিথ্যা বা প্রতারণা করতে নিষেধ করেছেন। শিশুদের উত্তম ও উপযোগী শিক্ষাদানের জন্য আল্লাহর নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, তোমাদের সন্তানদের উত্তমরূপে জ্ঞান দান কর। কেননা তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য সৃষ্ট। আল্লাহর প্রিয় হাবীব হজরত মুহাম্মদ (সা.) আরেক জায়গায় বলেছেন, সৎ সন্তান হলো বেহেশতের ফুল।

শিশুদের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, যদি দুধের শিশু, বুড়ো এবং গৃহপালিত পশুরা না থাকতো, তাহলে অচিরেই কঠিন শাস্তি নেমে আসতো। এখানে তিনি শিশুদের উপস্থিতিকে আল্লাহর আজাব ফিরে যাবার একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শিশুদের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে রাসূল (সা.) বলেন, শিশুরা হলো বেহেশতের প্রজাপতিতুল্য।

ছোটদের সুখ-আনন্দ, খেলাধুলার প্রতিও হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। রাসূল (সা.) নিজেও শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করতেন, শিশুদের পরম স্নেহ, আদর-সোহাগ করতেন এবং চুমু খেতেন। সফর শেষে ফেরার পর

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তাঁর উটের সামনে-পিছনে বসিয়ে তাদের নিয়ে বেড়াতেন এবং তাদের সঙ্গে কৌতুক করতেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে কিছু খেলনাসামগ্রী শিশুদের জন্য নিয়ে গেল, সে যেন অভাবগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে সাদকা সামগ্রী বয়ে নিয়ে গেলো।

একটি প্রাচীন আরবি কবিতায় বলা হয়েছে এভাবে– শিশুরা সুখময় জীবনের সুসংবাদ। আমাদের জীবনের চারাগাছ, আশা-আকাঙ্ক্ষার ফল এবং আমাদের চোখ ও মনের বড় প্রশান্তি।

সন্তানদের সুশিক্ষা দেয় এবং সুশিক্ষার আলোকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা পিতা-মাতার অপরিহার্য কর্তব্য। তাদের উত্তম নৈতিক চরিত্র গঠন করতে হবে। ইসলামী আদব-কায়দা এবং আচার-অনুষ্ঠান তাদের শিখাতে হবে। আমাদের প্রিয়নবী, মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) শিশুদের জন্য এই বলে দোয়া করেছেন, 'আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন, যেন আমাদের কলিজার টুকরোদের যোগ্যতার শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারি। আর আমদের শক্তি দান করুন আল্লাহ প্রদত্ত নূর ও হিদায়াতের শিক্ষার পথে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা চালাতে।

হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুমহান শিক্ষাকে সামনে রেখে যদি প্রতিটি শিশু-কিশোরদের আধুনিক ও ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার অনুশাসনে গড়ে তোলা যায়, তাহলে পিতা-মাতা, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সর্বস্তরে তাদের সেবা লাভে উপকৃত হবে।

লেখক : শিশু সাহিত্যিক।

বিশ্বনবীর (সা.)-এর শিক্ষা এবং ইসলামী আন্দোলন

-আবদুল হালীম খাঁ

মুসলমানদের একটি গর্বিত অতীত ছিল। ছিল এক গৌরবময় ইতিহাস। মুসলমানরা সেই গৌরব অর্জন করেছিলেন আল কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা থেকে। আরবের অশিক্ষিত মরুচারী বেদুইনগণ রাসূল (সা.)-এর শিক্ষার বদৌলতে অতি অল্প সময়ে এতসব মহৎ গুণ অর্জন করেছিলেন, তৎকালে তারা সারা দুনিয়াকে চমকে দিয়েছিলেন। অবস্থাটা কীরূপে হয়েছিল?

আগে পারশিকরা বিশ্বাস করতো যে, একজন পারসিক সৈন্য দশজন আরবের সমান। তারা অবজ্ঞাভরে আরবদের ডাকতো ভিক্ষুকের জাত বলে। এই বিশ্বাস একতরফা ছিল না। আরবরাও এক পারসিক সৈন্যকে যুদ্ধক্ষেত্রে দশজন আরবির সমান মনে করতো। তারপর মাত্র তেইশ বছরে, মহানবী (সা.) আরবের সেই অজ্ঞাত-অশিক্ষিত বিচ্ছিন্ন ও দরিদ্র লোকগুলোকে ডেকে একত্র করে রূপান্তরিত করলেন এমন এক শক্তিশালী জাতিতে, যে জাতি পরবর্তীকালে ঐ পারসিকদের যুদ্ধক্ষেত্রে তুলোর মতো উড়িয়ে দিলেন।

তখন দেখা গেল, একজন মুসলিম মুজাহিদ দশজন পারসিক সৈন্যের সমান। অর্থাৎ একদম সম্পূর্ণ উল্টো অবস্থা। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে এই অবস্থার পরিবর্তন। এটা কীভাবে সম্ভব হলো? কোন শক্তিবলে আরবের সেই হতদরিদ্র অশিক্ষিত বিচ্ছিন্ন লোকগুলো এমন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন? নিঃসন্দেহে ইসলাম। ইসলাম আল্লাহর দেয়া এমন এক জীবনব্যবস্থা; আর মহানবী (সা.)-এর প্রশিক্ষণে তাঁরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধায় পরিণত হয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অপরাজেয় জাতি হিসেবে গড়ে উঠেছিলেন। ইসলামী জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুর্বলরা আর দুর্বল থাকে না। হীন নিঃস্বরা আর হীন নিঃস্ব থাকে না। ভীরুরা আর ভীরু থাকে না। তারা হয়ে ওঠেন শক্তিশালী, সাহসী, দুর্বার এবং অসাধারণ তেজদীপ্ত।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ওমর, আলী, খালিদ, আমর ইবনুল আস, আহমদ জাবাল, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, সালমান ফারসী, আবুজর গিফারী, জায়েদ ইবনে হারিছা এবং বেলাল কি বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন? ছিলেন না। ইসলাম গ্রহণ করে তাঁরা একেকজন হলেন নানারকম মহৎ গুণে গুণান্বিত এবং অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বিশ্বের ইতিহাসে আজো তাঁরা অমর, অম্লান ও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছেন। এমনি আরো হাজার হাজার জনের নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁরা কোনো কলেজ-ভার্সিটিতে লেখাপড়া করেছিলেন? কয়টা সার্টিফিকেট অর্জন করেছিলেন?

ওমর, যিনি একসময় তাঁর পিতা খাত্তাবের বকরী চরাতেন মাঠে মাঠে। আর নানা অযোগ্যতার কারণে পিতা তাঁকে বকাঝকা করতেন এবং কখনো চাবুক মারতেন। সেই ওমর ইসলাম গ্রহণ করে তৎকালীন বিশ্বকে নিজের মাহাত্ম্য ও যোগ্যতাবলে বিস্ময়াবিষ্ট করে ফেললেন। বিশাল রোম সম্রাট কায়সার ও পারস্য সম্রাট কিসরার রাজমুকুট ও সিংহাসন ছিনিয়ে আনলেন এবং এমন এক ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ কায়েম করলেন যে, একই সঙ্গে উল্লিখিত দুই হুকুমতের ওপর পরিবেষ্টনকারী এবং সর্বোত্তম ব্যবস্থা ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার রাখে। আর ন্যায়বিচারের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন তুলনাহীন প্রবাদবাক্যতুল্য।

হজরত আলী আর খালিদের মতো সাহসী বীর যোদ্ধা সেনাপতি পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো জাতির মধ্যে আর কি কেউ আছে? ইসলামের ইতিহাসে এমনি আরো অনেক রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, সেনাপতি, দিগ্বিজয়ী বীর, ন্যায়পরায়ণ বিচারক,

সমাজসেবক, দানবীর, ধ্যানী-জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক মহামনীষী রয়েছেন। তারা কোথায় কোন কলেজে-ভার্সিটি মাদরাসায় শিক্ষা করেছিলেন? এই বিষয়গুলো এখন আমাদের চিন্তা করা উচিত।

মুসলমানরা যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন, তখন তারা হলেন মানবতাবাদী, জনদরদী, পরোপকারী ও বিশ্বস্ত নেতা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার কল্যাণকামী সত্য ও সুন্দর পথের দিশারী। তাদের হাতে ছিল আল কুরআন– আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান শরীয়াত। এজন্য তাদের অনুমান করে কোনো আইনকানুন তৈরি করতে হয়নি। দুনিয়ার অন্য কাউকে অনুসরণ ও অনুকরণ করতে হয়নি, কারো কাছে ধরনা দিতে হয়নি। দিন দিন আইন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে হয়নি। তাঁরা ছিলেন ভ্রান্তিমুক্ত। নিজেদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমরনীতি, শিক্ষানীতি ও পারস্পরিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে দিকভ্রান্ত হয়ে অন্ধকারে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করতে হয়নি। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল নির্ভুল ও সঠিক। তারা প্রত্যেক কাজে হয়েছেন সফল। কারণ তাদের হাতে গাইডবুক ছিল আল কুরআন এবং তাঁদের আদর্শ ছিলেন রাসূল (সা.)। তাঁরা বুঝেছিলেন আল কুরআন বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ। এটি চির নতুন এবং সকল কালের সকল মানুষের জীবনবিধান। এটি কোনোকালে পুরনো বা জীর্ণ হবে না। এটি এক কূলকিনারাহীন অতল-অসীম জ্ঞানসমুদ্র। এই মহাগ্রন্থ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আমি আল কিতাবে কিছুই বাদ রাখিনি।' (সূরা আন'আম : ৩৮)।

তৎকালের মুসলমানরা আল্লাহর কালামের অর্থ বুঝেছিলেন। তারা কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় অশেষ অবদান রেখেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের এমন কোনো বিভাগ নেই, যেখানে মুসলমানদের অবদান নেই এবং মুসলমানদের সেই অবদানের ওপর ভিত্তি করেই বর্তমানের আধুনিক বিজ্ঞান এত উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

পরবর্তীকালে রাসূল (সা.)-এর আদর্শ ও শিক্ষা ভুলে মুসলমানগণ আল কুরআন ফেলে হাতে তুলে নিয়েছেন গানের বাদ্যযন্ত্র। অনুসরণ করছেন যাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, সেইসব অভিশপ্ত ও বিভ্রান্তদের। আমাদের সমাজে এখন কুরআনচর্চা গবেষণার নিয়ম নেই। কুরআন না বোঝার কারণে সামাজিক জীবনে কুরআনী বিধান চালু নেই এবং এর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কেউ কুরআনের বিধান কায়েম করতে চাইলে একশ্রেণীর কুরআনওয়ালা আলেম (!) বিরোধিতা করছেন। এর ফলে আমাদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কুরআনের সামান্য অংশও নেই। প্রিয়নবী (সা.) বলেছেন, 'যার মধ্যে কুরআনের সামান্য অংশও নেই, সে যেন এক বিরান ঘর।' বিরান ঘরের কোনো সৌন্দর্য নেই, মূল্যও নেই।

মুসলিম জাতি কুরআনহীন হয়ে বর্তমানে বিরান ঘরের মতো হয়ে পড়ে আছে। তাই এ জাতির কোনো সৌন্দর্য নেই, আকর্ষণীয় চরিত্র নেই, মূল্য নেই ও মর্যাদা নেই। তারা নানা দলে, উপদলে ও ফেরকায় বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়ে আছে। তাদের মধ্যে ঐক্য নেই, জাতীয় চেতনা ও মর্যাদাবোধ নেই। দেশে দেশে বিজাতির হাতে মার খাচ্ছ, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছে; তবু তাদের লজ্জাবোধ হচ্ছে না। জাতীয় চেতনা জাগ্রত হচ্ছে না। তাদের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে। কুরআন ছেড়ে দেয়ার কারণে তাদের জ্ঞানের উৎসমুখ বন্ধ হয়ে গেছে।

বর্তমানে মুসলমানদের এমন হীন অবস্থা দেখে অমুসলিমরা খুবই তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও ঘৃণা করছেন। তারা মনে করছেন, মুসলমানরা অসভ্য, বর্বর, জঙ্গি ও সন্ত্রাসী জাতি। ইউরোপ ও আমেরিকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ও সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে তারা এ কথাই প্রচার করে যাচ্ছেন।

এ দেশে দীর্ঘকাল বিজাতীয় শাসন, শোষণ, নির্যাতন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চালু থাকায় মুসলমানরা তাদের গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আদর্শ ভুলে গেছে। তাদের পূর্বপুরুষরা কেমন কীর্তিমান ছিলেন, তা তাদের জানা নেই। এজন্য যখন তাদের ওপর দোষারোপ করে বলা হয়– মুসলমানরা মৌলবাদী, মুসলমানরা জঙ্গি-সন্ত্রাসী, অতীতে তাদের কোনো অবদান নেই এবং আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা, সভ্যতা ও আবিষ্কারে তাদের কোনো অবদান নেই; তখন কেউ তার জবাব দিতে পারেন না। আমাদের তরুণসমাজ তাদের ইতিহাস জানে না। কারণ বর্তমানের স্থবির শিক্ষাব্যবস্থায় চিন্তা স্রোতরুদ্ধ করে ফেলা হয়েছে শিক্ষার্থীদের। মুসলমানগণ আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূল (সা.)-এর আদর্শ থেকে সরে যাওয়ার কারণেই এই দুরবস্থা। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে শক্ত করে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না।' আরো বলা হয়েছে, 'তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে অন্য সকল জাতির জন্য।' মহান স্রষ্টা রাসূল (সা.)-কে বলেছেন, 'হে রাসূল! আপনি তাদের বলে দিন, তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।' (সূরা আলে ইমরান : ৩১)।

মহানবী (সা.) বলেছেন, আমাকে অনুসরণ করো, আমার সুন্নাত পালন করো, যে আমার সুন্নাত ত্যাগ করবে সে আমার কেউ নয়। তিনি আরো বলেছেন, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র, কন্যা অপেক্ষা আমাকে অধিক ভালো না বাসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। (বুখারী, মিশকাত)।

মহানবী (সা.) আমাদের মহান নেতা। তাঁর সুন্নাত কী? আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন, 'পৃথিবীতে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন হিদায়াত এবং সত্য দ্বীন নিয়ে, যাতে করে সে এটিকে বিজয়ী করে অন্যসব ধর্মের উপর।' (সূরা আল ফাতাহ : ২৮, তওবা : ৩৩, আস সাফ : ৯)।

কারণ অশান্ত পৃথিবীকে শান্ত এবং শান্তি প্রদানের একমাত্র পথই আল্লাহর দেয়া এই জীবনবিধান। মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবীকে শুধু নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি শেখাতে পাঠাননি। ওগুলো তাঁর সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য, যে জাতির দরকার সেই জাতির চরিত্র গঠনের প্রক্রিয়া, উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো ইসলাম প্রতিষ্ঠা, সিরাতুল মুস্তাকীম সারা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা।

প্রত্যেক নবী তাঁর ওপর দেয়া দায়িত্ব পূর্ণ করেছেন তাঁর অনুসারীদের দ্বারা। কোনো নবী একা একা তাঁর কাজ, তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেননি। তাঁদের প্রত্যেকেরই কাজ ছিল সমাজে মানুষ নিয়ে, তাঁদের জাতি নিয়ে। কোনো নবীই পাহাড়ের গুহায়, নির্জনে বা হুজরাখানায় বসে কাজ করেননি। মহানবী (সা.)-এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। নবুয়্যত পাওয়ার মুহূর্ত থেকে ওফাত পর্যন্ত পৃথিবীর ব্যস্ততম মানুষটির জীবন কেটেছে মানুষের মধ্যে, জনকোলাহল নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে, সশস্ত্র সংগ্রামে। নবুয়্যতের সমস্ত জীবনটাই বহির্মুখী, যে জীবনবিধান তিনি আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছিলেন, সেটার চরিত্রই হলো বহির্মুখী এবং সংগ্রামী।

আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব যে তাঁর উম্মতের ওপর ন্যস্ত করে গেলেন, তা যে তাঁর উম্মত পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর প্রমাণ উম্মতদের পরবর্তী কার্যক্রম। বিশ্বনবী (সা.)-এর ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উম্মতের বাড়িঘর, স্ত্রী-পুত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য এককথায় সবকিছু ত্যাগ করে তাঁদের প্রাণপ্রিয় নেতার অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করার জন্য দেশ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এ ইতিহাস কারো অস্বীকার করার উপায় নেই। মানুষের ইতিহাসে এমন ঘটনা নেই যে, একটি সম্পূর্ণ জাতি এক মহান আদর্শ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পার্থিব সবকিছু ত্যাগ করে দেশ থেকে বেরিয়ে পড়েছে এবং সে মহান আদর্শ হচ্ছে সারা পৃথিবীতে এমন একটি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যেটি মানুষের ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক সর্বক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ ও উন্নতি বয়ে আনবে। সমাজ ও জাতীয় জীবনে থাকবে না হিংসা, বিবাদ, যুদ্ধ, সন্ত্রাস, অরাজকতা, অন্যায়, অনাচার, অবিচার ও অশান্তি। মহানবী (সা.) বলেছিলেন, আমাকে অনুসরণ করো, আমার সুন্নাত পালন করো, যে আমার সুন্নাত ত্যাগ করবে সে আমার কেউ নয়। (বুখারী মিশকাত)।

একমাত্র মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে তাঁর সাহাবীগণ বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্বদেশ, আত্মীয়-স্বজন ও দেশত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন। এমন ঘটনা ইতিহাসে আর নেই। আমরা যদি আমাদের মুসলিম জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে চাই, তবে ইতিহাসের এই নজিরবিহীন ঘটনাকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।

বহু হাদীস থেকে উল্লেখ করা যায়, যা থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, বিশ্বনবী নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর সাহাবীগণ তাঁর শিক্ষায় পরিপূর্ণরূপে শিক্ষিত হয়েছিলেন। তাঁর মর্মবাণী তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং বিশ্বনবী প্রকৃত নামের অর্থাৎ প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। এ বিষয়ে অনেক হাদীস রয়েছে। এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করছি।

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মুয়াযকে ইয়েমেনের শাসক নিযুক্ত করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন, যদি তোমার কাছে কোনো বিচারের দায়িত্ব আসে, তাহলে কীভাবে বিচার করবে? মুয়ায বলেন, আমি আল্লাহর কিতাব দ্বারা বিচার করবো। তিনি প্রশ্ন করেন, যদি আল্লাহর কিতাবে (তোমার কেসের কোনো বিধান) না পাও? মুয়ায বলেন, তাহলে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত দ্বারা (বিচার করবো)। রাসূলুল্লাহ বলেন, যদি আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের মধ্যে তোমার নির্দিষ্ট কেসের কোনো বিধান না পাও? মুয়ায বলেন, তাহলে আমি সর্বাত্মকভাবে আমার বুদ্ধিমত্তা ও মেধা প্রয়োগ করে ফয়সালা প্রদানের চেষ্টা করবো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বুকে থাবা দিয়ে বলেন, আলহামদুলিল্লাহ; প্রশংসা আল্লাহর, যিনি রাসূলুল্লাহর প্রতিনিধিকে তৌফিক প্রদান করেছেন এমনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) পছন্দ করেন। (হাদীসটি আবু দাউদ ও তিরমিজী বর্ণনা করেছেন)।

উল্লিখিত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, মহানবী (সা.) স্বয়ং তাঁর সঙ্গীদের ইসলাম কী, এর উদ্দেশ্য কী, ঐ উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া কী; সবই শিক্ষা দিয়েছিলেন। সুতরাং প্রকৃত ইসলাম কী, তা সাহাবীদের চেয়ে বেশি অন্য কেউ জানতে বা বুঝতে পারেন না। তাঁদের ব্যতীত অন্যদের জানা বা বোঝা সম্ভব নয়।

মহানবী (সা.)-এর ওফাতের আট মাস পরই সাহাবীগণ আরব থেকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার অভিযানে বের হয়েছিলেন। এই আট মাসও হয়তো দেরি হতো না, যদি কয়েকজন মিথ্যানবী আর মুনাফিকরা মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতো। তাদের দমন ও শায়েস্তা করতে আট মাস সময় লেগেছিল।

মুসলিম মুজাহিদগণ যেদিকে গিয়েছেন তারা বিরোধীদের তিনটি শর্ত দিয়েছেন। এই শর্ত তিনটি তারা শিখেছিলেন তাঁদের মহান নেতা আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে। কারণ তিনিও বিরোধীদের এ তিনটি শর্ত দিতেন।

শর্ত তিনটি হলো–

১. প্রথমত, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও বিশ্বনবীকে স্বীকার করে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করো। তাহলে তোমরা আমাদের ভাই হয়ে যাবে এবং আমাদের সঙ্গে একত্র হয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমাদের সহযোগী হয়ে যাবে।

২. দ্বিতীয়ত, শর্ত হলো তাতে যদি সম্মত না হও, তবে রাষ্ট্রশক্তি ও শাসনক্ষমতা ব্যবস্থা আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, আমরা ইসলামী জীবনবিধান অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবো। তোমরা ব্যক্তিগতভাবে যার যে ধর্ম আছো, তাই পালন করবে, তাতে আমরা কোনো বাধা দেবো না। তোমাদের এক জোড়া ছেঁড়া জুতাও আমরা নেবো না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা আমরা শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হলে আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করবে না (শুধু যুদ্ধাক্ষম লোক) তারা মাথাপিছু একটা কর দেবে।

৩. তৃতীয়ত, যদি এটাও স্বীকার না করো, তবে যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। কারণ এ জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বিশ্বনবী (সা.)-এর ওপর স্রষ্টার অর্পিত দায়িত্ব। ইবলিশের চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে জয়ী করতে আমরা পার্থিব সবকিছু বিসর্জন দিয়ে এখন প্রাণ বিসর্জন দিতে এসেছি। তবে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়ে যদি আমাদের তোমাদের ওপর এই জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে তোমাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করবো না, তবে তোমাদের যোদ্ধাদের বন্দী করবো।

বিশ্বনবী (সা.)-এর সাহাবীদের এই প্রচেষ্টাকে পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এই কর্মনীতিকে নানাভাবে বিকৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অমুসলিমরা তো বটেই, মুসলমান নামধারী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুশরিক ও কাফিররাও নানা অপপ্রচার করেছে।

ইসলামী শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য

ইসলামের উদ্দেশ্য হলো শাসনব্যবস্থায় আল্লাহর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা, যেটা করা হলে সামাজিক ও জাতীয় জীবনে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্যক্তি যদি তার ব্যক্তিগত জীবনে ভুল পথ আঁকড়িয়ে থাকে, তবে সে তার ফল ভোগ করবে ঐ ব্যক্তিগতভাবে, জাতীয় জীবনে নয়। জাতীয় জীবন যদি ভুল আইনকানুনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে ব্যক্তিজীবন সৎকাজের ওপর থাকলেও তা স্থায়ী হবে না। বৃহত্তর জাতীয় জীবনের চাপে ও প্রভাবে তা বিলীন হয়ে যাবে। যেমন বর্তমান পৃথিবীতে লাখকোটি মানুষ অতি নিষ্ঠার সাথে ধর্মকর্ম, সৎকাজ করলেও পৃথিবী অন্যায়, অবিচার, খুন, গুম, সন্ত্রাস, জোর-জুলুম, ধর্ষণ, অনাচার, ব্যভিচারে পূর্ণ হয়ে আছে এবং প্রতিদিন এসব অন্যায় দ্রুতগতিতে বেড়ে চলছে। ব্যক্তিগভাবে সাধু হয়ে থাকা ও জাতীয় জীবনকে ভুল আইনকানুন ইত্যাদির হাতে ছেড়ে দেয়ার ফলে মানবজীবন আজ শুধু ভীষণ অশান্তিতে ভুগছে না, প্রলয়ঙ্করী আণবিক যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

সংক্ষেপে বললে বলতে হয়, সাহাবীগণ হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন যে, তাঁদের অস্তিত্বের অর্থই হলো তাঁদের নেতা বিশ্বনবী (সা.)-এর সুন্নাত অনুসরণ করা, অর্থাৎ তিনি সারা জীবন যে কাজটি করেছেন সেই কাজ চালিয়ে যাওয়া। সেই কাজে বিরাটত্ব সঙ্কট ও বিপদ তাদের এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধাগ্রস্ত করতে পারেনি। কারণ তাঁরা তাঁদের নেতার মুখে শুনেছিলেন, যে আমার সুন্নাত ত্যাগ করবে সে আমার কেউ নয়। তাঁরা বুঝেছিলেন, তাঁর কেউ নয় অর্থ উম্মতে মুহাম্মদীই নয় এবং তাঁর সুন্নাত হলো পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

বিশ্বনবীর সাহাবীরা উম্মতে মুহাম্মদী হওয়ার অর্থ কী– বুঝেছিলেন এবং তাঁরা কীসের প্রভাবে একটা অজ্ঞাত, উপেক্ষিত ও অশিক্ষিত জাতি থেকে রাতারাতি বিশ্বজয়ী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, তা বুঝতে হলে ইতিহাসের ঘটনাগুলো জানা খুবই প্রয়োজন। এখানে মাত্র একটি ঘটনা উল্লেখ করছি–

মুজাহিদ বাহিনীর সেনাপতি আমর (রা.) মিসরের আর্চ বিশপের কাছে শর্ত দিয়ে যে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন তাঁর দলপতি ছিলেন নিগ্রো উবায়দা (রা.)। আর্চ বিশপ কী বললেন? তিনি এক কালো নিগ্রোর সাথে কথা বলতে রাজিই হলেন না। ঘৃণাভরে তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু কথা হলো সাধারণ ভাষায় 'ঠেলার নাম বাবাজি।' পরে যেহেতু সেনাপতি আমর (রা.) ঐ নিগ্রোকেই দলপতি করে পাঠিয়েছিলেন, কাজেই বাধ্য হয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে হলো এবং তাঁর কথা মানতেও হলো, না মেনে যে উপায় নেই। উবায়দা (রা.) বললেন, 'আমাদের বাহিনীতে আমার মতো এক হাজার কালো লোক আছে। আমরা শত শত্রু বাহিনীর সাথে একসাথে যুদ্ধ করতে তৈরি আছি। আমরা বেঁচে আছি শুধু আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য। আমরা ধন-দৌলতের কোনো পরোয়া করি না, আমাদের শুধু পেটের ক্ষুধা মেটানো আর পরার কাপড়ের বেশি কিছু চাই না। এই পার্থিব জীবনের কোনো দাম নেই আমাদের কাছে। এর পরের জীবনই আমাদের কাছে সব।'

এই ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে তো আছেই, যারা আমাদের কোনো কিছুই ভালো দেখেন না, তাদের ইতিহাসবিদরাও এই ঘটনাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। (সূত্র : s. s.Leeder-Gi Veiled mysteries of Egypt)।

মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর অবিশ্বাস্য বিজয়ের মূলে ছিল এই আকীদা। এই দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এবং এই আকীদাই তাদের পরিণত করেছিল এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, অপরাজেয় জাতিতে। যাদের নাম শুনলে অমুসলিমদের আত্মা পর্যন্ত ভয়ে কেঁপে উঠতো।

লেখক : কবি।

রাসূল (সা.) : যে আলোয় ভুবন রঙিন

-সিরাজাম মুনিরা ঝুমানা

মানবতা ও মনুষ্যত্বের মূর্তপ্রতীক রাসূল (সা.)। মহান আল্লাহ্ মানবজাতির মহান শিক্ষক হিসেবেই তাঁকে প্রেরণ করেছেন। বাস্তবেও রাসূল (সা.) গোটা মানবজাতির জন্য শান্তি, কল্যাণ, নিরাপত্তা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন।

যখন আরব সমাজ চরম অবস্থায় লিপ্ত ছিল, হত্যা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, রাহাজানি, নারী নির্যাতন, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও হানাহানি-রেষারেষিতে পঙ্গু হয়ে পড়েছিল সমাজব্যবস্থা, সেই পরিস্থিতিতে সমাজ সংস্কার ও আমূল পরিবর্তনের স্লোগান নিয়ে মানবজাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন ঘটেছিল।

রাসূল (সা.)-এর পবিত্র জীবনচরিত পর্যালোচনা করলে দু'টি বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে– প্রথমত, তাঁর জীবনধারার অন্তর্নিহিত বৈপ্লবিক আদর্শ-যার ছোঁয়ায় মানব সমাজ ও সভ্যতায় এসেছে বৈপ্লবিক রূপান্তর। দ্বিতীয়ত, সে আদর্শের সুষ্ঠু রূপায়নের জন্য তাঁর নির্দেশিত বৈপ্লবিক কর্মনীতি; যার সফল অনুস্মৃতির মাধ্যমে একটি অসভ্য ও উচ্ছৃঙ্খল জনগোষ্ঠী পেয়েছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিরোপা।

রাসূল (সা.) এর জীবনী থেকে যথার্থ উপকারিতা অর্জনের জন্য যে গুর"ত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব জানা জর"রি, তা হলো রাসূল (সা.)-এর সামনে ইপ্সিত পরিবর্তনের পরিধি কতদূর? তাঁর কাজের মানদ" কী ছিল? সমাজ ব্যবস্থায় তিনি কি আংশিক পরিবর্তন চাইতেন না সর্বাত্মক? তাঁর দাওয়াত কি নিছক ধর্মীয় ও নৈতিকতার সঙ্গে জড়িত ছিল, না সার্বিক সমাজব্যবস্থার জন্য ছিল? সামাজিক পরিম"লে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য কী ছিল? এর জবাব আল-কুরআনে সূরা হাদীদের ২৫নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

'আমি আমার রাসূলকে (সা.) এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছি এবং তার ওপর কিতাব ও মানদ" নাজিল করেছি, যাতে মানবজাতি ন্যায় ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।'

সূরা আস্সফ এর ৯নং আয়াতে বলা হয়েছে– 'আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে (সা.) হেদায়েত ও সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি এ সত্য দীনকে অন্য সমস্ড় ধর্ম, মত ও জীবনব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করে দিতে পারেন। মুশরিকরা তা পছন্দ কর"ক আর নাই কর"ক।'

তাহলে বোঝা গেল, ইসলামের দাওয়াতের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মানবজীবনকে ইনসাফ ও ন্যায়ের ভিত্তিতে গড়ে তোলা এবং সমাজব্যবস্থায় কার্যকরভাবে ভারসাম্য ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা। তাহলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ড় পৌঁছা যায় মুহাম্মদ (সা.) শুধুমাত্র নিছক ধর্মের কথা নয়, বরং ঘুণে ধরা একটি সমাজকে ভেঙে নতুন আরেকটি সমাজ কায়েমের নিরলস চেষ্টা করেছিলেন যে সমাজে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, নেতৃত্ব ও বিচারব্যবস্থা সবই হবে মানবতার জন্য, দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির জন্য।

আলোকিত মানুষ গঠনে, দক্ষ প্রশিক্ষক হিসেবে এবং সমাজ সংস্কারে রাসূল (সা.) যে বৈপ্লবিক আদর্শ ও কর্মনীতি গ্রহণ করেছিলেন সংক্ষিপ্ত কলেবরে তার-ই আলোকপাত করা হয়েছে এ রচনায়।

মুসলমানদের চারিত্রিক উৎকর্ষতা সাধনে রাসূল (সা.)-এর অবদান অবিস্মরণীয়। নিজ চরিত্রের তাকওয়া, ক্ষমা, উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা, প্রজ্ঞা, সততা, ধৈর্য, ত্যাগ, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, একনিষ্ঠ ইবাদত প্রভৃতি অসাধারণ গুণাবলী তিনি সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন তাঁর অনুগামীদের মধ্যে। আর তাই তো জাহেলিয়াতের পঙ্কিলতায় আবদ্ধ মানুষগুলো তাঁর সাহচর্যে এসে পরিশুদ্ধ হলো, যাদের মধ্যে কঠোরতা ছিল তারা কোমল হৃদয়ের অধিকারী হলেন, ত্যাগ-ক্ষমা যাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তারাই ত্যাগ ও ক্ষমার মহান আদর্শে উজ্জীবিত হলেন।

রাসূল (সা.) নিজে যেমন ব্যক্তিগতভাবে অনন্য চরিত্রের অধিকারী ছিলেন ঠিক, তেমনি অনুসারীগণের চরিত্রকে মাধুর্যম"িত করা-ই ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ। উদাহরণস্বরূপ– আবু বকর (রা.)-এর সত্যবাদিতা, হজরত উমর (রা.)-এর ন্যায়পরায়ণতা, হজরত উসমান (রা.)-এর দানশীলতা, হজরত আলী (রা.)-এর প্রজ্ঞা– এখনো আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। আর এর পেছনে রাসূলের (সা.) প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। ফলে সমাজে এমন একটি অসাধারণ জনগোষ্ঠী গড়ে উঠল, যার সদস্যদের চারিত্রিক সৌন্দর্যে-আদর্শে-কার্যনীতিতে মুগ্ধ হয়ে বিপুলসংখ্যক মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিল

ঘুণে ধরা সমাজের মানুষগুলোর কলুষিত অন্তরকে সত্যের আলোয় উজ্জ্বল করার উদ্যোগ মোটেই সহজ ছিল না। আর এই কষ্টসাধ্য কাজকে ফলপ্রসূ করতে রাসূল (সা.)-এর প্রশিক্ষণ পদ্ধতিও ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন– (সঠিক পথের সন্ধানের জন্য) আমি এভাবে তোমাদের কাছে তোমাদের মাঝ থেকেই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছি, যে ব্যক্তি (প্রথমত) তোমাদের কাছে আমার 'আয়াত' পড়ে শোনাবে, (দ্বিতীয়ত), সে তোমাদের আমার কিতাব ও (তার অন্তর্নিহিত) জ্ঞান শিক্ষা দেবে, (সর্বোপরি) সে তোমাদের এমন বিষয়সমূহের জ্ঞানও শিখাবে যা তোমরা কখনো জানতে না। (সূরা আল বাকারা : ১৫১)।

সমাজের সামষ্টিক পরিবেশকে পূতঃপবিত্র এবং মার্জিত-পরিশীলিত মানে উন্নীত করার জন্য রাসূল (সা.) আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রাণপ্রিয় সাহাবী ও মুসলিম উম্মতকেও এ ধারা অব্যাহত রাখার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। স্নেহময় শিক্ষক মহানবী (সা.) দৈহিক বা আর্থিক শক্তির প্রভাব নয়, বরং যুক্তির অস্ত্র দিয়ে জনমত গঠনের প্রশিক্ষণ দিয়ে গেছেন।

সময়ের প্রয়োজনে ময়দানে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে অংশগ্রহণ সত্ত্বেও মৌখিক ও চারিত্রিক দাওয়াতের প্রশিক্ষণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন রাসূল (সা.)। ব্যাপক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে চিন্তার বিপ্লব সাধন এবং হিতাকাঙ্ক্ষীসুলভ আবেদনের শক্তি, নৈতিক শক্তি, সমালোচনার শক্তির মাধ্যমে মুশরেক, মুনাফেক ও আহলে কিতাবগণের অন্তরে ইসলামের সুমহান বাণী গেঁথে দেয়ার প্রশিক্ষণ আমরা আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর জীবন থেকে পাই। কুরআন যেমন কোনো প্রকারের উগ্রতাকে বা প্রতিশোধ-প্রতিহিংসাকে অবলম্বন করার অনুমতি দেয়নি, তেমনি আর ইসলামের সঠিক দাওয়াতের ক্ষেত্রে কোনো প্রকারের গোঁজামিলের বা আপসকামিতাকেও প্রশ্রয় দেয়নি। যারা দাওয়াতের বিরোধিতা করেছে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যুক্তির মাধ্যমে তাদের পথকে ভুল প্রমাণ করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। ভুল পথ না ছাড়ার পরিণাম দুনিয়ায় ও আখিরাতে কী হবে, তা-ও যুক্তির মাধ্যমে বলতে হবে– এই ছিল রাসূল (সা.)-এর প্রশিক্ষণ-নীতি।

যুদ্ধকালীন অস্থির সময়েও রাসূল (সা.) একজন সুদক্ষ ও নৈতিক শিক্ষক হিসেবে মুসলিমদের জন্যে যথোচিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। বদর ও উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সামান্য ভুলের প্রেক্ষিতে তাদের চূড়ান্তভাবে বলে দেয়া হলো যে, দুনিয়ার ফায়দা হাসিলের জন্য নয়, বরং দুনিয়ার নৈতিক বিকৃতিকে সংশোধন করা এবং আল্লাহর বান্দাদের গায়রুল্লাহর গোলামি থেকে মুক্ত করার অপরিহার্য প্রয়োজনেই তাদের শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। যে সংস্কার সংকল্প তারা নিয়েছে, তাদের দৃষ্টি সেদিকেই নিবদ্ধ থাকা উচিত এবং এই লক্ষ্য অর্জনের পথে কোনরূপ অন্তরায় হতে পারে– এমন কোনো পার্থিব স্বার্থের দিকেই তাদের ফিরে তাকানো অনুচিত। আর সর্বদা মহান আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করা এবং তারই করুণা ও অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে ময়দানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাদের আসল শক্তি। লোকদের মধ্যে দীনি চেতনা সৃষ্টি এবং ইসলামী ও অনৈইসলামী জীবনপদ্ধতির পার্থক্যবোধ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.) কয়েকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেন।

সংস্কারের ইতিহাসে দুনিয়ার অন্য কোনো নবী-রাসূল বা ব্যক্তিকে মহানবী (সা.)-এর মতো এত বেশি ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়নি। সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি যে বিপ্লব এনেছিলেন তা পৃথিবীর সর্বমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মহানবীর (সা.) বিরতিহীন প্রচেষ্টার ফলেই আরবদের চিরাচরিত গোত্রভিত্তিক রাজনীতির অবসান ঘটেছিল। মহানবী (সা.) সমগ্র আরববাসীকে একই রাজনৈতিক ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করে মদিনায় ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি সহজ সরল সামাজিক ও নৈতিক আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করে দেশ ও সমাজে চিরশান্ড়ির বীজ বপন করেন। ধর্মীয় জীবনে আরবরা ছিল অতন্ড় দুর্নীতিগ্রস্ড় ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। মূর্তিপূজা, বসন্তপূজা ও সব কুসংস্কার যখন আরবের ধর্মীয় জীবনে গভীরভাবে কলুষিত করেছিল ঠিক সে সময় হজরত মুহাম্মদ (সা.) তৌহিদের বাণী নিয়ে আবির্ভূত হলেন। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'আল্লাহ এক তাঁর কোনো শরিক নেই এবং হজরত মুহাম্মদ (সা.) তার প্রেরিত রাসূল। তাঁর একত্ববাদের বাণী আরবদের যুগ যুগ লালিত পৌত্তলিকতার মূলে কুঠারাঘাত এনেছিল। আরবরা নিকৃষ্ট পার্থিব পূজা ত্যাগ করে মহান আল্লাহর একত্ববাদের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল। মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে মহানবী (সা.) ধর্ম জ্ঞান বর্জিত আরব জাতিকে একটি ধর্মাশ্রিত জাতিতে পরিণত করলেন। মানবজাতিকে ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত করে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথপ্রদর্শক হিসেবে মহান আল্লাহর কুরআনের বাণীকে তিনি সার্থকভাবে প্রতিফলিত করে গিয়েছেন। হজরত মুহাম্মদ (সা.) সমাজ থেকে শ্রেণী ও বংশগত বৈষম্যের চির অবসান ঘটিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করলেন সকল মানুষ সমান, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহর প্রতি অনুগত এবং মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকারী। তার শিক্ষা ও আদর্শের প্রভাবে অল্প দিনের মধ্যে সারা আরব জাহানে অসাম্য দূর হয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলো। তিনি দুনিয়ার বুকে এমন এক ভ্রাতৃত্ববোধ কায়েম করলেন, যেখানে উঁচু-নীচু, ধনী-গরির, কালো-সাদার মধ্যে কোনো পার্থক্য রইল না। তিনি নারী জাতিকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা তার একটি যুগান্ড়রকারী ঘটনা। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারী জাতি ছিল শুধু অবহেলা আর ভোগের সামগ্রী। ইসলাম নারীকে দিয়েছে এক অভূতপূর্ব মর্যাদা।

নারীদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানে হজরত মুহাম্মদ (সা.) দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের নারীর ওপর যেমন অধিকার রয়েছে, নারীরও তোমাদের ওপর সে রকম অধিকার রয়েছে।' (সূরা আল বাকারা : ২২৮)।

আইনের দৃষ্টিতে নারী ও পুর"ষকে সমমর্যাদা দেয়া হয়েছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে ন্যায্য অধিকার প্রদান করছে। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

'নারীগণ তোমাদের ভূষণ আর তোমরা তাদের ভূষণ।' (সূরা আল বাকারা : ১৮৭)।

নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হজরত মুহাম্মদ (সা.) প্রচারিত জীবন দর্শনের এক অপরিহার্য অংশ ছিল। তিনি আরো বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর প্রতি সর্বোত্তম ব্যবহার করে। তিনি আরবে কন্যাসন্ড়ান জীবন্ড় কবর দেয়ার প্রচলিত রীতি চিরতরে বন্ধ করেছেন। তার প্রবর্তিত আইন-কানুন নারীকে পুর"ষের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও অবিচার হতে মুক্ত করে দিয়েছে। হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অপর একটি যুগান্তকারী সংস্কার হলো দাসপ্রথা বিলোপ। তিনি এই দুনিয়া থেকে দাসপ্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা করে তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রদান করেছেন। তিনি ক্রীতদাস যায়েদ (রা.)-কে পুত্র বলে স্বীকার করে নিয়ে যথাযথ মর্যদা প্রদান করেছেন। দাস-দাসীদের মুক্তিদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কর্ম আল্লাহর কাছে কিছুই নেই এ বাণী ঘোষণা করে তিনি তাদের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। প্রাক-ইসলামী যুগে আরববাসীদের নৈতিক মান উন্নত করার জন্যও মহানবী (সা.) মদ্যপান, জুয়া খেলা, পরদ্রব্য অপহরণ, রাহাজানি নারী ধর্ষণ, নারীর বহু স্বামী গ্রহণ, পুর"ষের সংখ্যাতীত স্ত্রী গ্রহণ ইত্যাদি কার্যকলাপ কুরআনের অনুশাসন অনুযায়ী সম্পূর্ণ অবৈধ এবং হারাম ঘোষণা করেছেন। এভাবে তিনি সমগ্র আরব জাহানের সমাজব্যবস্থায় এনেছিলেন এক সুদূরপ্রসারী মহাবিপ্লব। হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী। সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য তিনি সুদ ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য জাকাতব্যবস্থা প্রর্বতন করেন। একটি সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মহানবী (সা.) আল গণিমাত, জাকাত, খারাজ, জিজিয়া এরকম বিভিন্ন প্রকার উৎস হতে রাষ্ট্রের রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। মহানবী (সা.) ইসলামের বিধান অনুযায়ী সদকা ও ফিতরা প্রদানের জন্য বিত্তশালী ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার প্রবর্তিত ব্যবস্থাবলি ও ধন বণ্টনের সুষমনীতি পুঁজিবাদের মূলে আঘাত এনেছিল। তাঁর এ সকল ব্যবস্থা জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি মজবুত করেছিল। অপরদিকে ব্যবসাকে হালাল করে ব্যবসাতে রিজিকের ৯০% ঘোষণা করেছেন। আজকের সমাজে পশ্চিমারা ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে বিভিন্নভাবে কটূক্তি করলেও একথা সত্য যে রাসূল (সা.) যে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা কায়েম করেছেন তার বিকল্প পূর্ণাঙ্গ অর্থব্যবস্থা কোনো মানবসমাজ দেখাতে পারেনি।

মানবতার চরম অবমাননা এবং অজ্ঞানতার দ্বন্দ্ব, হানাহানি ও কলুষ কালিমায় আচ্ছন্ন আরববাসীকেই শুধু তিনি সত্যের মহান দীক্ষায় অনুপ্রাণিত করেননি, দেশ ও কালের ঊর্ধ্বে সমগ্র মানবজাতির জন্য তিনি রাসূল (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি আদর্শ ও মানবিক জীবনবিধান। দুঃখের বিষয় এই যে, আজকের মুসলিম মানস থেকে তার পবিত্র জীবনচরিতের এই মৌল শিক্ষা প্রায় লোপ পেতে বসেছে। আজকের মুসলমানরা রাসূল (সা.)-এর জীবনাদর্শকে দেখেছে খ"িত রূপে, নেহাত একজন সাধারণ ধর্মপ্রচারকের জীবন হিসেবে। এর ফলে তাঁর জীবনচরিতের সমগ্র রূপটি তাদের চোখে ধরা পড়ছে না, তাঁর জীবনাদর্শের বৈপ্লবিক তাৎপর্যও তারা উপলব্ধি করতে পারছে না। বস্তুত আজকের মুসলিম মানসের এই ব্যর্থতা ও দীনতার ফলেই আমরা তাঁর পবিত্র জীবনচরিত থেকে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটানোর তাগিদ অনুভব করছি না। তাই আমরা মনে করি, রাসূলের (সা.) লক্ষ্য এবং আদর্শ কর্মনীতির যথাযোগ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বিভেদহীন সমৃদ্ধ সমাজ গঠন সম্ভব।

লেখক : কথাসাহিত্যিক।

পবিত্র আল কুরআন ও মানব মন

-মনসুর আহমদ

আল কুরআন এক পবিত্র হেদায়েতের কিতাব; বিশ্বমানবতার মুক্তি সনদ। হেরা গুহাকে আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত করে নূরের বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে গোটা ধরণীকে উজ্জ্বল করে ছিল হেদায়েতের যে উজ্জ্বল রবি তা এই আল কুরআন। পবিত্র আল কুরআন হাজিরাতুল কুদসের উদয় কেন্দ্র হতে উদয় হয়ে রাসূলের সিনায় অস্ড় গেছে। 'নিশ্চয়ই তিনি এই পবিত্র কালাম আপনার অন্ড়রের ওপর অবতীর্ণ করেছেন।' পুনরায় সেই সূর্য রাসূল (সা.)-এর কলব থেকে বের হয়ে তার আলোকচ্ছটা গোটা ধরণীকে উজ্জ্বল করে দিয়েছে। এ কিতাব এল মানবজাতিকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তুলতে, নিজেদের ব্যক্তিজীবন থেকে শুর" করে রাষ্ট্রীয় তথা আন্ড়র্জাতিক জগৎ পর্যন্ড় যেন এরই ছাঁচে গঠন করে উভয়কালের সাফল্য অর্জন করতে পারে– এ জন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কিতাব অবতীর্ণ করলেন।

কুরআন আল্লাহর বাণী, মানবজাতির প্রতি আল্লাহর সবচেয়ে বড় রহমত। এ কিতাব মানুষের অন্ড়করণে জাগিয়ে তোলে আল্লাহর রহমতের ধারণা, পরকালের শাস্ড়ি ও পুরস্কারের আশা। এর রয়েছে এমন মোহনীয় শক্তি যা শত্রুকে মিত্র করে আর কঠিন হৃদয়কে বিগলিত করে। এর ভাষা, ভাব ও শিক্ষার প্রভাবে মানুষ আধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জন করে, চোখে তার অশ্রু প্রবাহিত হয়। এ ব্যাপারে স্বয়ং কুরআনের ঘোষণা, 'রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শোনে, তখন আপনি তাদের প্রতি লক্ষ করলে দেখবেন, সত্য উপলব্ধি করার কারণে তাদের চোখ অশ্রু বিগলিত। আর তারা বলছে, হে প্রভু! আমরা ঈমান আনলাম। অতএব তুমি আমাদের সাক্ষ্য প্রদানকারীদের অন্ড়র্ভুক্ত করে নাও। আমাদের কী ওজর থাকতে পারে যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না এবং এ আশা করব না যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সৎ লোকদের সাথে প্রবিষ্ট করাবেন; অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ এ উক্তির প্রতিদান স্বরূপ এমন উদ্যান দেবেন যার তলদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা চিরকাল তন্মধ্যে অবস্থান করবে। এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান। (সূরা মায়েদা)।

আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বাণী বাহক ফেরেশতা রাসূলের কাছে দীর্ঘ তেইশটি বছরে নিয়ে এলেন এ কুরআন। মানুষের অন্ড়রদেশে প্রতিষ্ঠিত হলো কুরআন, হৃদয় আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল, চোখে সত্য প্রতিভাত হলো, আর কতই না চক্ষু অশ্রু প্রবাহিত হলো। পাষাণ হৃদয়কে বরফের মতো গলিয়ে দিয়েছিল মহাগ্রন্থ আল কুরআন, আজও দিচ্ছে।

মানব মনে কুরআনের প্রভাব

মানব মনে কুরআনের প্রভাব কত তীব্র হতে পারে তা অনুমান করা চলে সূরা নাজমের অবতীর্ণের ঘটনা থেকে। ইতিহাস থেকে যানা যায়, নবুয়্যত লাভের পর পাঁচ বছর পর্যন্ড় রাসূল (সা.) শুধু প্রকাশ্য বৈঠক মজলিসে ও বিশেষ অনুষ্ঠানে আল্লাহর কালাম শুনিয়ে লোকদের আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। কোনো সাধারণ সমাবেশে কুরআন পড়ে শোনানোর সুযোগ ঘটেনি। কাফেররা অনুভব করতে পেরেছিল কুরআন মজীদের আয়াতসমূহের কী বিরাট প্রভাব পড়ে মানুষের মনে। তাই তারা নিজেরা কুরআন না শোনার ও অন্যরা যাতে না শুনতে পারে– এ ব্যাপারে সচেষ্ট ছিল। যেখানে রাসূল (সা.) কুরআন শোনানোর চেষ্টা করতেন সেখানেই তারা হট্টগোল ও গোলমাল শুরু করত।

এরূপ পরিস্থিতিতে রাসূল (সা.) একদিন হারাম শরীফের মধ্যে আকস্মিকভাবে ভাষণ প্রদানের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। সেখানে কুরাইশ বংশের লোকদের এক বিরাট সমাবেশ ঘটেছিল। সভায় কাফের ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিল। এ সময় আল্লাহর তরফ থেকে রাসূলের মুখে সূরা নাজম ভাষণ রূপে বিঘোষিত হয়। এ কালামের প্রভাব এমন তীব্র হয়ে দেখা দিল যে, তিনি যখন সূরাটি শুনাতে শুরু করলেন, তখন এর বিরোধিতায় কাফেরদের চিৎকার কোলাহল করার হুঁশ হলো না। শেষের দিকে যখন রাসূল (সা.) সিজদার আয়াত পাঠ করে সিজদায় গেলেন, তখন উপস্থিত জনতা তাঁর সাথে সাথে সেজদায় চলে গেল। এমনকি মুশরিকদের বড় বড় সর্দারগণও সিজদায় না গিয়ে পারলেন না। সূরাটির বিষয়বস্তু ও উপসংহারে বর্ণিত কথাগুলি এত মর্মস্পর্শী ও প্রভাবশালী ছিল যে, কঠিন কঠোর খোদাদ্রোহীরাও নিজেদের সংবরণ করতে পারেনি। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাসূলের সাথে সাথে সিজদায় পড়ে গেল।

হেদায়েতের উৎস পবিত্র কুরআন কীভাবে বিরুদ্ধবাদীদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্ড়ার করেছে, তার ইতিহাস বিস্ড়ৃত। বিরাট ইতিহাস থেকে সামান্য কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। মানব মনে কুরআনের প্রভাব আলোচনা করতে গেলে আলোচনা করতে হয় উৎবা ইবনে রাবীয়ার কথা। একবার কতিপয় কুাইশ সর্দার কাবাঘরে একত্রে বসে ছিল। মসজিদে হারামের অপরদিকে এক কোণে নবী করীম (সা.) বসেছিলেন। এমন সময় আবু সুফিয়ানের শ্বশুর উৎবা ইবনে রাবীয়া কুরাইশ সর্দারদের বলল, 'হে ভাইয়েরা! আপনারা ভালো মনে করলে আমি গিয়ে মুহম্মদের সাথে কথা বলে দেখতে পারি, আর তাঁর সামনে কতিপয় প্রস্ড়াব পেশ করতে পারি। সে হয়তো কোনো একটা প্রস্ড়াব মেনে নেবে। আর আমরাও তা কবুল করে নেব। এভাবে সে হয়তো আমাদের বিরোধিতা থেকে বিরত হতে পারে।' উপস্থিত সকলে এ কথা পছন্দ করল, অতঃপর উৎবা উঠে গিয়ে রাসূল (সা.)-এর নিকট আসন গ্রহণ করল। তিনি (রাসূল) তার দিকে ফিরে বসলেন, আর তখন সে বলল, 'তোমার সামনে কয়েকটি প্রস্ড়াব পেশ করছি, তা চিন্ড়া ও বিবেচনা করে দেখ। হয়তো তার যে কোনো একটা প্রস্ড়াব তুমি মেনে নিতে পারবে।'

নবী করীম (সা.) জবাবে বললেন, 'হে ওলিদের পিতা ! আপনি বলুন, আমি শুনছি। তখন সে বলল, ভাইপো, তুমি এই যে কাজ শুরু করছ এর দ্বারা যদি তোমার ধন-মাল লাভ করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সকলে একত্রিত হয়ে তোমাকে এত ধন-সম্পদ দান করব; যার ফলে তুমি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মালদার ও ধনী হতে পারবে। আর এর দ্বারা যদি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চাও, তাহলে বল, আমরা তোমাকে আমাদের সর্দার ও নেতা বানিয়ে দেব। তোমার কথা ছাড়া কোনো বিষয়েই ফয়সালা হতে পারবে না। আর যদি বাদশাহ হতে চাও, তোমাকে বাদশাহ বানিয়ে দেব। আর তোমার ওপর যদি জ্বীনের প্রভাব পড়ে থাকে যাকে তুমি নিজে তাড়াতে পারছ না, তাহলে আমরা সুদক্ষ চিকিৎসক ডেকে আনব বা নিজেদের খরচেই তোমার চিকিৎসা করাব।'

উৎবা এসব কথা বলছিল আর রাসূল (সা.) চুপচাপ বসে শুনছিলেন। পরে তিনি বললেন, 'হে আবুল ওলিদ! আপনার যা কিছু বলার ছিল তা বলেছেন? সে বলল, হ্যাঁ, বলেছি।' তখন রাসূল বললেন, 'আচ্ছা আমার কথা শুনুন।'

এ সময় রাসূল বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়ে 'হামীম আস সিজদা' তিলাওয়াত শুর" করলেন। আর ওৎবা নিজের দু'খানি হাত পেছনে ঠেক লাগিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল। এ সূরায় সিজদার ৩৮ আয়াত পর্যন্ড় পৌঁছে নবী করীম (সা.) সেজদা করলেন। পরে মাথা উঠিয়ে বললেন, 'হে আবুল ওলিদ! আমার জবাব আপনি শুনতে পেলেন। এখন আপনি জানেন, আর আপনার কাজ।'

উৎবা উঠে কুরাইশ সর্দারদের মজলিসের দিকে চলে গেল। দূর থেকে লোকেরা দেখে বলে উঠল, খোদার কসম, উৎবার চেহারা বদলে গেছে। যে চেহারা নিয়ে সে গিয়েছিল, সেই চেহারা নিয়ে সে ফিরে আসছে না। সে যখন এসে বসল, তখন সকলেই বলল, 'কী শুনে এলে?' সে বলল, 'খোদার কসম, আমি এমন কালাম শুনেছি, যা ইতঃপূর্বে আর কখনও শুনতে পাইনি। খোদার কসম, এ কবিতা নয়, জাদুর কথা নয়, গণকদারী নয়। হে কুরাইশ সর্দাররা! আমার কথা শোন। এ ব্যক্তিকে তার অবস্থায়ই থাকতে দাও। আমি মনে করি, এ কালাম কিছুটা বাস্ড়বায়িত হবে। মনে কর আরবরা যদি তার মোকাবিলায় জয়ী হতে পারে, তাহলে তোমরা নিজেরা নিজের ভাইয়ের ওপর আক্রমণ করা থেকে রক্ষা পেলে, অন্য লোকেরা তার সাথে বোঝাপড়া করবে। কিন্তু সে যদি আরবদের ওপর জয়ী হয়, তাহলে তার বাদশাহী তোমাদের বাদশাহী হবে, তার ইজ্জত ও সম্মান তোমাদের ইজ্জত ও সম্মানের কারণ হবে।' কুরাইশ সর্দাররা তার কথা শুনে বলে উঠল, 'ওলিদের পিতা! এই ব্যক্তির জাদু তোমার ওপর প্রভাব ফেলছে।' উৎবা বলল, 'আমার মত আমি তোমাদেরকে বললাম। এখন তোমাদের মনে যা লয়, তা করতে থাক।'

কুরআন শুনে তার অলৌকিক প্রভাবে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইয়েমেনি কবি তোফায়েল ইবনে দোসী, বনিসালিম গোত্রের বিজ্ঞ ব্যক্তি কায়েস ইবনে নাসিরা, আজদ গোত্রের সর্দার জোমাদ ইবনে সায়লাবা প্রমুখ হুজুরের মুখ নিসৃত কুরআন শুনে তার প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হজরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের ইতিহাস মুসলমানদের অনেকেরই জানা। প্রিয় বোন ফাতেমার কণ্ঠে সূরা 'ত্বহা' শুনে তাঁর অন্ড়রে যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল তা-ই তাঁকে বিশ্বের ইতিহাসে খ্যাতিমান ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো।

আবিসিনিয়ার ইসায়ী শাসক নাজ্জাশীর হৃদয়ে কুরআনের প্রভাব যে কত গভীরভাবে বিস্ড়ার লাভ করেছিল ইতিহাস তার সাক্ষী। নবুয়্যতের পঞ্চম বর্ষে কুরাইশদের উৎপীড়নে জর্জরিত হয়ে হুজুর (সা.) প্রথমে ১৬ জন এবং এরপর ৮৩ জন নর-নারীর দু'টি দলকে আবিসিনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। সম্রাট নাজ্জাশী মুসলমানদের তাঁর দেশে বসবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন। এদিকে কুাইশগণ তাদের ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে নাজ্জাশীর দরবারে একদল প্রতিনিধি পাঠালো। তারা নাজ্জাশীকে অনুরোধ করেছিলো তাদের কাছে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু নাজ্জাশী মুসলমানদের কথা না শুনে তাদের ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর নাজ্জাশী মুসলমানদের কাছে তাদের দেশ ত্যাগের কারণ জানতে চাইলেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে হজরত জাফর (রা.) দাঁড়িয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতায় দীনের পরিচয় তুলে ধরেন এবং দেশ ত্যাগের কারণ বর্ণনা করেন। হজরত জাফরের (রা.) ওজস্বী ও হৃদয় স্পর্শী বক্তব্য শুনে তিনি অত্যন্ড় প্রীত হলেন এবং বললেন, 'তোমাদের পয়গম্বরের ওপর যে কালাম অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছু কি আমাকে শুনাতে পার? জবাবে হজরত জাফর (রা.) হজরত ঈসা ও হজরত মরিয়ম সম্পর্কীয় 'সূরা মরিয়মের' কয়েকটি আয়াত সুললিত কণ্ঠে পাঠ করে তাঁকে শুনালেন। কুরআন শুনে নাজ্জাশীর চোখ দিয়ে অশ্র"ধারা প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি তাঁর অন্ড়রে অনুভব করতে লাগলেন স্বর্গীয় প্রশান্ড়ি। তিনি বললেন, 'সৃষ্টিকর্তার শপথ, ইঞ্জিল আর এইমাত্র যে কালাম আমাকে শুনান হলো তা একই মূল হতে এসেছে।' অতঃপর তিনি কুরাইশ দূতগণকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ফিরে যাও, আমি তোমাদের হাতে এ নিরপরাধ লোকগুলোকে অর্পণ করতে পারব না।

কুরআনের প্রভাব আলোচনা করতে গেলে মনে পড়ে মুসলমানদের হাবশায় হিজরতের কথা। ইবনে ইসহাকের সূত্রে ইবনে হিশাম ও বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, মুসলমানদের হাবশায় হিজরতের পর সে দেশে ব্যাপকভাবে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে। তখন প্রায় ২০জন খ্রিস্টানের একটি প্রতিনিধি দল আসল ব্যাপার জানার উদ্দেশ্যে মক্কায় উপস্থিত হলেন। তারা মসজিদে হারামে নবী করীম (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা নবী করীম (সা.)-কে কিছু প্রশ্ন করেন, রাসূল (সা.) সেগুলোর স্পষ্ট জবাব দেন। অতঃপর তিনি তাদের ইসলাম কবুল করার জন্য দাওয়াত দেন এবং কুরআন মজীদের আয়াত পাঠ করে শোনান। কুরআনের আয়াত শুনে তাঁদের চোখে অশ্র"ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। ইহা যে খোদার কালাম, এ সত্যি তারা উপলব্ধি করলেন এবং রাসূল (সা.)-এর ওপর ঈমান আনলেন।

এভাবে কুরআন মানব মনে যে প্রভাব বিস্ড়ার করেছিল তার ফলে তারা ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। যামাদ আযদী রাসূলের কণ্ঠে কুরআন পাঠ শুনে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে, ফলে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, 'আল্লাহর শপথ, আমি জ্যোতিষীদের কথা, জাদুকরদের মন্ত্র এবং কবিদের কথা শুনেছি। কিন্তু তোমার কথা যেন আরও

কিছু এটা সমুদ্রকে পর্যন্ড় প্রভাবিত করবে।' কুরআন কীভাবে মুমীনদের হৃদয়ে ঐশী প্রভাব বিস্ড়্র করেছিল সে ইতিহাস দীর্ঘ। হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরত আবুবকর (রা.) যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন, তখন তিনি চোখের পানি আয়ত্তে রাখতে পারতেন না। অনর্গল অশ্র" বয়ে যেত।

আবু রাফে থেকে বর্ণিত, একবার হজরত ওমর (রা.) নামাজে 'সূরা ইউসুফ' পড়ছিলেন। যখন এ আয়াত 'সে (ইয়াকুব) বললো, আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ আল্লাহর কাছে নিবেদন করছি' পর্যন্ড় পৌঁছলেন, তখন আমি হঠাৎ দূর থেকে কান্নাভেজা কণ্ঠ ও হাঁচির আওয়াজ শুনতে পেলাম। হজরত হাসান বসরী বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর রাতের বেলায় বিশেষ কিছু আয়াত তেলাওয়াত করতেন। এ সময় তিনি কাঁদতে কাঁদতে ঢলে পড়তেন। তাঁকে সেবা করার জন্য লোকজন দূরে থাকত। মুহম্মদ ইবনে সিরীণ বর্ণনা করেন, হজরত ওসমান (রা.) সারারাত এক রাকাত নামাজ পড়তেই অতিবাহিত করে দিতেন। এক রাকাতেই তিনি পুরো কুরআন পড়ে নিতেন। কুরআন মানব মনকে কীভাবে বিগলিত করতে পারে, তা বিভিন্ন মনীষীর জীবন থেকে জানা যায়। যোবায়ের ইবনে আওফ 'সূরা মুদ্দাসসিরের' একটি আয়াত তেলাওয়াত করতে করতে ইন্ড়িকাল করেন। হজরত তামিম দারী, মসর"ক (রহ.) প্রমুখ কুরআন পড়তে পড়তে সারা রাত কাটিয়ে দিতেন।

আমাদের দেশের মনীষীদের অন্ড়্রেও কুরআনে প্রভুত প্রভাব বিস্ড়্র করেছিল। খাজা নিযাম উদ্দীন আওলিয়া, শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনীরী, হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী প্রমুখ বুজুর্গগণ কুরআন তেলাওয়াতে বিচলিত হয়ে যেতেন। তাঁদের চেহারায় পবির্তন আসত, শরীরে কম্পন শুর" হত। কুরআন তেলাওয়াতে আবদুর রহীম রায়পুরী সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি তাহাজ্জুদে দীর্ঘ কিরাত পড়তেন; কখনও তিনি কাঁদতেন। আজাবের আয়াত এলে কেঁদে ইস্ড়্গফার পড়তেন, রহমতের উল্লেখ এলে খুশিতে উৎফুল্ল হতেন। এছাড়া মওলানা ফজল রহমানগঞ্জ মুরাদাবাদী, মওলানা তাজাম্মুল হোসেন, হজরত মওলানা আবদুল কাদের (রহ.) প্রমুখ কুরআন তেলাওয়াত করে রাত কাটাতেন। কেউবা তরজমা করতে করতে বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে যেতেন।

অমুসলমানদের মনে কুআনের প্রভাব

কুরআনের প্রভাবে কতশত অমুসলমান মুসলমান হয়ে গেল। কিন্তু এমনও অনেক রয়েছে যারা কুরআনের সত্যতা স্বীকার করেছেন, কুরআনের ঐশী গুণে বিমোহিত হয়েছেন। কুরআনকে গ্রহণ না করেও এর প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন এসব মনীষী কুরআনের অদৃশ্যশক্তির প্রভাবে। তারা কী ভেবেছেন, তা আমাদের জানা প্রয়োজন। এমন ধরনের কয়েকজন পাশ্চাত্য মনীষীর কুরআন সম্পর্কিত বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে।

অধ্যাপক ড্রেপার বলেন, কুরআন শরীফ সুন্দর নৈতিক অনুশাসন ও উপমায় ভরপুর। এ গ্রন্থের রচনা বিন্যাস অনেকটা খন্ডিত, অবিন্যস্ড়; কিন্তু এর প্রতিটি পৃষ্ঠাতে এমন বহু শিক্ষণীয় বাণীর সন্ধান মেলে যা অস্বীকার করার ক্ষমতা কারো নাই। এই সমস্ড় খন্ডিত ও বিন্যস্ড় প্রত্যেকটি বাক্যই লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বিধিবিধানের দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ।

... কোটি কোটি মানুষের অনুসৃত এই গ্রন্থকে প্রত্যাদেশ বা আল্লাহর অহি হিসাবেই শ্রদ্ধা করি। আমি সবিনয় অথচ স্বাধীনভাবেই এই অভিমত প্রকাশ করছি। এর শিক্ষা আফ্রিকার কোটি কোটি মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের দিশারী হিসাবে গ্রহণ করেছে। এই গ্রন্থটির নিকট যে সত্যি কত বেশি ঋণী সে কথা চিন্ড়্র করে অভিভূত না হয়ে পারি না। পক্ষান্ড়্রে জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক বর্তিকা হিসাবে এই পবিত্র গ্রন্থটির নিকট ইউরোপ ও অমেরিকাবাসীদের ঋণও অপরিসীম।

ড. জনসন : এই গ্রন্থটি (কুরআন) কবিতা কিনা, বলা কঠিন। যদি কবিতা না হয়, তা হলেও স্বীকার করতে হবে যে, এটি কবিতা থেকে অনক বেশি উন্নত।... এই গ্রন্থের বাণীসমূহের অর্থ এত সর্বজনীন যে, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক সকল যুগ; জামানাকে এর সুরে সুর মিলাতে হয়। এই গ্রন্থের সুরের ধ্বনি গিরি কান্ড়্র, মর"প্রান্ড়্র, গ্রাম, বন্দর শহর এক কথায় বিশ্বরাজ্যের সব যায়গায় প্রতিধ্বনিত হয়ে থাকে। বিশ্ব বিজয়ের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ সর্বপ্রথম স্বীয় অনুসারীদের হৃদয় মন আলোকিত করেছে। পরে গ্রীস ও এশিয়ার সমস্ড় জ্ঞানের সৃজনশীল আলোক বর্তিকা একত্রে সংগ্রহের মাধ্যমে অনুসারীদের পুনর্গঠিত করেছে এবং সব শেষে খ্রিস্টান ইউরোপের তিমির অন্ধকার বিদীর্ণ করে ফেলছে। বলা অনাবশ্যক যে, সে সময় খ্রিষ্টধর্ম 'অন্ধকারের সম্রাজ্ঞী' হিসাবে বিরাজ করছিল।

নলড়েক : গ্রন্থটি (কুরআন) তার বাণীর মাধ্যমে শ্রোতাদের হৃদয় মনে দৃঢ়তার সাথে ততবেশি প্রত্যয় উৎপাদনে সক্ষম হয়েছিল, যার ফলে সমস্ড় বিচ্ছিন্ন, বহির্মুখ ও পরস্পরবিরোধী সত্তা একটি অখন্ড ও সুসংগঠিত সংঘে রূপান্ড়্রিত হয়ে পড়েছিল। এই গ্রন্থের কারণেই সেদিন এমন সমস্ড় ভাবধারা জীবন্ড় হয়ে উঠেছিল, আজো পর্যন্ড় সেই ভাবধারাই আরবদের শাসন করে চলছে। কুরআনের ভাবধারা যেসব দোষ ত্র"টির উর্ধ্বে তার একটি সাধারণ প্রমাণ, এই ভাবধারা অনেকগুলো অসভ্য ও বর্বর গোত্রকে একটি মাত্র সুসভ্য জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন ধারার মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করে দিয়েছে।

ডিন স্টেনলি : নিঃসন্দেহে কুরআনের বিধি ব্যবস্থা খ্রিষ্টধর্মের ওপরে বাইবেলের বিধি ব্যবস্থা থেকে অনেক বেশি প্রভাবশালী। ইনসাইক্লোপিডিয়ার অষ্টম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, কুরআনের ভাষা উৎকৃষ্টতম আরব। এই গ্রন্থ স্টাইলের উৎকর্ষ ও কাব্যিক সৌন্দর্যে ভরপুর। কুরআন আজ পর্যন্ড় এক কথায় তুলনাবিহীন। এই গ্রন্থের নৈতিক অনুশাসন সমূহ এত খাঁটি যে, যে কেউ এগুলো সঠিকভাবে পালন করে পুণ্যময় জীবনযাপন করতে পারেন।

সিএ সরমা : (কুরআন) একটি সম্পূর্ণ জীবন বিধান; সমগ্র দুনিয়ার উৎকৃষ্টতম সাহিত্য কীর্তি সমূহের মধ্যে আল কুরআন শ্রেষ্ঠতম। এ পুস্ড়কটি নৈতিক, সামরিক, বেসামরিক এবং সামাজিক আইন কানুনের একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান। সুন্দরতম ভাষার কারুকার্য এবং ঐতিহাসিক বর্ণনার প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ এই কুরআন প্রতিটি মুসলমানের প্রাত্যহিক জীবনের পথ নির্দেশকারী। মানবীয় সংযোজন কিংবা সংশোধন থেকে এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ মুক্ত। এক্ষেত্রে এ গ্রন্থের সাথে অন্য সমস্ড় ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ সমূহের কোনই তুলনা হয় না। মুহম্মদ (সা.) দাবি করেছেন যে, কুরআন তার জীবন্ড় মোজেজা। সত্যি বলতে কি কুরআন একটি অলৌকিক গ্রন্থ।

কার্লাইল : যে কেউ মনোযোগ সহকারে যদি একবার কুরআন পাঠ সমাপ্ত করেন, তাহলে তিনি দেখতে পাবেন যে, এই বাণীসমূহের অর্থ আপনা আপনি থেকেই পাঠকের নিকট প্রতিভাত হতে শুরু করেছে। কুরআনের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে কোনো মানুষকে স্বীকার করতে হবে যে, এটি একান্ড়ভাবে মৌলিক, আশ্চর্যজনকভাবে নিখুঁত এবং নিঃসন্দেহে একটি মহৎ গ্রন্থ। আমার নিকট থেকে সার্বিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সততা। আর যাই হোক, সততাই যদি কোনো গ্রন্থের প্রথম ও শেষ গুণ হয়, তবে তা অন্যসব প্রাণকেও সুষমামন্ডিত করে।

দাভেন পোর্ট : এই যে কুরআন, যা এসব দোষ ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; পাঠ করার কালে যার মধ্য থেকে ভালমন্দ অধ্যায়ের বাছাইয়ের প্রশ্ন ওঠে না; গ দেশে কোনরূপ লাজ রক্ত আভা না একেই তা আগা গোড়া অনায়াসে পাঠ করা যায়।

বস ওয়ার্থ স্মিথ : নিরক্ষর হয়েও তিনি (মুহম্মদ) এমন একটি গ্রন্থ বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়ে গেছেন যা একাধারে উন্নত কবিতা, আইন শাস্ত্র, প্রার্থনা সঙ্গীত ও একটি পূর্ণাঙ্গ বাইবেল (জীবন বিধান)। বিশ্বের এক চতুর্থাংশ মানব গোষ্ঠী এই গ্রন্থটিকে পবিত্রতার ও রীতি স্টাইলের জ্ঞান বিজ্ঞানের এবং নীতি সত্যের মোজেজা হিসাবে শ্রদ্ধা করেন।

এভাবে বহু মণীষী কুআন নিয়ে বহু কথা স্বীকার করেছেন যা তাদের অন্ড়রে কুআনের প্রভাবেরই ফল।

সাহাবাদের মনে কুরআনের আহ্বান

কুরআনের আহ্বান মুমিন হৃদয়কে কেমন উদ্বেলিত করে তার রয়েছে অসংখ্য উদাহরণ। উদাহরণ থেকে দু'একটি মোতির ঔজ্জ্বল্য বোদ্ধাদের নজরে আনাই এ ব্যপারে যথেষ্ট হবে। যেমন এরশাদ হলো, 'এমন কে আছে যে আল্লাহকে ঋণ দেবে, উত্তম ঋণ? যেন তা আল্লাহ কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দিতে পারেন এবং তার রয়েছে উত্তম সওয়াব।' (আল হাদীদ-১১)। রাসূল (সা.)-এর পাক জবানে এ আয়াত শুনে হজরত আবু দারদাহ আনসারীর হৃদয়ে খোদা প্রীতির জোশ বয়ে গেল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে নিবেদন করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা কি আমাদের কাছে ঋণ চান? রাসূলুল্লাহ (সা.) জবাবে বললেন হ্যাঁ, তিনি ঋণ চান। তিনি বললেন, আপনি আপনার হাত খানা আমাকে একটু দেখান তো। রাসূল (সা.) তাঁর হাত খানা সাহাবীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তিনি রাসূলের হাত খানা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বললেন, 'অমি আমার বাগান খানা আমার আল্লাহকে ঋণ দিলাম।'

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, সে বাগানে ছয়শত খেজুর গাছ ছিল। বাগানের মধ্যেই দারদাহ'র ঘর ছিল। তিনি পরিবার পরিজন নিয়ে সেখানেই বাস করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে এরূপ কথাবার্তা বলার পর তিনি সোজা নিজের ঘরে উপস্থিত হলেন এবং স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'দারদাহের মা! ঘর হতে বের হয়ে এস। আমি এ বাগানটি আমার খোদাকে ঋণ দিয়েছি।' তাঁর স্ত্রী বললেন, 'দারদাহের বাপ, তুমি এ করে খুবই মুনাফার কাজ করেছ।' অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাল সামান নিয়ে বাগান থেকে বের হয়ে গেলেন। কুরআনের আহ্বানে নিঃশর্ত সাড়া দিয়েছিলেন রাসূলের সঙ্গী সাথীগণ। তাই তো ইসলাম শত বাধার সামনে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কুরআন জিহাদী প্রেরণার এক অফুরন্ড় উৎস

কুরআনের আহ্বান এসেছিল দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কুরআনের এই আহ্বানে মুসলমানদের হৃদয়ে এমন সাড়া জেগেছিল যে, বয়স্করা তো বটেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকগণও জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে পাগলপরা হয়ে উঠেছিল। হজরত আবু সাইদ আল খুদরী ওহুদ যুদ্ধে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র তের বছর। যুদ্ধের পূর্বে তিনি তাঁর পিতার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গেলেন। রাসূল (সা.) তার পা থেকে মাথা পর্যন্ড় নিরীক্ষণ করেন এবং এখনও যুদ্ধের বয়স হয়নি বলে ফিরিয়ে দেন। পিতা মালিক তখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাত ধরে বললেন, ছেলের বয়স কম হলে কি হবে, তার হাত দু'টি পুরুষের মতো সবল। তবুও রাসূল (সা.) তাঁকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিলেন না।

বদর যুদ্ধে যোগদানের জন্য হজরত উমায়ের বিন ওয়াক্কাস (রা.) আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। তখন তিনি ছিলেন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক। তাই রাসূল (সা.) তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে নিষেধ করলে তিনি কাঁদতে থাকেন। এর পর হুজুর (সা.) তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি জিহাদে অংশ নেন। কুরআন কীভাবে মানব অন্ড়রে স্থান করে নিয়েছিল তা অনুমান করা সহজ কিশোরদের জিহাদে অংশগ্রহণের প্রতিযোগিতা দেখে। ওহুদ রুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূল (সা.) তাঁর বাহিনী থেকে কিশোরদের ফেরত পাঠালেন। কিন্তু কিশোরদের মাঝে জিহাদের এরূপ প্রেরণা ছিল যে, যখন রাফে বিন খাদিজ (রা.) কে বলা হলো, তুমি কিশোর, তাই তুমি ফিরে যাও। তখন তিনি পায়ের গোড়ালির ওপর দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে তাকে লম্বা মনে হয়। সুতরাং তাকেও জিহদে নেয়া হল। সামুরা বিন জুনদুব (রা.) রাফে বিন খাদিজের মতো সমবয়স্ক ছিলেন। যখন তিনি উপরোক্ত ঘটনা দেখেন, তখন তিনি আরজ করেন, 'আমি তো রাফেকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারি। যদি তাঁকে যুদ্ধে নেয়া হয় তা হলে অমাকে আগেই নেয়া উচিত। তার কথায় উভয়কে দ্বন্দ যুদ্ধে লাগিয়ে দেয়া হলো। সামুরা (রা.) রাফে (রা.)কে পরাজিত করলেন, অবশেষে তাঁকেও যুদ্ধে নেয়া হলো।

কুরআনের ঐশী প্রভাবে, রাসূল (সা.)-এর পুণ্য সোহবতে সাহাবাগণ দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করে আখেরাতকে অধিক মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তো তাঁরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে আনন্দ পেতেন। ওহুদ যুদ্ধে একজন সাহাবী আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি নিহত হয়ে যাই, তবে আমার গন্ড়ব্য কোথায় হবে?' হুজুর (সা.) জবাব দিলেন, 'বেহেশতে।' সাহাবীর হাতে কিছু খেজুর ছিল, যা তিনি তখন খাচ্ছিলেন। রাসূলের কথা শুনে তিনি এগুলি ফেলে দিয়ে সোজা যুদ্ধের মাঠে চলে গেলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা ইসলামের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে।

'সারা দুনিয়ার মধ্যে এই একমাত্র গ্রন্থই এমন যাহা মানব জাতির চিন্ড়া ধারা, নৈতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবনযাপন পদ্ধতির ওপর এত ব্যাপক, এত গভীর ও এত সর্বাত্মক প্রভাব বিস্ড়ার করেছে। যার তুলনা হিসাবে অন্য কোনো গ্রন্থই পেশ করা যেতে পারে না। প্রথম পর্যায়ে এই গ্রন্থের প্রভাব একটা জাতির জীবনে আমূল পরিবর্তন সূচিত করেছে। পরে সেই জাতিটি বিশ্বের একটা বিরাট অংশকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। এতটা বিপ্লবাত্মক ভূমিকা পালন করতে পেরেছে এমন আর কোনো গ্রন্থ কোথাও নজির নাই।' (মাও. মওদুদী (রহ.)- সুরা আত তুরের ব্যাখ্যা।

চরিত্র গঠনে আল কুরআন

কুরআন কীভাবে মুমিনের চরিত্রকে মিথ্যা ও প্রতারণা মুক্ত করেছে ইতিহাসে তার ভুরিভুরি নজির বিদ্যমান। কথিত আছে, ইউনুস ইবনে ওবায়েদ নামে জনৈক ব্যক্তি বিভিন্ন মূল্যের পোশাক বিক্রি করত। এগুলোর মধ্যে অনেক পোশাকের দাম ছিল চারশ দিরহাম, আবার কিছু কিছু পোশাকের দাম ছিল দুইশ' দিরহাম। একদিন ইউনুস তার ভাইপোর কাছে দোকানের ভার ন্যস্ড় করে নামাজ পড়তে যান। এমন সময় জনৈক বেদুইন দোকানে চারশ' দিরহামের একটা জামা চায়। কিন্তু চারশ' দিরহামের পরিবর্তে দুইশ' দিরহামের একটা জামা নিয়ে সে চলে যায়। জামাটা বেদুইনের খুবই পছন্দ হয়েছিল। তাই সে চারশ' দিরহাম দিয়েই জামাটা কিনে নিয়ে যায়। পথিমধ্যে ইউনুসের সাথে লোকটির দেখা হয়। ইউনুস জামাটা চিনে ফেলে। বেদুইন কত দিয়ে জামাটা কিনেছে তা সে জানতে চায়। বেদুইন জানায় যে, চারশ দিরহাম দিয়ে জামাটা কিনেছে। "কিন্তু এর দামতো দুইশ' দিরহামের বেশি নয়।" ইউনুস বলল, তুমি আমার সাথে এস। আমি এটি বদলিয়ে দিচ্ছি। বেদুইন উত্তরে জানাল, "আমার দেশে পাঁচশ' দিরহামের বেশি দামে এটা বিক্রি হয়। আমি এতেই সন্তুষ্ট। ইউনুস বলল, ও কথা বল না। ধর্মের উপদেশ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী লাভের চেয়ে অনেক মূল্যবান।" দোকানে ফিরে গিয়ে ইউনুস বেদুইনকে দুইশ' দিরহাম ফিরিয়ে দেয় এবং তার ভাইপোকে এই বলে বকাবকি করে, তোমার কি লজ্জা নাই? তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না? তুমি সোনা গ্রহণ করে মুসলমানদের সদুপদেশ ত্যাগ করেছ? ভাইপো উত্তরে বলে, 'আল্লাহ সাক্ষী, খুশি হয়েই বেদুইন ঐ জামাটা নিয়েছিল' ইউনুস তখন বলল, 'কিন্তু তুমি যে ভাবে খুশি হয়েছ সেভাবে কি তুমি তাকে খুশি করেছ?'

মুহম্মদ ইবনে মুনকাদির সম্পর্কে বলা হয়েছে, তার অনুপস্থিতিতে তার ভৃত্য জনৈক বেদুইনের কাছে পাঁচ দিরহাম মূল্যের একটা জিনিস দশ দিরহামে বিক্রি করে। মুনকাদির সারাদিন লোকটিকে খোঁজাখুঁজি করে এবং শেষে তাকে পেয়ে বলে, 'ছেলেটা ভুল করে পাঁচ দিরহাম মূল্যের জিনিসটা তোমার কাছে দশ দিরহামে বিক্রি করেছে।' আশ্চর্য হয়ে বেদুইন বলে, 'কিন্তু এতেই আমি সন্তুষ্ট।' মুনকাদির উত্তরে বলে, 'তুমি খুশি হলেও আমাদের খুশির মাঝ খানেই তোমাকে খুশি করব।' অতঃপর সে তাকে পাঁচ দিরহাম ফিরিয়ে দেয়। কুরআন এমন এক বরকতময় ও মহান গ্রন্থ যে, যখন কুরআনি বিধান ও শিক্ষা কোনো ভূখন্ড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অবচেতন মনেও কুরআন তার প্রভাব বিস্ড়ার করে থাকে। ফলে মানব মনে আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে এবং সাধারণভাবে জনসমষ্টির চরিত্র সুন্দর ও মহৎ হয়ে থাকে। কুরআনী যুগের বহু ঘটনা এ সত্য প্রকাশ করে থাকে। 'ইয়াহইয়া- উল উলুম' গ্রন্থে হজরত ওমর (রা.)-এর একটি ঘটনা এ ব্যাপারে স্মরণ করা যেতে পারে। একদিন খলিফা মদীনা থেকে মক্কায় যাচ্ছিলেন। পথে একদা সকালে একটি পাহাড়ের পাদদেশে তিনি এক পাল ভেড়া দেখতে পান। ভেড়াগুলো চড়াচ্ছিল একটি নিগ্রো বালক। কুরআনের শিক্ষা অন্ড়ত প্রাথমিক পর্যায়ের হলেও আরবের দূর

প্রান্তরে এই নিগ্রো বালকটির কাছে পৌঁছেছে কিনা, আর পৌঁছলেও তার ব্যক্তিগত জীবনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, খলিফা তা পরীক্ষা করতে চাইলেন। খলিফা তার কছে জিজ্ঞাসা করলেন, সে পাল থেকে একটা ভেড়া বিক্রি করবে কিনা? তাৎক্ষণিক জবাব এল একটিও সুনিশ্চিত 'না'। খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু কেন?' নিগ্রো বালকটি বলল, 'কারণ ভেড়া আমার নয়। এগুলো আমার মালিকের এবং আমি তার দাস।' খলিফা বলেন, 'তাতে কী হয়েছে? এই টাকা লও, এই ভেড়াটি আমায় দিয়ে ফেল। বাড়ি গিয়ে তোমার মালিককে বলবে, তার ভেড়াটিকে একটি নেকড়ে ধরে নিয়ে গেছে।' বালকটি খলিফার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। বেচারা জানত না সে কার চোখের দিকে তাকাচ্ছে। সে জোর দিয়ে বলল, 'পাহাড়ের ও ধারে গিয়ে আমি আমার মালিককে ঠকাতে পারি। কিন্তু যে মহান প্রভু আমাদের দু'জনকে দেখছেন ও শুনছেন তাঁকে কি ঠকাতে পারব?' এ বালকটি নিরক্ষর ছিল নিশ্চয়। সে ব্যক্তিগতভাবে কুরআন পড়তে পারত না বটে, কিন্তু কুরআনী শিক্ষার পরিবেশগত প্রভাব তার মনকে কীভাবে স্পর্শ করে ছিলো তা এ ঘটনা থেকে সহজেই অনুমেয়। কুরআনী প্রভাব কীভাবে মানুষকে পাপ, অন্যায় থেকে বিরত রাখে তার উদাহরণ তো কুরআনী যুগ গোটা টাই। হজরত ওমর (রা.)-এর কালে জীর্ণকুটিরে রাতের আঁধারে একটি কচি বালিকার অল্লাহর ভয়ে দুধে পানি মিশান থেকে বিরত থাকার মশহুর কাহিনীর মতো বিভিন্ন ঘটনা কোনো বিচ্ছিন ঘটনা নয়। এগুলো ছিল গোটা সমাজ চিত্রের অনুলিপি মাত্র।

পাপ থেকে মুক্ত থাকার প্রেরণা জোগায় আল কুরআন

কুরআন মানব মনকে পাপ থেকে যেমন বিরত রেখেছে অনুরূপ ভাবে মানবিক দুর্বলতার কারণে কোনো পাপ কাজ কারও দ্বারা ঘটে গেলে তার থেকে তাওবা গ্রহণের গভীর ইচ্ছাও জাগ্রত করেছে। হাদীসে উল্লেখিত বিভিন্ন ঘটনা সাক্ষী কুরআন কীভাবে মানুষের মনে পরিশুদ্ধির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এলেন। এ সময় রাসূল (সা.) মসজিদে ছিলেন। সে তাঁকে সম্বোধন করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জেনা করেছি। এ কথা শুনে তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি সেই দিকে গিয়েও বলল, আমি জেনা করেছি। এবারও তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরায়ে নিলেন। অবশেষে লোকটি যখন নিজের ওপর চারবার সাক্ষ্য দিল, তখন নবী (সা.) তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মধ্যে কি পাগলামী রয়েছে? সে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, না, আমি সুস্থ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, জ্বী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। অতঃপর তিনি লোকদের বললেন, লোকটিকে নিয়ে যাও এবং রজম কর।

আর এক মহিলার কাহিনী উল্লেখ করা যেতে পারে। একবার আব্দ বংশের গামেদী গোত্রের এক মহিলা রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তিনি বললেন, তোমার প্রতি আক্ষেপ, চলে যাও। আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার ও তাওবা কর। তখন মহিলাটি বলল, আপনি মায়েয বিন মালেককে যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন আমাকে কি সেভাবে ফিরিয়ে দিতে চান? দেখুন, আমার এ গর্ভ জিনার। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সত্যই গর্ভবতী? মহিলাটি বলল, জ্বি হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, যাও, তোমার পেটের বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আনসারী এক লোক মহিলাটির সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে গেলেন। সন্তান প্রসব হওয়ার পর ঐ লোকটি রাসূল (সা.)-এর খেদমতে এসে বলল, হুজুর! এ গামেদী মহিলাটির গর্ভ খালাশ হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, সন্তান প্রসবের পর যখন মহিলাটি পুনরায় আসল, তখন রাসূল (সা.) বললেন, আবার চলে যাও এবং শিশুটিকে দুধ পান করাও এবং দুধ ছাড়ান পর্যন্ত অপেক্ষা কর। পরে যখন বাচ্চাটির দুধ খাওয়া বন্ধ হয় তখন মহিলাটি বাচ্চার হাতে এক টুকরা রুটি দিয়ে তাকে নিয়ে রাসূল (সা.)-এর খেদমতে হাজির হলো। এবার মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এই দেখুন (বাচ্চাটি) দুধ ছাড়ানো হয়েছে। এমনকি সে নিজ হাতে খাবার খেতে পারে। তখন হুজুর (সা.) বাচ্চাটিকে একজন মুসলমানের হাতে তুলে দিলেন। পরে মহিলাটির জন্য গর্ত খোড়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তার জন্য বক্ষ পর্যন্ত গর্ত খনন করা হলো। অতঃপর লোকদের নির্দেশ করলেন, তারা মহিলাটিকে রজম করল। রজম অর্থ-গর্তের মধ্যে পাথর মেরে হত্যা করা হয়।

যে কুরআন মানব মনকে আলোকোজ্জ্বল করে তাদের একটি মহৎ ও উন্নত জাতিতে রূপান্তরিত করেছিল তা আজও আমাদের মাঝে বিদ্যমান। কই! আমাদের চোখেতো এমন অশ্রু প্লাবিত হয় না বা আনন্দে হৃদয় নেচে উঠে না কুরআন তেলাওয়াত কালে। যাদের অন্তর ছিল সজাগ তারাই কুরআনের আহ্বান শুনতে পেয়েছিল। আমাদের অন্তঃকরণ অবচেতন, মৃত প্রায়, তাই কুরআন শুনে আমাদের মাঝে কোন ভাবান্তর সৃষ্টি হয় না। আমরা স্ফটিক স্বচ্ছ কুরআনের বারিধারা পান থেকে বিরত থেকে বিভিন্ন দর্শন ও মতবাদের অপরিচ্ছন্ন গরলে তৃষ্ণা মেটাতে চাই। দিগন্ত প্রসারী শুভ্র সমুজ্জ্বল কুরআনরূপী প্রভাকর থেকে আলো গ্রহণ না করে আঁধার রাতের জোনাকি পোকার কাছ থেকে আলো নিয়ে পথ চলতে চাই। আমরা কুরআনের মহিমা শুনতেও চাই না, বুঝতেও চাই না। সে কারণে কুরআন আমাদের হেদায়াত বিলায় না।

ইসলামের শৈশব কালে কুরআনের বিরোধিতা করেছিল কাফের মুশরিকরা। আজ কুরআনের বিরোধিতা করছে মুসলিম নামধারী মুসলমানরা। তাই তো এ যুগেও কুরআনের দাওয়াত দিতে গিয়ে দায়ী ইলাল্লাহদের নির্যাতন সইতে হয়, ফাঁসিতে ঝুলতে হয়। যারা খোবায়েব (রা.) কে শূলে চড়িয়ে ছিল, তাদের উত্তরসূরিরা আজও কুরআনের আহ্বানকারীদের দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দিতে ব্যস্ড়। আজ পাষাণ হৃদয়কে বিগলিত করতে চাই ফাতেম বিনতে খাত্তাবের মতো নির্ভীক নারী, জাফর বিন আবি তালেবের মত সাহসী পুর"ষ। যে সূরা 'ত্বা হা' ফার"কের পাষাণ হৃদয়কে বিগলিত করে দিল, যে 'মারইয়াম' নাজ্জাশীর দরবারকে অশ্র" সিক্ত করে ছিল তা কুরআনে আজও তদ্র"পই আছে, কিন্তু নেই উপযুক্ত তেলাওয়াতকারী। একদল যোগ্য তেলাওয়াতকারীর আবির্ভাব হলে পাষাণ হৃদয় আবার গলবে, শুষ্ক চক্ষু অশ্র"সিক্ত হবে। গোটা পৃথিবীসহ আমাদের দেশ আগ্রহভরে অপেক্ষা করছে 'ওরা কবে আসবে।'

তথ্যপঞ্জী

তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী
মহনবীর শ্বাশত পয়গাম, আবদুর রহমান আয্যাম
কুরআন ও মানব মন, ড. সাইয়েদ আ. লতিফ
কুরআনের আলোকে মানব জীবন, মাওলানা একে এম ইউসুফ
কুরআন বোঝার উপায়, সাইয়েদ হাসান আলী নদভী
মাসিক মদীনা, ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা।

লেখক : কলামিস্ট।

মুহাম্মদ (সা.) ও রিসালাত

-মৌলানা সৈয়দ আখতার হোসেন

বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মাখলুকাতের শান্তির ফয়সালা দিয়ে অর্থাৎ পবিত্র কুরআনসহ এ ধরায় প্রেরণ করেছিলেন একজন মহামানবকে। তিনিই হলেন মুহাম্মদ (সা.)। তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশে মা আমিনার গর্ভ থেকে ধরায় ভূমিষ্ঠ হলেন ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে, অর্থাৎ ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার। তিনি রিসালাত লাভ ৪০ বছর বয়সে। হেরা পর্বতের গুহায় তাঁর ওপর ওহি নাজিল হয়। যে রিসালাত, যে শান্তির বাণী দিয়ে তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল, সেটি হচ্ছে আল কুরআন। আর তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী এবং রাসূল হজরত মুহাম্মদ (সা.)।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, 'হে রাসূল আমি আপনাকে বিশ্বে রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।' (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)। আর উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা নূরসহ প্রেরণ করেছি। আল কুরআন। সূরা নিসার ১৭৪নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'হে মানুষ! আমি (আল্লাহ) তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের জন্য তোমাদের নিকট একটি উজ্জ্বল জ্যোতি নাজিল করেছি। চির শাশ্বত শান্তির বিধান আলোকবর্তিকা বা আল কুরআন দিয়ে, রিসালাত দিয়ে, রহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মদ (সা.) অশান্ত ধরায় বইয়ে দিলেন নূরের আলো ও শান্তির ফল্গুধারা। তিনি যে রিসালাত লাভ করেছিলেন এ বিষয়ে আল কুরআনে আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই আমি তোমাদের সত্য (দীন)সহ পাঠিয়েছি, পাঠিয়েছি আজাবের ভীতি প্রদর্শনকারী ও (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী হিসেবে। (জেনে রেখো) তোমাকে জাহান্নামের অধিবাসীদের (দায়-দায়িত্বের) ব্যাপারে কোনোরকম প্রশ্ন করা হবে না। (সূরা আল বাকারা : ১১৯)। ব্যক্তি জীবনে তিনি শান্তি আনতে পরিচ্ছন্ন ও সাধাসিধে জীবনযাপনের দীক্ষা দিয়েছিলেন মানবজাতিকে। এ বিষয়ে এক হাদীসে বলা হয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের জামাকাপড় এবং জুতা নিজেই সেলাই করতেন এবং নিজেই পরিষ্কার করতেন। ঘরের সাধারণ কাজকর্ম নিজের হাতে করতেন। নিজের ব্যবহৃত পোশাকে উকুন থাকলে তা তিনি নিজ হাতেই পরিষ্কার করতেন। নিজের হাতে বকরির দুধ দোহন করতেন।' (মিশকাত শরীফ, ২য় খ", পৃঃ ৫২০)। হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেছেন, তাঁর (রাসূলের) হুজরা খানার পর্দা ছিল ছেঁড়া। ঘরের ছাদ ছিল খেজুর পাতার আর দেয়াল ছিল কাদা-মাটির। শিশুকাল থেকে তিনি ছিলেন অধিক সত্যবাদী, কোমল প্রাণ ও সর্বাধিক পবিত্র মনের অধিকারী। তাইতো কাফেররাও তাঁকে আল আমিন উপাধি দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। আল্লাহ বলেন, 'হে রাসূল! নিশ্চয় আপনি অনুপম চরিত্রের অধিকারী।'

তিনি যে রিসালাতের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন তাঁর সাক্ষী। এই অশান্ত পৃথিবীকে শান্ত করেছিলেন নূরের আলোকবর্তিকা দিয়ে, তাওহীদের শাশ্বত বাণী দিয়ে। হজরত ওমরের মতো কঠিন হৃদয়ের মানুষ ইসলাম গ্রহণের অপরাধে হত্যা করতে গিয়ে কুরআনের মধুর পঠন শুনে মোমের মতো বিগলিত হয়ে পবিত্র পানি দিয়ে, নিজের দেহকে পবিত্র করে আল কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আর যে তরবারী দিয়ে প্রথম রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-কে

হত্যা করতে চেয়েছিলেন, যে তলোয়ার দিয়ে নিজের বোন ও ভগ্নিপতিকে কতল করার জন্য তাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন; সেই তলোয়ারটি মুহাম্মদ (সা.)-এর পায়ের কাছে ফেলে কলেমা তৈয়্যবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (সা.) পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইসলামের তথা আল কুরআনের সৈনিক হয়েছিলেন। পরবর্তীতে ইসলামী সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় খলিফা ন্যায়বিচারের ইতিহাস সৃষ্টি করেন। যে নবীর (সা.) মায়ায় পড়ে মাঠের পশু ঘাসে মুখ লাগায়নি ৩ দিন যাবত, সেই নবীর খোঁজে একদিন আবু বকর সিদ্দিকের (রা.) সাথে নিখোঁজ রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-কে খুঁজতে তলোয়ার হাতে রাস্তায় বেরিয়ে কাফেরদের বলেছিলেন, কিছুক্ষণের মধ্যে রাসূল (সা.)-এর খবর দিতে না পারলে কাফেরদের গর্দান নেবেন। সেই তিনি নিজের জীবনের সব নেক আমল রাসূল (সা.)-এর উম্মতের জন্য দান করে নিঃস্ব হয়েছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে খরচের জন্য যে নবীর প্রেমে পাগল হয়ে খলিফা হওয়ার আগে কাপড় ব্যবসায়ী আবু বকর (রা.) নিজের সমস্ত সম্পত্তি নবীর (সা.)-এর কাছে এনে হাজির করে নিঃস্ব হয়ে, সহায়-সম্বলহীন হয়ে বলেছিলেন, 'আমার ঘরে আল্লাহ ও রাসূল রেখে এসেছি।' রাসূল (সা.) এমন এক অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন বলেই অতি সহজে বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করতে পেরেছিলেন। রাসূল (সা.) রিসালাতের বাণী থেকে, চরিত্র ও আদর্শ থেকে সামান্য কিছু গ্রহণ করলে এ যুগেও মহান কিছু অর্জন করা অসম্ভব হবে না।

রিসালাতের আনুগত্য

আল্লাহকে কখনো কোনো মানুষ দেখেনি। পৃথিবীতে দেখার সুযোগ নেই। পরকালে সম্ভব হবে মুমিন বা মুত্তাকি হয়ে কবরে যাবার সুযোগ হলে। রাসূলের আনুগত্য বা তাঁর হাদীসের আলোকে জীবন গঠন করলেই তার আনুগত্য করা হবে। মুহাম্মদ (সা.)-কে যে রিসালাত দিয়ে পাঠিয়েছেন, সে ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 'তুমি (রাসূল) যা কিছু কল্যাণ লাভ করো, তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই, আর তোমার কাছে যে অকল্যাণ পৌঁছে তা তোমার (মুহাম্মদ) নিজের পক্ষ থেকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য রিসালাত দিয়ে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি পৃথিবীতে। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।' (সূরা নিসা : ৭৯)।

আনুগত্যের ব্যাপারে কুরআন বলছে, 'যে রাসূলের আনুগত্য করলো, সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যে মুখ ফিরিয়ে নিল, তবে আমি তোমাকে তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে বা রক্ষক হিসেবে প্রেরণ করিনি।' এ বিষয়ে বুখারী শরীফের হাদীসে এসেছে, আবু মুসা (রা.) নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'তিনি (মুহাম্মদ) বলেছেন, বন্দীদের মুক্ত করে আনো (কাফেরদের হাতে যে মুসলিমরা বন্দী) এ দাওয়াতকারীর দাওয়াত গ্রহণ কর।'

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আমার উম্মতের সব লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু যে আনুগত্যকে অস্বীকার করেছে (সে জান্নাতবাসী হতে পারবে না)। জিজ্ঞাসা করা হলো– কে অস্বীকার করেছে, হে রাসূল? উত্তরে রাসূল (সা.) বলেন, যে আমার অনুসরণ করলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করলো না, সে অস্বীকার করলো।' (বুখারী : ৭২৮০)।

মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়্যত

হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়্যত প্রাপ্তি দুনিয়ার ইতিহাসে সমগ্র মানবতার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। যে লোকই রাসূলের (সা.) আগমন সম্পর্কে সংবাদ পাবে, সে তখন যে কোনো ধর্মের বিশ্বাসী হোক না কেন, সে যদি রাসূলের (সা.) নবুয়্যত বিশ্বাস না করে বা রিসালাতকে অস্বীকার করে এবং তিনি যে দীনসহ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন তাঁর প্রতি ঈমান না আনে, আর এ অবস্থায়ই যদি সে মরে যায়, তবে তার জান্নাতবাসী হওয়া সম্ভব নয়; বরং সে নিশ্চিতরূপেই জাহান্নামী হবে। এ বিষয়ে একটি হাদীসে আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, তিনি রাসূল বলেছেন, 'নবী মুহাম্মদ (সা.) এরশাদ করেছেন, সেই মহান আল্লাহর শপথ, যার মুষ্টির মধ্যে মুহাম্মদের প্রাণ, এই উম্মতের মধ্যে যে লোক আমার সম্পর্কে শুনতে ও জানতে পারে সে ইহুদি হোক বা নাসারা; আর আমি যে দীনসহ প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে, সে নিশ্চয়ই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।' মুসনাদে আহমদ।

এ হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত যে, রাসূল (সা.) রিসালাত প্রাপ্তি ও নবী হওয়ার পূর্ববর্তী সকল দীন ও ধর্ম বাতিল হয়ে গেছে। তখন রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর উপস্থাপিত ইসলামই একমাত্র দীন। রাসূলে কারীম (সা.)-কে 'খাতামুন্নাবিয়ীন' বলা হয়েছে। কারণ তাঁর আগমনের দ্বারা নবুয়্যতের ধারা খতম করা হয়েছে। 'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া' গ্রন্থে মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বলা হয়েছে, নবী (সা.) হতে আব্দুল্লাহ ইবনুল আস (রা.) বর্ণনা করেন, নূরে মুহাম্মদ (সা.) এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে রাসূলের নূরকে পয়দা করেন ও তাঁর রিসালাত সম্পর্কে 'লও হে মাহফুজে' লিখে রেখেছেন এবং মুহাম্মদ (সা.) যে 'খাতামুন্নাবিয়ীন' তা মুসলিম শরীফের হাদীসেও বর্ণনা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন, "এমনিভাবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এমন এক জাতির নিকট, যার আগে অনেক জাতি গত হয়েছে– যেন আমি তোমার প্রতি যে অহি প্রেরণ করেছি, তা তাদের কাছে তিলাওয়াত কর। অথচ তারা রহমানকে

(আল্লাহকে) অস্বীকার করে। বলুন, 'তিনি আমার রব, তিনি ছাড়া আর কোনো (সত্য) ইলাহ নেই', তাঁরই ওপর আমি তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।" (সূরা রা'দ : ৩০)।

ইসলামের বা দ্বীনের সুসংবাদদাতা

আল্লাহ আরো বলেন, 'আমি তা (কুরআন) যথাযথভাবে নাজিল করেছি এবং যথার্থভাবে তাহা নাজিল হয়েছে। আমি তো তোমাকে শুধুমাত্র সুসংবাদদাতা ও সতর্কবাণীরূপে পাঠিয়েছি। (সূরা বনি ইসরাঈল : ১০৫)।

আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! কাফেরদের কি হাশরের দিন নিম্নমুখী করে একত্রিত করা হবে? রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যিনি এ দুনিয়ায় তাকে দু'পায়ের ওপর হাঁটাতে পারলেন তিনি কি হাশরে দিনে তাকে নিম্নমুখী করে চালাতে সক্ষম নন? কাতাদা (রা.) বলেছেন, 'হ্যাঁ, আমাদের রবের ইজ্জতের শপথ! (তিনি এটা করতে সক্ষম)। বুখারী : ৪৭৬০)।

তাঁর ওপর নাজিল হওয়া প্রথম আদেশ পবিত্র কুরআনের সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত নজিল হয়, যা ছিল– 'পড় তোমার মালিকের নামে, যিনি সবকিছু পয়দা করেছেন।' মোট ২২ বছর ৫ মাসে কুরআন নাজিল হয়। পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাব ও সাবাতে এ বিষয়ে অর্থাৎ তাঁর রিসালাত প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। আল কুরআনে আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! আমি তোমাকে (হেদায়াতের) সাক্ষী (বানিয়ে) পাঠিয়েছি, বানিয়েছি সুসংবাদদাতা জান্নাতের। সূরা আহযাব : ৪৫। তিনি আরো বলেন, (হে নবী), আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। সূরা সাবা : ২৮।

এভাবে মুহাম্মদ (সা.) ওপর রিসালাতের দায়িত্ব আসে। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) যে রিসালাতের দায়িত্ব পেয়েছেন, তার প্রমাণ আল্লাহ এভাবে ঘোষণা করেছেন, 'তুমি অবশ্যই রাসূলদের একজন।' (সূরা ইয়াসিন : ৩)।

শিক্ষা

আল্লাহর নবী রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি উম্মতকে ভালোবেসেছেন নিজের সন্তানের চেয়ে বেশি। তাই তিনি নির্জন পাহাড়ের পাদদেশে উম্মতি উম্মতি বলে কাঁদতে পেরেছিলেন। তাই আমাদের মানুষকে ভালোবাসতে শিখতে হবে। ভালোবাসতে হবে অন্তর দিয়ে। আল্লাহকে খুশি করার জন্য। তাহলে নবীপ্রেম সার্থক হবে। মুহাম্মদ (সা.) মানুষকে যেমন ভালোবাসতেন, তেমনি গাছপালা, ফলফুলও ভালোবাসতেন। শেষ করবো একটি কবিতা দিয়ে। আমাদের প্রিয়নবীর (সা.) বাণী আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে এ ছন্দে।

'জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনো ক্ষুধার লাগি,
জোটে যদি দু'টি তবে অর্ধেকে
ফুল কিনে নিয়ো হে অনুরাগী।'

ফুলকে মানুষ যেমন ভালোবাসে, তেমনি মানুষকেও ভালোবাসতে হবে রাসূলের সান্নিধ্য পেতে। দুস্থ মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে। লোকদেখানো ভালোবাসা কোনো কাজে আসবে না। মুহাম্মদ (সা.)-এর রিসালাতের শিক্ষা হোক মানুষের প্রতি দরদ দিয়ে ভালোবাসার। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তাওফিক দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র :

১. আল কুরআন একাডেমি লন্ডন : হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ অনূদিত কোরআন শরীফ (বাংলাসহ)।
২. আল কুরআন : মাওলানা আবদুস শহিদ নাসিম অনূদিত।
৩. বুখারী শরীফ : অধ্যাপক ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক সম্পাদিত।
৪. হাদীস শরীফ : মাওলানা আবদুর রহীম (রহ.)।

লেখক : সাংবাদিক।

আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে স্বপ্নে দেখার পর
ড. শিবশক্তির ইসলাম গ্রহণ
-মুহাম্মদ ইসমাঈল

সেদিন রাত্রে কী হয়েছিল জানি না। ১৯৮৪ সালে ভারতের দোবাসের মন্দিরে শিবশক্তি ৬৫ কোটি মানুষের ভগবান হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছিলেন। মুসলমান হওয়ার পূর্বে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দশটি ধর্মগ্রন্থের ওপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন লাভ করেছেন।
শেষ পিএইচডি ডিগ্রি ছিল পবিত্র কুরআন মাজীদের ওপর। কুরআন মাজীদের ওপর এতটাই দখল করেছেন যে, তিনি বুঝতে পেরেছেন পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে সব মানবরচিত। পরিবর্তিত। একমাত্র আল্লাহর কুরআনই সঠিক গ্রন্থ। যার মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। সন্দেহ করলে ঈমান থাকবে না। কাফের হয়ে যাবে।
ড. শিবশক্তি মন্দিরের পূজার শেষে প্রতিদিন বাসায় এসে কী যেন ভাবতেন। ভাবতে ভাবতে একদিন স্ত্রীকে বললেন, শুনছ কাল থেকে মন্দিরে আর যাব না। শ্লোগ পড়ব না। ফলের রস খাওয়া হবে না। মানুষকে ঠকানো হবে না। তুমি যদি রাজি থাকো তাহলে আমরা এভাবে দিন কাটালে কেমন হয়। স্ত্রী শিবশক্তির কথায় রাজি হলেন। আর মন্দিরে যান না। ঐ মন্দিরটি ছিল সাড়ে তিনশত বিঘা জমির ওপরে। জমিনের যত আয় সব ড. শিবশক্তি ভোগ করতেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর সব ছেড়ে দিয়েছেন। একদিন স্ত্রীকে বললেন, গভীর রজনীতে তুমি সজাগ? হ্যাঁ আমি সজাগ। তুমি ঘুমাওনি? না ঘুম তো আসছে না। ঘুম আসছে না কেন? কি যেন স্বপ্ন দেখলাম। কী বল না। শিবশক্তি বললেন, আমি স্বপ্নে আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে দেখেছি এবং আমাকে কলেমা পড়তে বলেছেন। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি মুসলমান হয়েছি। আমি ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করেছি। স্ত্রী বললেন, আমি তো একই স্বপ্ন দেখেছি। আমি মুসলমান হয়েছি এবং নবীজিকে স্বপ্নে দেখেছি। কন্যার রুমে হাজির। একমাত্র কন্যাও বলল, আমিও নবীজিকে স্বপ্নযোগে দেখেছি এবং মুসলমান হয়েছি। শিবশক্তি মুসলমান হওয়ার পর নাম রাখলেন ড. ইসলাম-উল-হক। স্ত্রীর নাম ছিল স্পরা। মুসলমান হওয়ার পর নাম রেখেছেন বিসমিল্লাহ বেগম। তৎকালীন সময়ে ভারতে থাকতে না পেরে বাংলাদেশে আসার অনুমতি চেয়েছিলেন। এরশাদ সরকার অনুমতি দেয়নি। অনুমতি পেয়েছিলেন মালয়েশিয়ায়। মালয়েশিয়া সরকার খুশিতে এই গুণী মানুষটিকে অনুমতি দিয়েছিল। শুধু কী তাই! তাকে নাগরিকত্ব দিয়ে মালয়েশিয়ার সরকার নিজেকে ধন্য করেছ। তাঁকে ইসলামের তথা রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজে মালয়েশিয়া সরকার দায়ীর কাজে নিয়োজিত করেছ। যতদিন এই মনীষী বেঁচেছিলেন, ততদিন মালয়েশিয়ায় ছিলেন।
লেখক : কবি।

বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির চর্চা
-আবু ছফা

বিষয় শিরোনামে ৩টি শব্দ রয়েছে যার বিশ্লেষণ হলো– প্রথম শব্দ ‘বাংলাদেশ’। বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে খুবই ছোট্ট একটি দেশ। শতকরা ৯০ জন মুসলিম অধ্যুষিত একটি দেশ। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ। দেশের তিন দিকে রয়েছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ দেশ ভারত; অন্যদিকে বিশাল সাগর বঙ্গোপসাগর। দ্বিতীয় শব্দ ‘ইসলাম’। ইসলাম একটি আদর্শের নাম। ইসলাম আদর্শের অনুসারীদের জীবনাচরণে ও লেনদেনে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার সুনির্দিষ্ট বিধান। ইসলামী বিধানের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ মুসলমানদের নেই। যদি কোনো মুসলমান ইসলামী বিধানকে মেনে না চলে তাহলে সে গুনাহগার হবে আর যদি অস্বীকার করে, তাহলে সে মুসলমান থাকবে না। তৃতীয় শব্দ ‘রাজনীতি’। রাজনীতি হলো রাষ্ট্র পরিচালনাগত দিকনির্দেশনা বা মূলনীতি। ইসলামী রাজনীতির চর্চা হবে ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী। কোনো মুসলমান ইসলামী রাজনীতিকে অস্বীকার করলে কুফরী হবে এবং ইসলামী রাজনীতির বিপরীত রাজনীতি করলে গুনাহগার হবে। রাজনীতি অনুশীলন হয় দুইভাবে– ১. ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য রাজনীতি, ২. ক্ষমতায় গিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার মাধ্যমে রাজনীতি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামী রাজনীতি করা বা ইসলামী রাজনীতির বাস্তবায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। এটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ এজন্য, এ দেশের ৯৩ ভাগ মানুষ মুসলিম। বিশ্বায়নের (Golobal village) এই যুগে বিশ্বের সকল মানুষের নিকট এটাই ধারণা ছিল যে “No politics in Bangladesh without indication of Islam”, অর্থাৎ এ দেশে ইসলামী রাজনীতি ছাড়া অন্য কোনো রাজনীতি চলে না বা চলবে না। তবে এটি সত্য যে এই ধারণা সত্য না হওয়ার জন্য এ দেশের ইসলামী রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতাই দায়ী। কী অবাক কা–! আজ এ দেশে পাশ্চাত্যে রাজনীতি কর্তৃত্ব (Dominance) করছে। আজ এ দেশে ইসলামী রাজনীতির চর্চা স্রোতের বিপরীতে চলার

মতো একটি বিষয়। এ কারণে ইসলামী রাজনীতিকদের প্রচলিত রাজনীতিকদের তুলনায় দ্বিগুণ যোগ্যতা সম্পন্ন ও কৌশলী হতে হয়। বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে মৌলিক নীতি হলো– আল্লাহ তায়ালা নয় 'জনগণই ক্ষমতার উৎস'। 'আবরাহাম লিংকনের দেয়া গণতন্ত্রের চর্চা চলছে'। যে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা খোদ আমেরিকায় ইলেকটোরাল ভোটিং পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে সংস্কার করা হয়েছে। 'রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিতে ধর্মীয় কোনো নীতি থাকতে পারবে না'। 'অর্থনীতির ভিত্তি হলো সুদব্যবস্থা'। অথচ ইসলামী রাজনীতির নীতিমালা, বৈশিষ্ট্য, কার্যাবলী ইত্যাদিতে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট নির্দেশনা। ইসলামী রাজনীতির বিরোধিতা আজ দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ইসলামী রাজনীতিকে আজ আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সুতরাং দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলামী রাজনীতির নীতিমালা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে রাজনীতি করতে হলে এ বিষয়ে আরও সচেতন হতে হবে এবং কৌশলী হতে হবে। ব্যক্তিগত কৈয়ফিয়তে বলা দরকার আমি আমার লেখার ক্ষেত্রকে আপাতত ৩টি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি। শিক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট। আজকের বিষয় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী রাজনীতি চর্চা।

রাজনীতির সংজ্ঞা : বাংলায় 'রাজনীতি', ইংরেজিতে 'চড়ষরঃরপং' এবং আরবীতে 'সিয়াসাত'। অভিধানে ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাজনীতির অর্থ, সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য অভিন্ন হলেও দেশভেদে এর অনুশীলনে (চৎধপঃরংব)-এ ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে যেমন গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র ব্যবস্থাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। আবার রাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের নামে গুটিকয়েক মানুষের খামখেয়ালিপনার শাসন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ তাদের লেখায় স্থান দিয়েছেন। রাজনীতি যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্ব (ঞযবড়ৎু) অনুযায়ী চলে আবার কখনো কখনো রাজনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাঁচামাল হয়ে দাঁড়ায়। রাজনীতি সত্যিই রাজনীতি। এ প্রসঙ্গে এক দার্শনিক বলেছিলেন 'ঞযব ঢ়ড়ষরঃরপং রং ঃযব ঢ়ড়ষরঃরপংচ। 'রাজনীতিবিদরা যা কিছু বলেন ও করেন তাই রাজনীতি।'

অভিধানে (Dictionary); রাজনীতি (Politics) শব্দের অর্থ অনেক বিস্তৃত ও বিস্তারিত। অক্সফোর্ড অভিধানে (Oxford Dictionary) বলা হয়েছে, ÔPolitics means the science and art of government, the science dealing with the form, organization and administration of a state" রাজনীতি হচ্ছে সরকার সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ও আর্ট, একটি রাষ্ট্রের কাঠামো, রূপ, সংগঠন ও প্রশাসন সংক্রান্ত বিজ্ঞান। অক্সফোর্ড অভিধানে (Oxford Dictionary) Politics এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Politics is the branch of moral philosophy dealing with the state of social organization as a whole", 'রাজনীতি হলো নৈতিক দর্শনের শাখা যা সামাজিক সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রের সার্বিক বিষয় দেখাশুনা করে'। রাজনীতির প্রামাণ্য সংজ্ঞায় গ্রীক দার্শনিক ও রাষ্ট্রচিন্তাবিদ এরিস্টটল বলেন (Politics is a practical art of doing রাজনীতি হচ্ছে কার্যকরী কলাকৌশল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বার্নাড ক্রিকস (Bernard Cricks) বলেন "Politics is politics" 'রাজনীতিবিদরা যা বলেন তাই রাজনীতি'। রবার্ড ডল (Roberd Doal) বলেন, "politics means any persistent pattern of human relationships that involves to Saignificant extent, power rule or authority", 'রাজনীতি হচ্ছে এক ধরনের অনড় মানবিক সম্পর্কের প্রকৃতি, যা উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষমতা, শাসন বা কর্তৃত্বেও সাথে সংযুক্ত থাকে'। হ্যারল্ড লসওয়েলের মতে "Politics as being concerned with who gets what when and how" 'রাষ্ট্র হতে কে কী পাচ্ছে, কখন পাচ্ছে এবং কীভাবে পাচ্ছে তাই হচ্ছে রাজনীতি'। কোনো কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেছেন 'নেতৃত্ব পরিবর্তনের চেষ্টার নাম রাজনীতি'।

ইসলামী রাজনীতি : প্রচলিত রাজনীতির ইসলামীকরণই হচ্ছে ইসলামী রাজনীতি। ইসলামী রাজনীতি বলতে বোঝায়, ঐ রাজনীতি যার লক্ষ্য কুরআন-হাদীসের আদর্শের ভিত্তিতে দেশের শাসনব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদিতে পরিবর্তন আনয়নে যে রাজনৈতিক কর্মকা- পরিচালনা করা হয়, তাই ইসলামী রাজনীতি। ইসলামী রাজনীতিকদের লক্ষ্য ও কর্মকা- যদি হয় কুরআন-হাদীসের বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা, তাহলে তাদের এই রাজনৈতিক কর্মকা-ই ইসলামী রাজনীতি। সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার চালাবার যে নিয়ম ও নীতি মহানবী (সা.) চালু করে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তদানুসরণে খোলাফায়ে রাশেদীন রাষ্ট্র পরিচালনায় যে নীতি-পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন, ঐগুলোর অনুসরণে রাজনীতি করার নামই ইসলামী রাজনীতি। সুতরাং বলা যায়, যেসব রাজনৈতিক দল কুরআন-সুন্নাহকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে ইসলামী আইনকানুন, বিধিবিধান, শাসনব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে, নিজেদের জীবনে ও দলের অভ্যন্তরে ইসলামী আদর্শের অনুসরণ করে, কুরআন সুন্নাহর মূলনীতির ভিত্তিতে প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে, একটি আধুনিক প্রগতিশীল রাষ্ট্র গঠনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে, মাঠে-ময়দানে রাজনৈতিক কর্মকা- পরিচালনা করে তাদের রাজনীতিকে ইসলামী রাজনীতি বলে। ইসলামী রাজনীতির কয়েকটি প্রামাণ্য সংঙ্গা Pr. Khurshid Ahmad বলেছেন, "The political system of Islam is based on the three principles of towhid (Oneness of Allah), risala (Prophethood) and

Khilifa (Caliphate)". Sayed Maulana Abul A'la Maududi বলেছেন, "Islamic political system is nothing more than a combination of men working together as servents of Allah to carry out his will and Purpose" . Allama Muhammad Asad বলেছেন, "Islamic political system is a conscious application of the socio- political tenets of islam to the life of the nation and by an incorporation of those tenets in the basic constitution of the country." এককথায় যে রাজনীতি আল্লাহ তায়ালার হুকুম, রাসূলের দেখানো পদ্ধতি এবং পরকালের জবাবদিহিতার অনুভূতি নিয়ে পরিচালিত হবে তাই ইসলামী রাজনীতি।

ইসলামী রাজনীতির লক্ষ্য : ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে– ১. নামাজ কায়েম করা (সমাজে যেসব পুরুষও মহিলা বয়োপ্রাপ্ত তাদের সবাইকে নামাজ পড়তে পরিবেশ করা, উৎসাহিত করা এবং নামাজ না পড়লে শরিয়ার শাস্তি বিধান করা), ২. জাকাত আদায় করা (যাঁর ওপর জাকাত ফরজ হয়েছে তার থেকে জাকাত আদায় নিশ্চিত করা এবং জাকাত প্রাপ্তিদের পাত্তার যোগ্য কাজের আদেশ করা তথা মুয়ামালাত {পরস্পর লেনদেন} মুয়াশারাত {আচার-আচরণ বা জীবন আচরণ} এ ভালো বিষয়গুলো সবাইকে অবহিত করা, পালনে উৎসাহিত করা এবং পালনে আইনি সিমানায় নিয়ে আসা, ৪. অন্যায় কাজের নিষেধ করা তথা মুয়ামালাত {পরস্পর লেনদেন} মুয়াশারাত {আচার-আচরণ বা জীবন আচরণ} এ নিষেধ বিষয়গুলো সবাইকে অবহিত করা, পরিহারে উৎসাহিত করা এবং শরিয়াহবিরোধী কাজ বা কোনো অন্যায় কাজ করলে বিচার ও শাস্তির বিধান করা।

ইসলামী রাজনীতির ন্যূনতম (গরহরসঁস) নীতিমালা

তাওহীদ : ইসলামী রাজনীতির মূল দর্শন হবে তাওহীদ অর্থাৎ একত্ববাদ। কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা ভূখণ্ড নয় গোটা দুনিয়া আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। সুতরাং দুনিয়ার সর্বত্র সার্বভৌমত্ব চলবে আল্লাহ তায়ালার। একটি দেশের সংবিধান, আইন, বিধিবিধান, নিয়মকানুন, নির্বাহী আদেশ, বিচার কাজ সবই আল্লাহ তায়ালার বিধান (কুরআন) অনুযায়ী চলবে।

রিসালাত : মুহাম্মদ (সা.) ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এবং পরিচালনায় আল্লাহ তায়ালার বিধান যেভাবে বাস্তবায়ন করেছেন, ঠিক সেভাবে বর্তমান দুনিয়ায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

ইসলামী শরিয়াহ্ : ইসলামী শরিয়াহ হলো ইসলামী আইন। ইসলামী আইনের ভিত্তি হলো কুরআন সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় ইসলামী শরিয়াহ এর বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

আদালাহ : ইসলামী রাজনীতির নীতি হলো সমাজে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা ও অন্যায়কে উচ্ছেদ করা। রাষ্ট্রের বা সরকারের বিভিন্ন শাখায় যেমন আইন বিভাগ, শাসন বিভিাগ, বিচার বিভাগে যে ন্যায় চলছে তাকে অক্ষুণ্ন রাখতে সরকারকে সহযোগিতা করা এবং যে অন্যায় কাজ চলছে তা বাতিল করতে সরকারকে চাঁপ দেয়া এবং বাধ্য করা।

শূরা : শূরা আরবি শব্দ অর্থ পরামর্শ। ইসলামে পরামর্শের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পরামর্শ করার কথা বলেছেন। রাসূল (সা.) বিভিন্ন পর্যায়ে সাহবাদের সাথে পরামর্শ করেছেন। তাছাড়া যে কাজ সম্পন্ন করতে সবার অংশগ্রহণ জরুরি সেখানে কাজের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা আনয়নে পরামর্শ গ্রহণ মনস্তাত্বিকভাবে জরুরি। আল্লাহ তায়ালা মানুষদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা দিয়েছেন সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতার সমন্বয় পরামর্শের মাধ্যমেই হতে পারে। পরামর্শের নিয়ম হবে– যিনি যে কাজের দায়িত্বে আছেন তাকেই তার দায়িত্বের বিষয় মানুষের নিকট জবাবদিহি করতে হয় সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালার নিকট জবাবদিহি করতে হবে। কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সবার শারীরিক ও মানসিক অংশগ্রহণের জন্য পরামর্শ গ্রহণ করা যেমন আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ, তেমনি পরস্পর পরামর্শ গ্রহণ রাসূল (সা.)-এর সুন্নত। পরামর্শের এ অনুশীলন হবে সর্বত্র (পরিবার, সমাজ, সংগঠন রাষ্ট্র), তাহলে আল্লাহ তায়ালার রহমত আসবে। উল্লেখ্য, বর্তমান সংসদকে মজলিসে শূরা বলা যায়। তবে নির্বাচনী পদ্ধতি বর্তমান পদ্ধতির মতো হবে না। মজলিসে শূরার ক্ষমতা হবে উদ্ভূত সমস্যায় আইন, নীতি, বিধিবিধান প্রণয়ন করা, যা কুরআন-হাদীস অনুযায়ী হতে হবে।

সাম্য : সকল মানুষ সমান এই কথাটির ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো আইনি-বেআইনি কোনোভাবেই মানুষে মানুষে ইসলাম প্রদত্ব (সম্পদে অধিকার, বিচার পাওয়ার অধিকার, কথা-মতামত প্রদানের অধিকার, সম্মান পাওয়ার অধিকার) অধিকার থেকে বঞ্চিত না করা, হেয় না করা, শাস্তি না দেয়া ইত্যাদি।

ইসলামী রাজনীতির ন্যূনতম (গরহরসঁস) বৈশিষ্ট্য

১. উদ্দেশ্যের পবিত্রতা : সর্বত্র, সর্বস্তরে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই ইসলামী রাজনীতির উদ্দেশ্য।

২. উপায় উপকরণের পবিত্রতা : রাজনীতির উপকরণ (কর্মসূচি, কর্মপদ্ধতি) হবে পবিত্র। অন্যায় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কোনো পদ্ধতি অবলম্বন না করা। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সাথে ব্যক্তিগত শত্রুতা থাকবে না। ইসলামিক আদর্শ যে গ্রহণ করবে তার নেতৃত্ব মেনে নেয়া হবে।

৩. নৈতিকতা : রাজনীতিতে যেভাবে অনৈতিকতার প্রভাব তা থেকে ইসলামী রাজনীতি মুক্ত।

৪. আনুগত্য : ইসলামী রাজনীতির নেতৃত্বের আনুগত্য ফরজ। নেতৃত্ব যখন কুফরী করতে বাধ্য করবে, তখন আনুগত্য করা যাবে না। যখন গুনাহের কাজ করবে, তখন সংশ্লিষ্ট কাজের প্রতিবাদ করা, সংশোধন করা সমর্থন না দেয়া ইত্যাদি। তবে এ কাজগুলো অবশ্যই গুনাহের কাজে না জড়িয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় করতে হবে।

৫. দায়িত্বশীলতা : প্রত্যেক নেতাকর্মী দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখবে। কারণ কাল কিয়ামতে তাকে তার দায়িত্ব বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে। দুনিয়ায়ও অন্য নেতাকর্মীদের সামনে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

৬. অনন্য নির্বাচন পদ্ধতি : নির্বাচন পদ্ধতি হবে শরিয়াহ মোতাবিক যেমন কখনো বর্তমান নেতা কর্তৃক পরবর্তী নেতা মনোনীত করা, কখনো বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করে পরবর্তী নেতা নির্ধারণ করা, আবার কখনো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নেতা নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিচক্ষণদের পরামর্শ নিয়ে পরবর্তী নেতার নাম ঘোষণা করা।

৭. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা : আর্থিক হিসাব-নিকাশ যেমন স্বচ্ছ থাকবে, তেমনি এ বিষয়ে জবাবদিহিতা থাকবে। দায়িত্ব পালনে অপারগতার যেমন জবাবদিহিতা থাকবে, তেমনি অতিরঞ্জিত করার বিষয়ে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

৮. আমানতদারিতা : রাজনৈতিক নেতা বা কর্মী হিসেবে আমানাতদারিতা থাকবে। পার্টির আর্থিক সম্পদ, সিদ্ধান্ত, নিজের মেধা-যোগ্যতা, কর্মীদের মেধা যোগ্যতার আমানাতদারিতা রক্ষা করতে হবে।

৯. চারিত্রিক ও নৈতিক শক্তি : ইসলামী রাজনীতিতে নিঃস্বার্থকতা একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কারো সাথে মিথ্যা, প্রতারণা, অসম্মান, হেয়প্রতিপন্ন করার কোনো কার্যকলাপ থাকবে না।

ইসলামী রাজনীতির বর্তমান অবস্থা : বাংলাদেশের মানুষ ইসলামী রাজনীতি বলতে ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনীতিকেই বুঝে থাকে। তবে সাধারণ মানুষ ইসলাম শব্দ বা আরবি শব্দযোগে নামকৃত দলগুলোকে ইসলামী রাজনৈতিক দল মনে করে। ইসলাম শব্দযোগে রাজনৈতিক দলের নাম– যেমন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, ইসলামী ঐক্যজোট, ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, ইসলামিক ফ্রন্ট ইত্যাদি। আরবি শব্দযোগে ইসলামী রাজনৈতিক দল যেমন বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ইত্যাদি। বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতি চর্চায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নামটাই প্রথমে চলে আসে। অন্য দলগুলোকে কেউ কেউ প্রেসার গ্রুপ মনে করে। আরো মনে করা হয় যারা নির্বাচন করে, নির্বাচনে প্রার্থী দেয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, নির্বাচিত হয়, রাজনৈতিক জোট করে তারাই কেবল রাজনৈতিক দল। আর যারা নির্বাচন করে না বা নামেমাত্র নির্বাচন করে, নির্বাচনে প্রার্থী দেয়, কদাচিৎ নির্বাচিত হয়, রাজনৈতিক জোট করে কিন্তু মাঠে তেমন কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা দেখায় না তারা রাজনৈতিক দলের নামে প্রেসার গ্রুপের মতো। এসব রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দাবি নিয়ে মাঠে সরব থাকে। রাজনীতিতে সাধারণত দু'টি দিক আছে– একদিকে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য রাজনীতি; অন্যদিকে ক্ষমতায় গিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার মাধ্যমে জনগণকে সন্তুষ্ট রাখার রাজনীতি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে জামায়াতে ইসলামীকেই একমাত্র ইসলামী রাজনৈতিক দল হিসেবে গণনা করা চলে। বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত কোনো ইসলামী রাজনৈতিক দল ক্ষমতা যেতে পারে নাই; যদিও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জোটবদ্ধভাবে ক্ষমতায় অংশীদার ছিল। দেশের অন্য ইসলামী দলগুলো কখনো এককভাবে আবার কখনো জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করেছে, কিন্তু ইসলামী ঐক্যজোট ছাড়া আর কোনো দলের প্রার্থীই নির্বাচিত হতে পারেন নাই।

আগামী দিনে ইসলামী রাজনীতি : দেশের রাজনীতির যে হাওয়া বইছে এবং দেশের রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক শকুনির আনাগোনা ও থাবা যেভাবে বিস্তার করছে, তাতে ইসলামী রাজনীতিকদের আরও বিশ্লেষণী ও কৌশলী হতে হবে। ইসলামী রাজনীতির নীতিমালা ও বৈশিষ্ট্য থেকে যেমন বিচ্যুত হওয়া যাবে না, তেমনি কখনো কখনো, কোথাও কোথাও রাজনৈতিক দল হিসেবে আবার কখনো কখনো, কোথাও কোথাও প্রেসার গ্রুপের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামী রাজনীতিকদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে– ক) ইসলামী রাজনীতিতে কোনো আপস নেই আছে কৌশল (হেকমত); খ) ক্ষমতা বা নেতৃত্ব দেয়ার মালিক আল্লাহ তায়ালা বান্দার দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান (ঈমানের বলিষ্টতা) রাখা এবং (যে যেখানে আছে সেখানে) নেক আমল (ভালো কাজে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ) করা; গ) আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি মুশরিকী (কুরআনের ভাষায় অপবিত্র) রাষ্ট্রদ্বারা বেষ্টিত; ঘ) ইসলামের শত্রুদের (দেশি-বিদেশি ইসলামবিরোধী শক্তি) সাথে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পর্ক রাখা বা না রাখা বিষয়টি চিন্তায় রাখা; ঙ) দেশ-বিদেশ যেখানেই জালিমের সীমালঙ্ঘন দেখা যাবে, সেখানেই মাজলুমের পক্ষে থাকার নীতি অবলম্বন করা এবং বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে তোলা; চ) রাজনৈতিক শত্রু-মিত্র শুধু নিজ দেশে নয় দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও চিহ্নিত করা এবং ছ) সর্বোপরি নিজ দেশে নিজেদের অবস্থান মজবুত করা।

করণীয় : রাজনীতিকরা বা রাজনৈতিক দল কখনো ক্ষমতায় থাকে আবার কখনো ক্ষমতার বাইরে থাকে। ক্ষমতায় থাকাকালে রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকরা রাষ্ট্র পরিচালনায় সততা, দক্ষতা, যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা দেখিয়ে পরবর্তীতে ক্ষমতায় আসতে চায়। অন্যদিকে ক্ষমতার বাইরে যে রাজনৈতিক দল থাকে, তারা সরকারের ব্যর্থতা, অসততা, অযোগ্যতা,

অত্যাচার-নির্যাতন, আইনের অপব্যবহার বিভিন্ন কর্মসূচি মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরে সঠিক পথে আসার আহ্বান জানায়। পরবর্তীতে সমর্থন না জানানোর জন্য জনমত গঠনের চেষ্টা করে। ইসলামী রাজনৈতিক দলের একই ভূমিকা রাখার পাশাপাশি ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক বাড়তি ভূমিকা রাখার হেকমত অবলম্বন করা সময়ের দাবি। লক্ষ্য অর্জনে ইসলামী রাজনীতিকদের যেমন ইসলামী নীতিমালার অনুসরণ করতে হবে ও ইসলামী রাজনীতির বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেতন থাকতে হবে, তেমনি ইসলামী রাজনীতির নীতিমালার খেলাফ (বিপরীত) কোনো নীতিমালা গ্রহণ করা যাবে না। প্রয়োজনে দলের শরিয়াহ বিশেষজ্ঞ (কিতাবি আলেম ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতি বিষয়ে প্রজ্ঞাবান) সদস্যদের নিয়ে কর্মনীতি, কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে কমিটি করে দিতে হবে প্রচলিত রাজনীতিতে প্রকাশ্যে এক অবস্থা এবং গোপনে আরেক অবস্থা, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ, 'উদোর পিি বুধোর ঘাড়ে' চাপানো, বিরোধীদের ভালো কাজেও সহযোগিতা না করে দোষ খুঁজে বেড়ানো, নিজের ব্যর্থতা-অসততা অপরকে বলতে না দেয়া বা বললে তা সহ্য না করা ইত্যাদি চলছে। ইসলামী রাজনীতিতে এসব পরিভাষার অনুশীলন কোনোভাবেই করা যাবে না। ইসলামী রাজনীতিতে করণীয়কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়– এক) সর্বদা করণীয় যেমন; দাওয়াত, সংগঠন ও প্রশিক্ষণের কাজ করা এবং দুই) দেশের অবস্থা বুঝে করণীয় যেমন ইসলাহে হুকুমত ও ইকামতে হকুমত বা ইকামতে দীনের কাজ করা।

১. দাওয়াতী কাজ : ক) দাওয়াতী কাজের সুন্নত হচ্ছে দাওয়াতী গ্রুপ বের হওয়া এবং ব্যক্তিকে টার্গেট করে দাওয়াতী কাজ করা; খ) দাওয়াতের সাধারণ বিষয় হবে নামাজ, রোজা, পর্দা বিষয়ে দাওয়াত দেয়া। অনুরূপ সুদখোর, ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, চোর-ডাকাত, মদখোর, দখলদার, অত্যাচারী ইত্যাদি লোকদের কাছে দাওয়াত দেয়া; গ) দাওয়াতের পদ্ধতি হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা বুঝে সম্মান অক্ষুণ্ন রেখে দাওয়াত দেয়া; ঘ) একা একা কথা বলা, গ্রুপ করে কথা বলা, ব্যক্তিগত চিঠি লিখে দাওয়াতী কাজ করা, সম্মিলিত দাওয়াতী কাজ করতে খোলা চিঠি লেখা; ঙ) দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে তার যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর সুযোগের কথা বলা; চ) তার কাজে যে পাপ হচ্ছে সেসব পাপের কথা বলা পরিণতির কথা বলা; ছ) প্রধানমন্ত্রীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রথমে ব্যক্তিগত চিঠি অতঃপর খোলা চিঠি দিয়ে দাওয়াতী কাজ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ওয়া জাক্কির ফা ইন্নাজ জিকরা তানফাউল মুমিনিন।'

২. সংগঠন প্রতিষ্ঠা : সংগঠনের বিকল্প নেই। সংগঠন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হবে– ক) মসজিদভিত্তিক; খ) পেশাভিত্তিক; গ) বেইজ এরিয়াভিত্তিক; ঘ) একদিকে বিভিন্ন নামে-বেনামে ভালো কাজের জন্য সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলা, অন্যদিকে কুরআনের গাণিতিক (?) নির্দেশনার অলোকে মজবুত সংগঠন গড়ে তোলা; ঙ) অপর সংগঠনের লোকদের কর্মসূচি ও টাকা সহায়তা দিয়ে ভালো কাজ করানো; চ) যে কোনো সংগঠনকে পৃষ্ঠপোষকতা (অর্থ, বুদ্ধি, প্রশাসনিক সহযোগিতা) দিয়ে কাজ করানো; ছ) আল্লাহ তায়ালার অন্যতম একটি নির্দেশ হলো ঐক্যবদ্ধ থাকা। বর্তমান বাংলাদেশের অনেক মানুষকে বলতে শোনা যায় এ দেশে ইসলামী দলগুলো একত্র হলে ইসলামী প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এ কথা না বুঝে বলা হয় কারণ সে জানে না অতীতে ইসলামের বিভিন্ন নির্দেশ পালনে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্নতা ছিল। এমনকি এই ভিন্নতা যুদ্ধে পর্যন্ত গড়িয়েছে। এটাকে কেউ কেউ ইস্তেহাদগত ভুল বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ 'ঐক্যবদ্ধভাবে তার রজ্জু (আল কুরআন) ধর পৃথক হইও না।' আল্লাহ তায়ালার এই নির্দেশ পালনে ঐক্যবদ্ধ দাবি উত্থাপন করতে হবে। যেমন– ১. সুদ নিষিদ্ধ করতে হবে, ২. শিক্ষাব্যবস্থার সকল শ্রেণী-স্তরে ১০০ নম্বরের ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে, ৩. বিচার বিভাগের প্রতিটি স্তরে একটি শরিয়াহ কোর্ট চালু করতে হবে। বাদী-বিবাদী যে কোনো একজন শরিয়াহ কোর্টে যেতে চাইলে ঐ মামলা শরিয়াহ কোর্টে স্থানান্তরিত করা হবে, ৪. নাটক-সিনেমার খল চরিত্রে পাঞ্জাবি, দাড়ি, টুপি ব্যবহার করা যাবে না এবং ৫. ব্লাসফেমি আইন পাস করতে হবে; জ) সকল স্তরে (হাটে-বাজারে-ঘাটে, জলে-স্থলে,পাড়ায়-মহল্লায়, অলিতে-গলিতে এককথায় ওরা যেখানে আমরা সেখানে) সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং ঞ) বিভিন্ন ইস্যুতে ইসলামী দলগলোকে এক রাখতে হবে, যেমন নিত্যনুতন প্লাটফর্ম তৈরি করে বিভিন্ন প্রোগ্রামের নামে একত্রিত করা, জাতীয় দাবি তুলে এক মঞ্চে নিয়ে আসা।

৩. লোক তৈরি করার টার্গেট হবে : ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আমলের দুর্বলতা দূর করা; খ) আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা (জনশক্তির কাছে আর্থিক বিষয়, আচরণগত দিক, সন্তানের অবস্থা প্রশ্নের উর্ধ্বে থাকতে হবে, আর্থিক জীবন ধারণে জনশক্তির কাছে বিলাসী না হয়ে আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলীর জীবনের মতো হতে হবে); গ) জনপ্রতিনিধি বা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা; ঘ) সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে (ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবনসহ অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতি অনুশীলনে) আল্লাহর রঙ্গে রঙিন করা এবং ঙ) ব্যাপক দারস প্রোগ্রামের মাধ্যমে (স্থানীয় মানুষদের সহযোগিতায়) সাধারণ মানুষকে ইসলামী জ্ঞান দান করা।

দেশের অবস্থা বুঝে করণীয় : ১. ইসলাহে হুকুমত– ইসলাহে হুকুমত হলো, ক্ষমতাসীনদের কাজকে ইসলামের নির্দেশনার আলোকে সংশোধন করা। ইসলামের নির্দেশনার আলোকে ক্ষমতাসীনদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে, অনুরোধ করে, দেশের (ভালো-মন্দ) অবস্থা তুলে ধরে খোলা চিঠি লিখে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার সংশোধন করা। এক্ষেত্রে ইসলামী

রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা হবে। যেমন– ক) ক্ষমতাসীন দল অনুরূপ জনপ্রতিনিধিদের ভালো কাজ করতে আহ্বান (অনুরোধ করা, আবেদন করা) জানাতে হবে; খ) সমাজের প্রতিটি স্তরের, পেশার মানুষের চিন্তা-চেতনা, আমল-আখলাকে যেসব অনৈসলামিক বিষয়গুলো দেখা যাবে, তা সংশোধন করতে হবে; গ) কখনো ব্যক্তিকে, কখনো সমষ্টিকে, কখনো ইঙ্গিতে, কখনো সরাসরি তাদের পাপ কাজ ধরিয়ে দিতে হবে এবং নেক কাজ কী, তা বলতে হবে। বলতে হবে আপনি যে কাজটি করেছেন, এটি ইসলামসম্মত নয়; বরং ইসলামসম্মত হলো এটি। উপরোক্ত এটি গুনাহ এটি সওয়াব; ঘ) জনপ্রতিনিধি হলে যে কাজগুলো আল্লাহ তায়ালা করতে বলেছেন, সেগুলো তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া; ঙ) নির্বাচনের সময় যে কাজ করা যেতে পারে– ধরুন, একটি ইউনিটে কয়েকজন মেম্বার প্রার্থী রয়েছেন তাদের বলতে হবে আমরা নির্বাচন করবো না এবং ঐ প্রার্থীকেই আমরা সমর্থন দেবো যে আমাদের দাবিগুলো তথা প্রতিটি মসজিদে শিশু ও বয়স্কদের কুরআন শিখানোর ব্যবস্থা করবে, সাপ্তাহিক-মাসিক কুরআন-হাদীসের আলোচনার ব্যবস্থা করবে, সকল দলের সহাবস্থান নিশ্চিত করবে ইত্যাদি এবং অনৈসলামিক কোনো কাজ যেমন– যাত্রা গান, জুয়া, মদ পান নিজে করবে না এবং করতে দেবে না। নির্বাচিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ওয়াদা অনুযায়ী কাজ করলে আপনার কাজই করল বলে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করতে হবে এবং ওয়াদা বাস্তবায়ন না করলে জনগণ তাকে তখনই প্রত্যাখ্যান করবে এবং ইসলামী দলের অবস্থান আগামী দিনে আরও মজবুত হবে। এ ধারা ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যন্ত অনুশীলন করা যেতে পারে এবং চ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভাপতি নির্বাচনে, জেলা পরিষদ নির্বাচনে জনসম্মুখে ওয়াদা গ্রহণের মাধ্যমে ভালো কাজ করার সুযোগ নেয়া এবং এর মাধ্যমে আগামী দিনে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার সুযোগ নেয়া যেতে পারে।

২. ইকামতে হুকুমত বা ইকামতে দীনের কাজ : ইকামতে হুকুমত বা ইকামতে দীন বলতে বোঝায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা– ক) ১৫১ সিট (সংসদের আসন) পেয়ে সরকার গঠন করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা হবে। ইকামতে হুকুমত প্রতিষ্ঠা এককভাবে ক্ষমতায় যাওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। এখানে এককভাবে বলতে বোঝানো হয়েছে, এককভাবে কোনো দলের ক্ষমতায় যাওয়া অথবা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় একাধিক দলের ঐক্যমত হওয়া; ঘ) জোট গঠন বা ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার শর্ত প্রদানের মাধ্যমেও ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা যায়। যেমন শর্ত দেয়া হবে– সুদ নিষিদ্ধ করতে হবে, শিক্ষাব্যবস্থার সব শ্রেণী-স্তরে ১০০ নম্বরের ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে, বিচার বিভাগের প্রতিটি স্তরে একটি শরিয়াহ কোর্ট চালু করতে হবে। বাদী-বিবাদী যে কোনো একজন শরিয়াহ কোর্টে যেতে চাইলে ঐ মামলা স্থানান্তরিত করা হবে। যে দল এসব শর্তে সম্মতি দেবে আমরা তাকে সমর্থন দেবো বা তার সাথে জোট গঠন করবো। অনুরূপ আরও শর্ত দেয়া যেতে পারে ক্ষমতায় গেলে রাষ্ট্রে নামাজ কায়েম করবে।

প্রাসঙ্গিক বিষয় : ১. ইসলামী রাজনীতিতে জনপ্রতিনিধির গুরুত্ব; প্রতিনিধি অর্থ হলো দায়িত্ব প্রাপ্ত। মানুষকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন প্রতিনিধি হিসেবে। প্রতিনিধির গুরুত্ব, দায়িত্ব ও কর্তব্যের পাশাপাশি জবাবদিহিতাও রয়েছে। প্রতিনিধি কখনো নির্বাচনের মাধ্যমে আবার কখনো মনোনয়নের মাধ্যমে আবার জোর করে প্রতিনিধিত্বও করে থাকে। একজন প্রতিনিধি ইসলামের দাওয়াতী কাজে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে। তন্মধ্যে ২টি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো– একদিকে যাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন বা যাদের জন্য মনোনীত হয়েছেন, তাদের নিকট অনায়াসে যাতায়াতের সুযোগে ইসলামের দাওয়াত দিতে পারেন। অন্যদিকে যারা দেশেরে বিভিন্ন পদে থাকেন বা পরিচালনা করেন, তাদের মধ্যে কাজ করতে পারেন। দাওয়াতী কাজ শুধু মুখে নয় মুয়ামালাত-মুয়াশারাত, যোগ্যতা, দক্ষতা, সততা, আমানাতদারিতার নিদর্শন দ্বারা দেয়া হয়। ইসলামী সংগঠনের জনপ্রতিনিধিদের দাওয়াতী কাজের এ সুযোগের ব্যবহার করতে হবে পাশাপাশি সূরা হজের ৪১নং আয়াতের আলোকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'যখন তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে, তখন তাদের কাজ হবে ৪টি : নামাজ কয়েম করা, জাকাত আদায় করা, ভালো কাজের আদেশ করা ও খারাপ কাজ নিষেধ করা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, অনৈসলামিক জনপ্রতিনিধি যেমন এ কাজটি করেন না, তেমনি ইসলামিক জনপ্রতিনিধি করেন না, করতে চেষ্টা করেন না! করতে পারেন না, সাহস করেন না। উপরোক্ত কাজগুলো ইসলামী দলের প্রতিনিধিরা যখন না করেন, তখন সাধারণ মানুষ তাকেও অন্যান্য দলের প্রতিনিধির মতো মনে করেন, ইসলামী প্রতিনিধির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। ফলে পরবর্তীতে সমর্থন দেয় না। অন্যদিকে এ ব্যর্থতার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকটও জবাবদিহি করতে হবে।

ইসলামী রাজনীতির বেইজ এরিয়া : ১. মসজিদ; প্রতিটি মসজিদ হবে একটি ইউনিট, সাউন্ডবক্স, জনশক্তির মিলন কেন্দ্র। আদর্শ মসজিদের বৈশিষ্ট্য– ১. সকালে-দুপুরে-বিকেলে ছোট ও বয়স্কদের কুরআন শিখানোর ব্যবস্থা করা, মাসিক দারসে কুরআনের ব্যবস্থা করা, মাসিক দাতব্য চিকিৎসা দেয়া, মাসে একবার সামাজিক কাজে বের হওয়া, সপ্তাহে একদিন গ্রুপ দাওয়াতে বের হওয়া; ২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাজ করা; স্থানীয়দের সহযোগিতায় কুরআন-হাদীস ও প্রচলিত শিক্ষার সমন্বয়ে ব্যাপক হারে ইবতেদায়ী মাদরাসা, হিফজখানা ও কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা করুন। প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে কুরআন-হাদীসের সিলেবাস দিন। এসব প্রতিষ্ঠানে এক কাজে দুই শিক্ষা (সাধারণ ও আরবি) পাবে মর্মে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করুন।

শতকরা ৯৩ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির সঙ্কটকাল যাচ্ছে। স্বাধীনতা-উত্তর ইসলামী রাজনীতিকদের যথার্থ কর্মনীতি, কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামী রাজনীতি একটি শক্তি। যুগে যুগে ইসলামী রাজনীতিকরা আল্লাহ তায়ালার গায়েবী মদদে যোগ্যতা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা সাথে মোকাবিলা করে আজো টিকে আছে। আলহামদুলিল্লাহ। আজকের প্রেক্ষাপটে পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আবারও সামনে এগিয়ে যাব; ইনশাআল্লাহ। ইসলামী রাজনীতি তার লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনে কর্মসূচি, কর্মপদ্ধতি সংশোধন করে (শরিয়াহবিরোধী কখনো নয়) থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের আগামী দিনের পথ রচনায় কুরআন-হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস থেকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে নিতে হবে চলার পথ কী হওয়া উচিত। আল্লাহ তায়ালা আমাদের তার গায়েবী মদদ দ্বারা সহযোগিতা করুন। আমীন।

লেখক : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক।

মুহাম্মদ (সা.)-এর বিবাহ নিয়ে অপপ্রচারের জবাব

-তৌহিদুর রহমান

পাশ্চাত্য দুনিয়ায় সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিক বিয়ে! কেন তিনি অধিক বিয়ে করলেন– এই চিন্তায় অমুসলিমরা তো বটেই, অনেক মুসলমানও বিভ্রান্ত। এ নিয়ে সারা দুনিয়াতেই অত্যন্ত আপত্তিজনক ও গর্হিত কথাবার্তা চালু আছে। কখনো কখনো অমুসলিমরা এতটাই বাড়াবাড়ি করে যে মুসলমানদের সাথে এ নিয়ে তাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হতে দেখা যায়। বিষয়টা যে শুধু অমুসলিম সমাজে সমালোচিত তাই নয়, মুসলিম সমাজেও এ নিয়ে অনেক বিতর্ক-বাহাস চলে আসছে প্রায় পনেরশ' বছর ধরে।

কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় যে, মানুষ কখনো নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে না। নিজের ভুল সে কখনো নিজের চোখে দেখতে পায় না। তারা কিনা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন নিয়ে কটূক্তি করে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, তাঁর সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। পাশ্চাত্যবাদীদের জানা উচিত মুহাম্মদ (সা.) যা কিছুই করেছেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নির্দেশ মোতাবেক করেছেন। শিশুকাল থেকেই আল্লাহর আরশের ছায়ায় তিনি লালিত পালিত হয়েছেন। তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখি তিনি শিশুকাল থেকেই মহান আল্লাহ কতৃক পরিচালিত ছিলেন। আমরা এখানে মাত্র দু'একটি ঘটনা তুলে ধরবো।

অধিকাংশ সীরাত গ্রন্থকার বলেছেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স যখন চার অথবা পাঁচ বছর তখন তাঁর 'বুক বিদীর্ণ'র ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার বর্ণনা সহীহ মুসলিমে হজরত আনাস (রা.) থেকে এভাবে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন হজরত জিব্রাইল (আ.) তাঁর কাছে আগমন করেন। এ সময় তিনি অন্য শিশুদের সাথে খেলছিলেন। জিব্রাইল (আ.) তাঁকে শুইয়ে বুক চিরে তা থেকে একটা রক্তপিন্ড বের করে আনলেন এবং বললেন, এটা আপনার মাঝে শয়তানের অংশ। এরপর সেটা তশতরিতে রেখে পানি দিয়ে ধুয়ে পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করে দিলেন। অন্য শিশুরা ছুটে গিয়ে হজরত হালিমাকে বললো, মুহাম্মদকে মেরে ফেলা হয়েছে। এ সময় পরিবারের লোকরা ছুটে গিয়ে দেখলেন, তিনি বিবর্ণ মুখে বসে আছেন। (সহীহ মুসলিম)।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাবাঘর তখন সংস্কার করা হচ্ছিল। নবী মুহাম্মদ (সা.) সেসময় হজরত আব্বাস (রা.)-এর সাথে পাথর বহন করছিলেন। হজরত আব্বাস (রা.) তাঁকে বললেন, লুঙ্গি খুলে কাঁধে রেখে তার ওপর পাথর বহন করো তাহলে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা পাবে। লুঙ্গি খোলার সাথে সাথে তিনি মাটিতে বেহুস হয়ে পড়ে গেলেন। তখন তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠে যায়। একটু পরে হুশ ফিরে এলে বলেন, আমার কাপড়! আমার কাপড়! এরপর তাঁকে কাপড় পরিয়ে দেয়া হয়। এ ঘটনার পর আর কখনো তাঁকে উলঙ্গ হতে দেখা যায়নি। (সহীহ বোখারী)।

এ থেকে বোঝা যায়, তিনি শিশুকাল থেকেই মহান আল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত ছিলেন। আমরা এখানে মুহাম্মদ (সা.)-এর অধিক বিয়ে এবং বালিকা বধূ হজরত আয়েশা (রা.) ও হজরত জয়নাব বিনতে জাহস (রা.)-এর বিয়ে সম্পর্কে যতদূর সম্ভব আলোকপাত করতে চাই। তবে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা আসতেই পারে। সর্বপ্রথম আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর মহামর্যাদাবান মহীয়সী স্ত্রীদের তালিকা সামনে রাখতে চাই। তাঁর স্ত্রীরা হচ্ছেন– ১. হজরত খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা.), ২. হজরত সওদা বিনতে যুময়া (রা.), ৩. হজরত আয়েশা বিনতে আবুবকর (রা.) ৪. হজরত হাফসা বিনতে ওমর ফারুক (রা.) ৫. হজরত জয়নাব বিনতে জাহস (রা.) ৬. হজরত উম্মে সালমা বিনতে আবি উম্মিয়া (রা.) ৭. হজরত উম্মে হাবীবা বিনতে সুফিয়ান (রা.) ৮. হজরত মায়মুনা বিনতে হারেস (রা.) ৯. হজরত জুরাইরিয়া বিনতে হারেস (রা.) ১০.

হজরত সুফিয়া বিনতে হুয়াই (রা.) ১১. হজরত জয়নাব বিনতে খুজাইমাহ (রা.) এবং ১২. হজরত মারিয়া ক্বিবতিয়া (উম্মে ইব্রাহীম) (রা.)।

পৃথিবীর অজস্র প্রখ্যাত মানুষ মুহাম্মদ (সা.)-কে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বললেও তাঁর সমালোচক ও কুৎসা রটনাকারীর সংখ্যাও কম নয়। পাশ্চাত্যের অনেকে বলেছেন যে, দুনিয়ার মহান ব্যক্তিদের মধ্যে মুহাম্মদ (সা.) সবচেয়ে বেশি সমালোচিত। সব ধরনের মিডিয়ায়ই তাঁকে নিয়ে সমালোচনামূলক কর্মকা চোখে পড়ার মতো। বর্তমানে ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে এসব সমালোচনা বেশি প্রচারিত হচ্ছে। আমাদের দেশের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী, লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মোস্তফা জামান আব্বাসী আমেরিকার ওয়াশিংটনের বিশ্বখ্যাত ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ঢুকে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর লিখিত বই খোঁজ করতে গিয়ে দেখেন যে, বেশির ভাগ বই নবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে লেখা, অল্প কিছু বাদে। জনাব আব্বাসী তাঁর বক্তৃতায় এসব কথা প্রায়ই বলে থাকেন। তাঁর এ কথার সত্যতা মিলবে বিভিন্ন ওয়েব সাইট নির্ভর লাইব্রেরিতে গেলে।

মুহাম্মদ (সা.)-এর এই বহু বিবাহ নিয়ে পাশ্চাত্যের কোন কোন লেখক জঘন্য কুৎসা রটনা করেছেন। এমন বিশ্রী ভাষায় এসব মিথ্যাচার করা হয়েছে যা উল্লেখযোগ্য নয়। তারা বলতে চাচ্ছেন যেন নবীদের বিয়ে-শাদী করা হারাম বা অপবিত্র কাজ। পূর্বের কোনো নবীই যেন বিয়ে করেননি অথবা করলেও একাধিক বিয়ে করেননি। তাদের এসব কথাবার্তা সবই চরম মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়।

মুহাম্মদ (সা.)-এর বিয়ে নিয়ে যারা অযৌক্তিক সমালোচনা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন– ভলতেয়ার, প্রিডয়ো, বসওয়ার্থ স্মিথ, উইলিয়াম মুর, জেরি ভিনস, ডাচ নেতা গ্রিট উইলডারস, প িত চামুপতি, ডি.এস মারগলিয়থ, টিপি হিউজেস, উইলিয়াম সেন্ট ক্লেয়ার টিসডাল, এন.এল গেইসলার, ই.এম হোয়েরী, মুরতাদ সালমান রুশদী, মুরতাদ মুমিন সালিহ, তসলিমা নাসরিন প্রমুখ।

নবী (সা.) ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছরের বিধবা হজরত খাদিজা (রা.)-কে বিবাহ করেন। তাকে নিয়ে ২৫ বছর সংসার করেন। হজরত খাদিজার মৃত্যুর পর কেন তিনি এতগুলো বিয়ে করলেন? এ নিয়ে ইসলামের শত্রুরা নানা কথা বললেও সেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই।

উল্লেখ্য, হজরত আয়েশা ও হজরত মারিয়া কিবতি ছাড়া নবী (সা.)-এর সব স্ত্রী হয় বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা ছিলেন। নবী (সা.) চাইলে সেই সময় আরবের সেরা কুমারী সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু বেশি বয়সে বেশি বিয়ে করার ভিতরে রয়েছে আল্লাহর হেকমত। তাছাড়া ধর্মীয় প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যাবলী, রাজনৈতিক কৌশল, কুসংস্কার উচ্ছেদ, দুস্থ মহিলাদের প্রতি মহানুভবতা ইত্যাদি তাঁর বহুবিবাহের পক্ষের যুক্তি। তিনি এসব ভোগবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে করেননি। মানুষ হিসাবে তিনি কখনই ভোগবাদী ছিলেন না, এমন কি যখন তিনি সমগ্র আরবের রাষ্ট্রনায়ক হলেন, তখনও না।

তাছাড়া নবী (সা.)-এর একাধিক বিয়ের প্রথম এবং মূল হেকমত হচ্ছে নবাগত মুসলিম মহিলাদের জন্য শিক্ষিকা তৈরি করা। নবী (সা.)-এর স্ত্রীগণ নবীর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অজ্ঞ মহিলাদের শরীয়তের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ নির্ভুলভাবে শিক্ষা দিবেন এটাই ছিল আসল লক্ষ্য। কারণ পুরুষদের ওপর যা কিছু ফরজ বা অপরিহার্য করা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে মহিলাদের ওপরও তা ফরজ করা হয়েছে।

মহিলাদের অধিকাংশই নবী করীম (সা.)-কে সরাসরি তাদের আভ্যন্তরীণ শরয়ী বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লজ্জা ও সংকোচবোধ করতেন। বিশেষত হায়েজ, নেফাস, অপবিত্রতা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার অন্যান্য খুঁটিনাটি ব্যাপারাদি সম্পর্কে। এ জাতীয় বিভিন্ন আনুষঙ্গিক প্রশ্ন করতে গিয়ে মহিলারা ভীষণভাবে লজ্জিত হতেন। তেমনিভাবে নবী (সা.)-এর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল লজ্জাশীলতা। হাদীসের গ্রন্থসমূহে তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া তিনি মহিলাদের তরফ থেকে উত্থাপিত সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সরাসরি সক্ষম হতেন না। বরং বিভিন্ন অবস্থায় আকার-ইঙ্গিতে তা বলতেন। যাতে করে অনেক সময় মহিলারা সব বুঝতে পারতেন না। হজরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, একবার জনৈক আনসার মহিলা নবী (সা.)-কে হায়েজের গোসল সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। নবী (সা.) তাঁকে গোসলের পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। আবার বললেন, 'এক টুকরো রুই বা কাপড়ে সুগন্ধি মিশ্রিত করে তা পরিষ্কার করবে।' মহিলাটি বললেন, 'কেমন করে পরিষ্কার করব তা দ্বারা?' নবী (সা.) বললেন, 'ওটা দিয়ে পরিষ্কার করে নিও।' মহিলাটি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল, ওটা দিয়ে কেমন করে পরিষ্কার করব?' নবী (সা.) বললেন, 'সুবহানাহু আল্লাহ! পরিষ্কার করে নিও।'

হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'আমি ঐ মহিলার নিকট থেকে রুই বা কাপড়ের টুকরোটি টেনে নিলাম আর বললাম যে, এটি অমুক জায়গায় এমনিভাবে রাখবে এবং এর দ্বারা রক্ত পরিষ্কার করে ফেলবে। এতক্ষণে ব্যাপারটা ঐ মহিলার নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল।'

নবী করীম (সা.)ও এত খোলাখুলিভাবে সবকিছু ব্যাখ্যা করতে ভীষণ লজ্জাবোধ করতেন। পক্ষান্তরে মেয়েদের মধ্যেও বহু সংখ্যক ছিল যারা এত খোলাখুলি প্রশ্ন করতে পারতো না। নবী (সা.)-এর প্রত্যেক স্ত্রীই নিজের গোত্রের মেয়েদের শিক্ষার

ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। প্রতিদিনই অসংখ্য নারী মাসলা-মাসায়েল ও তথ্য জানার জন্য রাসূল (সা.)-এর স্ত্রীদের কাছে আসতেন। তাঁরাও উদার মনে আগতদের সবকিছু জানাতেন। কোনো কিছু জানা না থাকলে পরবর্তীতে নবী (সা.)-এর কাছ থেকে জেনে নিয়ে তার সমাধান দিতেন। তবে এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন হজরত আয়েশা (রা.)। তিনি দুই হাজারের অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী পরবর্তী যুগে আয়েশা (রা.) শেষ জীবন পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য শিক্ষিকার ভূমিকা পালন করে গেছেন।

মনে রাখা উচিত মুহাম্মদ (সা.) জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অর্থাৎ পরিপূর্ণ যৌবন বয়সে সামান্য সময়ের জন্যও প্রবৃত্তির তাড়ানায় পড়েছিলেন ঐতিহাসিকদের কোনো দলিলের এমন কোনো তথ্য আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। চৌদ্দ থেকে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত কাফেররাই তাঁকে আল আমীন বা বিশ্বাসী হিসাবে ডাকতেন। এই সময়ই তো মানুষের জৈবিক তাড়না বেশি থাকে। তখন তাঁর সমবয়সী অনেক নারী তাঁর সাথে বেড়ে উঠেছে। তখন তো পর্দা প্রথাও নাজিল হয়নি। কিন্তু ঐ বয়সেও কোনো মেয়ের দিকে তিনি চোখ তুলে তাকিয়েছেন এমন কোনো সত্য দলিল পাওয়া যায় না। বরং আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশের, তখনকার সময়ের সবচেয়ে ধনী মহিলা হজরত খাদিজা (রা.) মুহাম্মদ (সা.)-এর সততা ও আদর্শে মুগ্ধ হয়েই তাঁকে বিয়ে করেছিলেন।

রাসূল (সা.)-এর বহুবিবাহ ও বিভ্রান্তির অবসান: ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষীরা তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য রাসূল (সা.)-এর নবুয়্যাত থেকে শুরু করে যে সকল বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাঁর বহুবিবাহ সম্পর্কে অপবাদ। এর মাধ্যমে তারা চাচ্ছে যে, রাসূল (সা.)-এর রেসালাত ওপর ঈমান আনা থেকে মানুষ বিরত থাকুক এবং মুসলিমরা তাদের ধর্ম ও নবীর ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হোক। যাতে ঈমানের দাবী বাস্তবায়নে বাধাগ্রস্ত হয়। তাই যদি না হবে তাহলে গোটা আরব বিশ্ব যখন রাসূল (সা.)-এর ঘোরতর বিরোধীতায় লিপ্ত ছিলো, তাকে পাগল, মিথ্যুক, কবি, গণক ও জিনে ধরা রুগী বলতেও দ্বিধাবোধ করতো না। এমনকি তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিলো। এতটা শত্রুতা করার পরও তারা তখন তাঁর চরিত্র নিয়ে কোন ধরণের অপবাদ দিতে পারেনি। রাসূল (সা.)-এর বহুবিবাহ যদি প্রবৃত্তির তাড়নায়ই হতো তাহলে এ সুযোগ তৎকালীন আরবরা কিছুতেই হাত ছাড়া করতো না। তাহলে আজকের দিনে যারা তাঁর এ বিষয় নিয়ে অপবাদ দেয়ার চেষ্টা করছে, তারা কি রাসূল (সা.) সম্পর্কে আরবদের চেয়েও বেশি বুঝে? সত্য চিরদিনই সত্য, আর মিথ্যা সাময়িক প্রপাগান্ডা থাকলেও তা কোন দিনও সত্যে পরিণত হবে না। আর তথাকতিথ কাল্পনিক অপবাদের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় তারা সফল হতে পারবে না। অতএব, আজকের জাহেলরা যতই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আর বানোয়াট তৎপরতা চালাক না কেন, কোন দিনও তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না।

রাসূল (সা.)-এর বহু বিবাহের মাহাত্ম্য ও উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম ছিলো: নারী-পুরুষ সকলের জন্য শিক্ষা কার্যক্রমকে উন্মুক্ত করা, সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠা, ধর্মীয় বিধান স্পষ্ট করা, ধনী-গরীবের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক কৌশল, ইত্যাদি। তিনি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণে কিছুই করেননি। যে সকল মহিয়সী নারীদেরকে তিনি বিবাহ করেছেন তাদের প্রত্যকের জীবন বৃতান্তসহ বিবাহের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক তথ্য জানার চেষ্টা করলেই কপোটধারীদের বিবেক খুলে যাবে। আমরা এখানে সামান্য কিছু ইশারা দেয়ার চেষ্টা করছি, বিস্তারিত পরিসরে উলেণ্ঢখ করা এখানে সম্ভব নয়।

প্রথমত: মানুষের জীবনের দুটি দিক রয়েছে, এক বাহিরের দিক, দুই আভ্যন্তরীণ দিক। কারো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে হলে জীবনের এই উভয় দিকই উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন। প্রকাশ্য জীবন হচ্ছে সকলের সামনে যা মানুষ করে থাকে। আর আভ্যন্তরীণ জীবন হচ্ছে তার পারিবারিক জীবন। আর পারিবারিক জীবন দ্বারাই একজন মানুষের চারিত্রিক নির্মলতা নির্ণয় করা যায়। কারণ, একজন মানুষের সত্যিকারের চরিত্র তার পরিবারের লোকেরাই সবচেয়ে বেশি ভাল জানে। রাসূল (সা.)-এর প্রকাশ্য জীবন কেমন ছিলো সে সম্পর্কে তাঁর লক্ষ লক্ষ সাহাবায়ে কেরামগণের বর্ণনা দ্বারা জগৎবাসীর সামনে উন্মোচিত হয়েছে। অপর দিকে রাসূলের পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে খোলা-মেলা আলোচনা করেছেন তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ। পরিবার-পরিজনের সাথে তাঁর আচার-আচরণ কেমন ছিলো, রাতের ইবাদত কেমন করতেন, বিবিদের হক ঠিকমত আদায় করতেন কিনা ইত্যাদি বিষয় জগৎবাসীর নিকট স্পষ্টভাবে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর স্ত্রীগণ। সেখানেতো একজন স্ত্রীও তাঁর বিরুদ্ধে কোন ত্রুটির কথা বর্ণনা করেননি? তাহলে বিভ্রান্তকারীদের কেন এত দুশ্চিন্তা? মক্কার কুরাইশগণ যখন প্রস্তাব দিয়েছিলো যে, আপনি যদি ক্ষমতা চান তাহলে ক্ষমতা দেয়া হবে, বা কোন নারী লোভী হন তাহলে আরবের সবচেয়ে সুন্দরী নারী দেয়া হবে, আপনি কি সম্পদ চান তাহলে সবচেয়ে বড় ধনী বানিয়ে দেয়া হবে, অথবা যদি জিনে ধরা রোগী হন তাহলে চিকিৎসা দেয়া হবে। এর চেয়েতে লোভনীয় প্রস্তাব আর কি হতে পারে? কই তিনিতো সেগুলোর একটিও গ্রহণ করেননি? বরং তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন, আমার এক হাতে যদি আকাশের চাঁদ আর অন্য

হাতে সূর্য এনে দেয়া হয় তাহলেও আমি তাতে রাজি হব না এবং আমার মিশন থেকে কেউ আমাকে বিরত রাখতে পারবে না। তাহলে কেন তার বিরুদ্ধে আজকে অপবাদ দেয়া হচ্ছে ? আর এ অপবাদের বিশ্বাস যোগ্যতাই বা কি থাকতে পারে?
দ্বিতীয়ত: তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় বিয়ে করেন নি। যদি তাই হতো তাহলে পচিঁশ বছরের যুবক কেন চলিণ্ডশ বছর বয়সী নারী খাদীজা (রা.)-কে বিয়ে করবেন। যা বর্তমান যুগে কল্পনাও করা যায় না। এমন কি খাদীজার সাথে পচিঁশ বছর সংসার করলেন, তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ড় কোন বিয়েও করলেন না। খাদীজার ইন্ড়কালের পর রাসূল (সা.) জীবিত ছিলেন মাত্র তের বছর। এই তের বছরে রাসূল (সা.) বাকী দশজন স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। প্রবৃত্তির কারণেই যদি হতো তাহলে যৌবনের সেই সোনালী দিনগুলোতেই একাধিক বিবাহ করতেন। একজন বৃদ্ধার সাথে যৌবন পার করতেন না। মহা নবী হযরত মোহাম্মদ সা. নিজের ইচ্ছায় কিছু করেননি। তিনি ছিলেন মহান রব আল্লাহর সবচেয়ে অনুগত বান্দা। তিনি দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ তায়ালার আদেশ বাস্তবায়ন করেছেন।
লেখক : কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।

প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন সর্বগুণের আধার

-আবু ওমায়ের

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। তিনি যেমন ছিলেন ইনসানে কামেল তথা পরিপূর্ণ মানুষ, তেমনই ছিলেন একজন পরিপূর্ণ আদর্শ মহামানব। পৃথিবীতে যত ভালো গুণ আছে এর সব গুণের সমাবেশ ঘটেছিল একজন মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যে। এককথায়, তিনি ছিলেন সর্বগুণের আধার। ফরাসি লেখক আলফ্রেড তার তুর্কির ইতিহাসের প্রথম খন্ড লিখেছেন, 'দার্শনিক, বক্তা, ধর্ম প্রচারক, যোদ্ধা, আইন রচয়িতা, ধর্মমতের ও প্রতিমাবিহীন ধর্ম পদ্ধতির সংস্থাপক মুহাম্মদ (সা.)-কে মানুষের মহত্ত্বের যতগুলো মাপকাঠি আছে, তা দিয়ে মাপলে কোনো লোক তাঁর চেয়ে মহৎ হতে পারবে না।' যে ব্যক্তি খুবই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দিকে তাকাবেন, তিনি দেখতে পাবেন– তাঁর চরিত্র ছিল অত্যন্ত উন্নতমানের। কোনো মানুষ তাঁর সমকক্ষ হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর কোনো একটি গুণাবলীর সমানও হতে পারবে না। তাঁকে যিনি শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি হলেন মহান প্রভু আল্লাহ তায়ালা। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আমার রব আমাকে সর্বোত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন।' আল্লাহ তায়ালা এ সম্বন্ধে বলেন, 'নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী।' (সূরা আল কলম : ৪)। কেন তিনি এরকম হবেন না; অথচ তিনি মহান আল্লাহ তায়ালার আশ্রয়ের মধ্যে ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, 'আপনি আমার চোখে চোখেই আছেন।' (সূরা তুর : ৪৮)।
মুহাম্মদ (সা.)-এর কিছু উল্লেখযোগ্য গুণাবলী
ধৈর্য : মুহাম্মদ (সা.) ইসলামের দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেয়ার কাজ করতে গিয়ে কুরাইশদের কাছ থেকে অমানুষিকভাবে অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়েও ধৈর্যধারণ করেছেন। হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার কাছে কি এমন কোনো দিন এসেছে, যা ওহুদের চেয়েও কঠিন দিন ছিল?' রাসূল (সা.) বলেন, 'আমি তোমার কওম থেকে এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি, যা বর্ণনাতীত। আর আকাবার দিন (তায়েফের ঘটনা) ছিল তাদের পক্ষ থেকে সবচেয়ে কঠিন অবস্থা। আমি নিজেকে সমর্পণ করলাম ইবনে আবদি ইয়ালিল ইবনে আবদি কুলাল গোত্রের কাছে; কিন্তু তারা আমার ইচ্ছায় সাড়া দিল না। অতঃপর আমি চেহারায় দুঃখের ছাপ নিয়ে ফিরে আসছিলাম। আমি যখন সম্বিত ফিরে পেলাম, তখন আমি ছিলাম 'কারনে সায়ালেব'-এ। আমি মাথা ওপরের দিকে তুললাম। দেখলাম একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া দিয়েছে। সেখানে জিবরাঈল (আ.)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আল্লাহ তায়ালা কওমের উদ্দেশে আপনার বক্তব্য ও তাদের জবাব শুনেছেন। তিনি আপনার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। তাদের ব্যাপারে আপনার যা খুশি তাকে নির্দেশ দেবেন। পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডেকে সালাম দিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি যা চান তাই হবে। যদি আপনি বলেন তাহলে আমি তাদের ওপর পাহাড় দুইটি চাপিয়ে দেব। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন না! বরং আমি চাই তাদের ঔরসজাত সন্তানদের মধ্য থেকে এমন কেউ বের হোক, যে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে অংশীদার স্থাপন করবে না।' (বোখারী-৩২৩১, মুসলিম-১৭৯৫)।
সাহসিকতা : সাহসিকতা প্রদর্শন একটা অত্যন্ত চমৎকার গুণাবলী। রাসূল (সা.) যুদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় ছিলেন সব মানুষের চেয়ে বেশি সাহসী। তার মতো সাহসী মানুষ কোনো চোখ দেখেনি। বীর সিপাহি হজরত আলী (রা.) বলেন, যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হতো, তখন আমরা রাসূল (সা.)-কে আড়াল নিয়ে আত্মরক্ষা করতাম। তিনি থাকতেন আমাদের মধ্য থেকে শত্রুদের সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি। এর অনেক প্রমাণ রয়েছে ওহুদ ও হুনান যুদ্ধে। শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি সম্বন্ধে হজরত আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি, সর্বোচ্চ দানশীল, সবচেয়ে সাহসী। এক রাতে

একটা শব্দের কারণে মদীনাবাসী ভয় পেয়েছিল। লোকেরা শব্দের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। রাসূল (সা.) ফিরে আসার পথে তাদের দেখা পেলেন। তিনি তাদের আগেই শব্দের কাছে চলে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আবু তালহার ঘোড়ায় এবং তাঁর কাঁধে ঝুলছিল খোলা তরবারি। তিনি তাদের বলছিলেন, অবস্থা শান্ত! অবস্থা শান্ত (ক্ষতিকর কোনো কিছুর সম্ভাবনা নেই)। তিনি বলেন, আমরা তাকে পেয়েছি সমুদ্রের মতো অথবা তিনি ছিলেন সমুদ্র (সমুদ্রের বেগে এগিয়ে যেতেন)। তিনি বলেন, ঘোড়াটিও ছিল খুবই ধীরগতিসম্পন্ন। (মুসলিম-২৩০৭, ইবনে মাজাহ-২৭৭২)।

ক্ষমা : ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না নেয়ার নামই ক্ষমা। মক্কা বিজয়ের দিনে রাসূল (সা.) মক্কার লোকদের উদ্দেশে বক্তৃতা করছিলেন। তারা নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের ব্যাপারে তার নির্দেশেরই অপেক্ষা করছিল। তিনি বললেন, 'হে কুরাইশরা! তোমরা আমার কাছ থেকে আজ কেমন ব্যবহার আশা কর?' তারা বলল, 'সম্মানিত ভাই ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মতো!' তিনি বললেন, 'তোমরা চলে যাও, আজ তোমরা মুক্ত।' তারা তাকে অনেক অত্যাচার-নির্যাতন, তিরস্কার, সামাজিকভাবে বয়কট করা; এমনকি হত্যার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন।

সহনশীলতা : সহনশীলতা ছিল রাসূল (সা.)-এর উত্তম গুণ। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন বেদুঈন মসজিদে পেশাব করেছিল। লোকেরা তার ওপর হামলে পড়ার জন্য ফুঁসে উঠলে রাসূল (সা.) তাদের বললেন, তাকে ছেড়ে দাও! আর তার পেশাবের ওপর বালতিভর্তি পানি অথবা বালতি দিয়ে পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমরা সহজ করার জন্য প্রেরিত হয়েছ, কঠিন করার জন্য প্রেরিত হওনি। (বোখারী-৬১২৮)।

দানশীলতা : মুহাম্মদ (সা.)-এর দানশীলতা ছিল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী। তিনি নিজের কাছে কিছু থাকলে কাউকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। তিনি একসময় ইয়েমেনি একটা পোশাক পরেছিলেন। একজন এসে পোশাকটা চাইলে তিনি বাড়িতে গিয়ে সেটি খুলে ফেলন। এরপর সেটি লোকটির কাছে পাঠিয়ে দেন। তার কাছে কেউ কিছু চাইলেই তিনি তা দিয়ে দিতেন। একবার এক লোক তার কাছে এসে ছাগল চাইলে তিনি তাকে প্রচুর পরিমাণে ছাগল দিয়েছিলেন, যা দুই পাহাড়ের মধ্যকার স্থান পূর্ণ করে ফেলবে। এরপর লোকটা নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ (সা.) এত বেশি পরিমাণে দান করেন, কখনও দরিদ্রতার ভয় করেন না।

লজ্জাশীলতা : হজরত আবু সাইদ খুদরি (রা.) বলেন, ঘরের ভেতরে অবস্থানকারিণী কুমারী মেয়ের চেয়েও রাসূল (সা.) বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি কোনো কিছু দেখে অপছন্দ করতেন, তখন তার চেহারা দেখেই আমরা বুঝতে পারতাম। (বোখারী-৬১০২, ৩৫৬২, ৬১১৯, মুসলিম-২৩২০)।

নম্রতা : রাসূল মুহাম্মদ (সা.) যখন মক্কা বিজয় করে বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করছিলেন, তখন আল্লাহ তায়ালার সামনে বিনম্রতায় এতটাই অবনত হয়েছিলেন, তার দাড়ি তার বাহন উটটির চুটকে স্পর্শ করার উপক্রম হয়েছিল। অথচ তখন তিনি ছিলেন এমনই এক পরিস্থিতিতে, যখন অধিকাংশ রাজা-বাদশাহ ও মনীষী স্বভাবতই অহঙ্কার করে থাকে।

ন্যায়বিচার : প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ন্যায়বিচারের অনেক প্রমাণ রয়েছে। তন্মধ্যে এখানে মাখজুমি গোত্রের এক মহিলার ঘটনা উল্লেখ করব। চুরির কারণে তার ওপর শাস্তিস্বরূপ হাত কাটার বিধান বাস্তবায়ন করাটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা মহিলা ছিল উচ্চবংশীয়। সাহাবীরা তার ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্য রাসূল (সা.)-এর কাছে তার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হজরত উসামা (রা.)-কে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি সুপারিশ করলে রাসূল (সা.) তাকে বলেছিলেন, 'তুমি কি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত করে দেয়া শাস্তি সম্বন্ধে সুপারিশ করছ?' তারপর তিনি বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতায় বললেন, 'হে মানুষেরা! তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা সম্মানী বংশের কেউ চুরি করলে তাদের ছেড়ে দিত এবং দুর্বলরা চুরি করলে তাদের ওপর শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদ (সা.)-এর মেয়ে ফাতেমাও চুরি করত, তবুও মুহাম্মদ (সা.) তার হাত কেটে দিতেন।' (বোখারী-৬৭৮৮, মুসলিম-১৬৮৮)।

দোষ প্রকাশ না করা : হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.)-এর কাছে কোনো ব্যক্তির অপছন্দনীয় কোনো কাজের সংবাদ এলে তিনি বলতেন না, অমুকের কী হলো যে এমন কথা বলছে? বরং বলতেন, কওমের কী হয়েছে যে, তারা এমন এমন কাজ করে কিংবা এমন এমন কথা বলে? তিনি নিষেধ করতেন; কিন্তু কে দোষের কাজটি করেছে, তার নাম নিতেন না। (উয়ুনুল আসার : ২/৩৯৯)।

সাধারণ জীবনযাপন : হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) নলখাগড়া জাতীয় গাছের পাতা দিয়ে তৈরি করা বিছানায় ঘুমিয়েছিলেন। এতে তার শরীরে দাগ হয়ে গেলে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমরা আপনার জন্য ভালো কোনো বিছানার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন, আমার দুনিয়ার প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই। আমি দুনিয়ায় একজন পথচারী ছাড়া আর কিছুই নই। যে পথচারী একটা গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে একটু পরে সেটা ছেড়ে চলে যায়। (তিরমিজি-২৩৭৭)।

অধীনস্তদের প্রতি সদয় : হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ১০ বছর সেবা করেছি। আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে কখনও উফ (ধমক বাচক শব্দ) পর্যন্ত বলেননি। আর তিনি আমাকে কোনো কাজের

জন্য বলেননি– কেন এমন করলে এবং এমন কেন করলে না? (মুসলিম-২৩০৯)।
লেখক : সাংবাদিক।

ভ্রাতৃত্বের মহামিলন

-ড. মুহা. বিলাল হুসাইন

হজ ইসলামের পাঁচটি মৌলিক ইবাদতের অন্যতম একটি বুনিয়াদ, যার মাধ্যমে মুসলিমবিশ্ব এক পতাকাতলে প্রবেশ করতে সবচেয়ে বড় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। হজ আরবি শব্দ, যার শাব্দিক অর্থ সঙ্কল্প বা ইচ্ছা করা। একজন মুসলমানকে আর্থিক সঙ্গতিসাপেক্ষে আল্লাহর কাছাকাছি যাওয়ার লক্ষ্যে, ইসলামের সুমহান বুনিয়াদ আদায়ের চেষ্টাকে সামনে রেখে বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহামিলন বা সেতুবন্ধ বিনির্মাণে কা'বাঘর জিয়ারত খুবই গুর"ত্বপূর্ণ। এটি এমন একটি বুনিয়াদ যা সবার ওপর ফরজ নয়। হজরত ইবরাহিম (আ.) থেকে শুর" করে হজের এই রীতি যুগ যুগ ধরে চলমান। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে হজরত ইবরাহিম (আ.) পৃথিবীর মানুষকে আহ্বান করেছিলেন কা'বাঘরে এসে হজ আদায় করতে। আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়টি কুরআন মজিদে এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'মানুষের নিকট হজের ঘোষণা করে দাও, তাহলে তারা পদব্রজে এবং সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্টের পিঠে চড়ে পৃথিবীর দূর-দূরান্ড় থেকে আসতে থাকবে। এখানে এসে তারা দেখতে পাবে তাদের জন্য কত লাভের ব্যবস্থা রয়েছে। আর তারা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নামে কুরবানি করবে। তা থেকে নিজেরাও খাবে এবং দুস্থ ও অভাবগ্রস্ড়কেও খেতে দেবে।' (সূরা হজ : ২৭-২৮)।

পৃথিবীর প্রথম ঘর মসজিদুল হারাম বা কা'বাঘর। সে কথা পবিত্র কুরআন মজিদেও পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় সর্বপ্রথম ঘর যা জনগণের জন্য নির্মিত হয়েছে, তা হলো মক্কার কা'বাঘর যা অত্যন্ড় পবিত্র, বরকতময় ও বিশ্ববাসীর জন্য পথপ্রদর্শকের কাজ করে।' (সূরা আলে ইমরান : ৯৬)।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর নির্মাণ করেছিলেন হজরত আদম (আ.)। তিনি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে মক্কায় প্রথম এই ঘর নির্মাণ করেন। তাঁর চল্লিশ বছর পর যখন তিনি জের"সালেম গেলেন, সেখানে তিনি মসজিদুল আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন। হজরত নূহ (আ.)-এর সময় মহাপ্লাবনে এ দু'টি ঘরই বিধ্বস্ড় হয়ে যায়। অতঃপর হজরত ইবরাহিম (আ.) যখন নবুয়্যতপ্রাপ্ত হলেন এবং প্রচলিত মূর্তিপূজার অসারতা প্রমাণ করে আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহপ্রদত্ত দীনের দিকে আহ্বান করলেন। যখন কাফের ও অহঙ্কারী বাদশাহ নমরূদ তাকে কঠিন অগ্নিকুে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহ তায়ালার অপার কর"ণায় এ বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে হজরত ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাইল (আ.) দুই পিতা-পুত্র মিলে কা'বাঘর পুনঃনির্মাণ করলেন, যা হজরত আদম (আ.) কর্তৃক নির্মিত প্রথম ঘরেরই চিহ্নের ওপর ভিত্তি করে। আর এ চিহ্ন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দেখিয়েছিলেন। (ঈমান ও ইসলাম : ২৪৩)।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সে কথা উল্লেখ করেছেন, 'এবং স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহিমের (আ.) জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের স্থান এবং বলেছিলাম যে এখানে কোনো প্রকার শিরক করো না। আর আমার এ ঘরকে তাওয়াফকারী ও সালাত আদায়কারীদের জন্য পাক সাফ করে রাখ।' (সূরা হজ : ২৬)।

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, হজ ইসলামের একটি গুর"ত্বপূর্ণ বুনিয়াদ। হজের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আত্মশুদ্ধি এবং পাপমুক্ত হয়ে নিরহঙ্কার জীবনযাপন করা। তাই আকার, আকৃতি, প্রকৃতি, পেশা, বর্ণ, ভাষায় পার্থক্য সত্ত্বেও সব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলপ্রেমিক হাজীদের মধ্যে অভিন্ন চেতনা লক্ষণীয়। কারো মধ্যে নেই হিংসা-বিদ্বেষ, আভিজাত্যের অহঙ্কার। আমিত্ব ও স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে হজের সময় প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অগণিত মুসলমান মক্কায় সমবেত হন। যাদের মধ্যে থাকে আল্লাহর প্রেম ও খালিক মালিকের প্রতি ভয়। যাদের অন্ড়রের কামনা এক, পরনের কাপড় এক, সারি সারি দৃশ্য একই রকমের, তাদের গন্ড়ব্য এক, মুখে উচ্চারিত ধ্বনি এক, লাব্বাইক আলাহুম্মা লাব্বাইক লা-শারিকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা আল-মুলকা লা-শারিকা লাকা- আমি হাজির, হে আল্লাহ আমি হাজির, তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি, তোমার কোনো শরিক নেই, আমি এক আল্লাহর কাছে হাজির হয়েছি। সমস্ড় প্রশংসা আর যত নিয়ামত সব তোমারই এবং তুমিই সব কিছুর মালিক। তোমার কোনো শরিক নেই। হজ বিশ্বভ্রাতৃত্বের অন্যতম মিলনমেলা। কেননা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন আকৃতির, বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন বয়সের মানুষ একত্রিত হয়ে যখন আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করে এবং সুবিশাল আরাফাত ময়দানে লাখ লাখ সম্মানিত হাজী সাহেব সমবেত হয়ে একাত্মতা ঘোষণা করেন, তখন মুসলিম ভ্রাতৃত্বের পূর্ণরূপ প্রকাশিত হয়। তারপর হজযাত্রীরা আরাফাত থেকে মুজদালিফায় পৌঁছে সাফা-

মারওয়া সায়ি করেন। মিনাতে গিয়ে পশু কুরবানি করেন হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর পুত্র কুরবানির ও ত্যাগের আদর্শ নিজেদের মানসপটে জাগ্রত করেন।

হজ সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের জন্য এক বড় নিয়ামত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশে ওই ঘরের হজ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য।' (সূরাহ আলে ইমরান : ৯৭)। কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলমানরা নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হন। দুনিয়ার কোনো ক্ষেত্রে এ ধরনের দৃষ্টান্ড় নেই। তাওহিদে বিশ্বাসী বিশ্বের ইসলামপ্রিয় মানুষ মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাজির হয়ে পূর্ণ আত্মসমপর্ণের আদর্শ কায়েম করেন। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের লাখো হজযাত্রী পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরো শক্তিশালী করতে পারে। এর মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর অমোঘ বাণী 'প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই' সে দৃশ্য অবলোকন করার সুযোগ পায়। গড়ে উঠতে পারে বিশ্বমুসলিম সমাজের অনন্য ভ্রাতৃত্ব। এটি সার্থক ও কার্যকর করতে হলে মুসলিম শাসকবর্গের একত্র হওয়া আবশ্যক ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের রাষ্ট্রপ্রধান ও তাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিগণ সেখানে একত্রিত হয়ে বিভিন্ন সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। ইসলামী বিধানের আলোকে দিতে পারেন তার সমাধান আর অন্যায়-অত্যাচারের বির"দ্ধে র"খে দাঁড়াবার বলিষ্ঠ দিকনির্দেশনা।

হজের এ অনন্য আয়োজন মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য তৈরি করে। ঐক্য মুসলমানদের প্রত্যেকটি বিজয়ের পেছনে এটি গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। হজের মাধ্যমে মুসলমানরা এটি ধারণ করতে পারে। হজ প্রত্যেক বছর একবার অনুষ্ঠিত হওয়ায় বিশ্ব মুসলিম জনতার মধ্যে কোনো রকম ভুল বোঝাবুঝি হলে তা নিরসন করার সুযোগ তৈরি করে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার মানুষের আচরণ জানার সুযোগ হয়। এত বড় আয়োজন করতে গিয়ে মুসলমানদের বড় ধরনের কোনো সমস্যাও তৈরি হয় না। কোনো নোটিশ দিতে হয় না, ঢাকঢোল পিটাতে হয় না, প্রচারপত্র বিলি করা লাগে না, কখন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে সে ব্যাপারে ধারণা দেয়া লাগে না। আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ব্যবস্থা বলে সকলেই দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে নেয়। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সকল মুসলমানের জন্য একক এ ধরনের ব্যবস্থা না থাকলে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বিশ্বমুসলিম সম্মেলন কিছুতেই সম্ভব হতো না।

হজের মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিম তাওহিদি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী আইন-কানুন মেনে চলার শপথ নেয়। আল্লাহর বাণীর ধারকবাহক হন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা আল্লাহর রজ্জু একত্রিত হয়ে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর আর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।' (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)। এ দৃশ্য বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিতে চান। আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে নিজের জানমাল কুরবানি করার মানসিকতা তৈরি করেন। নিজেকে পাপমুক্ত করতে চান। রাসূল (সা.) বলেছেন, যে হজের উদ্দেশে এ ঘরে আগমন করে, কোনো নির্লজ্জ কথা না বলে এবং ফাসেকি না করে, সে নবজাতক শিশুর মতো নিস্পাপ হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। (বুখারি ও মুসলিম) হজের মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে সংঘাত, অশান্ড়ির পরিবর্তে সৌভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, শৃঙ্খল, ঐক্য সংহতি প্রতিষ্ঠিত হোক– এটাই মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করছি।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

নজরুল কাব্যে রাসূলপ্রেম

-মির্জা মুহাম্মদ নূরুন্নবী নূর

ইসলাম আল্লাহ তায়ালার একমাত্র মনোনীত জীবনব্যবস্থা। পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামে অনন্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ইসলামের সুমহান সব নির্দেশনাকে সর্বস্ড়রের লোকজনের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য যুগে যুগে দুনিয়ার বুকে প্রেরিত হয়েছেন অসংখ্য নবী এবং রাসূলগণ। যাঁরা পথভোলা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য জীবনভর কাজ করে গেছেন। সময় দিয়েছেন অকাতরে। একান্ড় আপনার করে। এসব নবীর মধ্যে অন্যতম একজন হলেন আমাদের প্রিয়নবী ও রাসূল হজরত মুহাম্মদ (সা.)। যে রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করা প্রতিটি মুমিনের জন্য যেমন জর"রি, ঠিক তেমনি তাঁকে ভালোবাসাও ঈমানের দাবি। রাসূলপ্রেম আমাদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদ মুমিনের বিশাল পাওয়া।

রাসূলগণের প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়েছেন কবি সাহিত্যিকরাও। কবিরাও লিখেছেন কবিতা, রচিয়েছেন গান এবং সৃষ্টি করেছেন সাহিত্যের বিশাল ভা"ার। আল্লামা ইকবাল, শেখ সাদী এবং র"মীদের মতো কবিগণ রাসূলপ্রেমে আকুল হয়েছেন। রচিয়েছেন সাহিত্যের বিশাল ভা"ার। রেখে গেছেন অনবদ্য রচনাসম্ভার। রাসূলপ্রেমে আকুল হয়েছেন আমাদের বাঙালি কবিরাও। তারাও রচনা করেছেন সাহিত্যসম্ভার। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজর"ল ইসলামও পিছিয়ে নেই সেই কাতার থেকে। প্রিয় কবির রচনা থেকে তার কিছুটা তুলে ধরার প্রয়াস পাব আলোচ্য রচনায়।

পৃথিবী তখন নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত। জাহেলিয়াতের অন্ধকারে জ্ঞানশূন্য মানুষ। মানুষ তখন পশুর চেয়েও নিচে নেমে গিয়েছিল। মানুষ আর পশুর মাঝে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। এমন সময় প্রয়োজন ছিল অহির জ্ঞানের। দরকার ছিল একজন রাসূলের। আল্লাহ তায়ালা পথহারা বিপথগামী মানুষকে সুপথে নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করলেন নবীকুলের শিরোমণি শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে। তাঁর আগমনে ধন্য হলো পৃথিবী। পুলকিত হলো বিশ্বজাহানের সৃষ্টিজগৎ। আমাদের জাতীয় কবির ভাষায়–

ত্রিভূবনের প্রিয় মুহাম্মদ
এলো রে দুনিয়ায়।
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস,
দেখবি যদি আয়॥
ধূলির ধরা বেহেশতে আজ
জয় করিল, দিল রে লাজ,
আজকে খুশির ঢল নেমেছে ধূসর সাহারায়॥
দেখ আমিনা মায়ের কোলে
দোলে শিশু ইসলাম দোলে,
কচি মুখে শাহাদাতের বাণী সে শোনায়॥
আজকে যত পাপী-তাপী
সব গুনাহের পেল মাফী
দুনিয়া হতে বেইনসাফী
জুলুম নিল বিদায়॥
নিখিল দরূদ পড়ে লয়ে ও-নাম-
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
জ্বীন-পরী ফেরেশতা সালাম
জানায় নবীর পায়॥

রাসূলের আগমনে আন্দোলিত হয় বিশ্বজগৎ। খুশির ঢল নামে সারা দুনিয়ার পরতে পরতে। ধূলির দুনিয়া সেদিন বেহেশতে পরিণত হয়েছিল। ধূসর সাহারায় নেমেছিল খুশির বান। কচি মুখে নবী গেয়েছিলেন পবিত্র শাহাদাতের বাণী। পাপ-পংকিলতার ভারে ন্যুব্জ বেইনসাফী জুলুমবাজরাও নিয়েছিল বিদায়।

রাসূলের আগমনে ধরার বুকে রহম নেমে এসেছিল। বেইনসাফী দূরীভূত হয়েছিল। ঊষার কোলে রাঙা রবির দোল নেমেছিল। শাহাদাতের বাণী ঠোঁটে কুল মাখলুকাতের বিজয় ধ্বনি গেয়েছিলেন তিনি। আকাশ, গ্রহ, তারকারাজিরা যেন আনন্দে লুটে পড়েছিল। বেহেশতের সব দুয়ার খুলে দিয়ে ফেরেশতারাও গেয়ে উঠেছিলেন দরূদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কবির ভাষায়–

তোরা দেখে যা, আমিনা মায়ের কোলে।
মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে॥
যেন ঊষার কোলে রাঙা রবি দোলে॥
কুল মখলুকে আজি ধ্বনি ওঠে, কে এলো ঐ,
কালেমা শাহাদাতের বাণী ঠোঁটে, কে এলো ঐ,
খোদার জ্যোতি পেশানিতে ফোটে, কে এলো ঐ,
আকাশ গ্রহ তারা পড়ে লুটে, কে এলো ঐ,
পড়ে দরূদ ফেরেশতা বেহেশতে সব দুয়ার খোলে॥
মানুষে মানুষে অধিকার দিল যে জন,
'এক আল্লাহ ছাড়া প্রভু নাই' কহিল যে জন,
মানুষের লাগি চির-দীন বেশ নিল যে জন,
বাদশা ফকিরে এক শামিল করিল যে জন,
এলো ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী,
ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি,
আজি মাতিল বিশ্ব-নিখিল মুক্তি-কলরোলে॥

নবীর জয়গানে আনন্দের জোয়ারে মেতে উঠেছিল বিশ্বজাহান। নেচে উঠেছিল কুল মাখলুকাত। ব্যথিত মানবের হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ খেলে গিয়েছিল। বিশ্বনিখিল মুক্তির কলরোলে উল্লসিত হয়েছিল। এমনই একজন নবীকে ইসলামের সওদাগর বলেছেন আমাদের জাতীয় কবি। কবির ভাষায়–

ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর।
বদনসীব আয়, আয় গুনাহগার, নতুন করে সওদা কর॥
জীবন ভরে করলি লোকসান, আজ হিসাব তার খতিয়ে নে,
বিনি-মূলে দেয় বিলিয়ে সে যে বেহেশতি নজর॥
কুরআনের ঐ জাহাজ বোঝাই হীরা মুক্তা পান্নাতে,
লুটে নে রে লুটে নে সব ভরে তোল তোর শূন্য ঘর॥
কালেমার ঐ কানাকড়ির বদলে দেয় এই বণিক
শাফায়াতের সাত রাজার ধন, কে নিবি আয় ত্বরা কর॥
কিয়ামতে বাজারে ভাই মুনাফা যে চাও বহুৎ,
এই ব্যাপারীর হও খরিদ্দার, লওরে ইহার সীলমোহর॥
আরশ হতে পথ ভুলে এ এলো মদিনা শহর,
নামে মোবারক মুহাম্মদ, পুঁজি আল্লাহু আকবর॥

সত্যিই দ্বীন ইসলামের সওদাগর ছিলেন আমাদের প্রিয় রাসূল। তিনি আল কুরআনের জাহাজবোঝাই যেসব হীরা-মুক্তা আর পান্নার সমাহার ঘটিয়েছেন, তা বিস্ময়কর! কালেমা শাহাদাতের কানাকড়ির বিনিময়ে তিনি পরকালের মুক্তির জন্য শাফায়াতের যে সাত রাজার ধন এনেছিলেন তা অকল্পনীয়। কিয়ামতের মুনাফা সংগ্রহে তাঁর সেই সওদাগরী ব্যবসা সফল হয়েছিল। আমরা সেই বণিকের খরিদ্দার এখন।

দ্বীনের আহ্বানে জীবন বিলিয়ে দিলেন প্রিয়নবী। তাঁর আদর্শের লালন করতে পারলে পরকালে নাজাত নিশ্চিত। প্রিয়নবীর নামের স্রোতে আমরা ভেসে বেড়াই জান্নাতী ভেলায়। কবি প্রিয়নবীকে তৌহিদের মুর্শিদ বলেছেন। কবি রাসূল নামের রশি ধরে আল্লাহর দেয়া জীবনপথে এগিয়ে যান। কবির ভাষায়–

তৌহিদের মুর্শিদ আমার মুহাম্মদের নাম
মুর্শিদ মুহাম্মদের নাম।
ঐ নাম জপিলেই বুঝতে পারি খোদাই কালাম
মুর্শিদ মুহাম্মদের নাম॥
ঐ নামেরই রশি ধরে যাই আল্লাহর পথে,
ঐ নামেরই ভেলায় চড়ে ভাসি নূরের স্রোতে,
ঐ নামেরই বাতি জ্বেলে দেখি লোহ আরশ-ধাম
মুর্শিদ মুহাম্মদের নাম॥
ঐ নামের দামান ধরে আছি, আমার কীসের ভয়,
ঐ নামের গুণে পাব আমি খোদার পরিচয়,
তাঁর কদম মোবারক যে আমার বেহেশতি তঞ্জাম
মুর্শিদ মুহাম্মদের নাম॥

কবির ভালোবাসা অকৃতিম। কবি রাসূলকে ভালোবেসেছেন ঈমানের দাবি পূরণ করে। ঈমানের হক আদায় করে। রাসূলের নাম জপে কবি সকল প্রকারের ভয় থেকে নিরাপদে থাকতে চেয়েছেন। আমরাও কবির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে এগিয়ে যেতে চাই সামনে। শান্তির মঞ্জিল পানে।

কবি রাসূলের নাম যত বেশি করে স্মরণ করেন, তত বেশি সুখ পান হৃদয়-মনে। কবি রাসূলের নামে মধু খুঁজে পান, পান হৃদয়ের প্রশান্তি। রাসূল কবির প্রিয়তম অন্যতম একজন। কবি নিত্যদিন রাসূলের নাম স্মরণ করে তৃষ্ণা নিবারণ করতে চান। কবির ভাষায়–

মুহাম্মদ নাম যতই জপি, ততই মধুর লাগে।
নামে এতো মধু থাকে, কে জানিত আগে॥
ঐ নামেরই মধু চাহি
মন-ভোমরা বেড়ায় গাহি,
আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি

ঐ নামের অনুরাগে
ও নাম প্রাণের প্রিয়তম,
ও নাম জপি মজনু-সম,
ঐ নামে পাপিয়া গাহে
প্রাণের গোলাপ বাগে॥
আমি ঐ নামে মুসাফির-রাহি,
তাই চাই না তখন শাহানশাহী,
নিত্য ও-নাম ইয়া এলাহী
যেন হৃদয়ে জাগে॥

রাসূলকে ভালোবাসা ঈমানের দাবি। রাসূলকে ভালোবাসতে না পারলে ঈমানের পূর্ণতা আসে না। রাসূল আমাদের একমাত্র পথ প্রদর্শক। নাজাতের পথ কেবলমাত্র তাঁর থেকেই পাওয়া যাবে। দুঃখ জ্বালা, মানসিক বা ঈমানী দুর্বলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় রাসূলের আদর্শ মেনে জীবন গঠন করা। জীবন পরিচালনা করা। কবি নিজের জীবনে এমন কিছুই পাওয়ার আকুতি জানিয়েছেন তাঁর কবিতায়। কবির লেখা গানে। কবির ভাষায়–

ইয়া মুহাম্মদ, বেহেশত হতে
খোদায় পাওয়ার পথ দেখাও।
এই দুনিয়ার দুঃখ থেকে
এবার আমায় নাজাত দাও॥
পীর-মুর্শিদ পাইনি আমি
তাই তোমায় ডাকি দিবস-যামী,
তোমারই নাম হউক হযরত
আমার পর-পারের নাও॥
অর্থ-বিভব যশ-সম্মান
চেয়ে চেয়ে নিশিদিন
দুঃখ-শোকে জ্বলে মরি,
পরান কাঁদে শান্ড়িহীন।
আল্লাহ ছাড়া ত্রিভুবনে
শান্ড়ি পাওয়া যায় না মনে,
কোথায় পাব সে আবেহায়াত-
ইয়া নবী, রাহ বাতাও॥

কী আবেগ আর অনুভূতি নিয়ে গান লিখলেন প্রিয় কবি কাজী নজর"ল ইসলাম। কবি রাসূলের প্রেমে দিওয়ানা হন, রঙিন হয় কবির আঁখিযুগল। কবি শবে-কদর রাতে আল কুরআনের গজল গেয়ে প্রশান্ড়ি পান, শান্ড়ি পান হৃদয়মনে। কবি রাসূলের আদর্শের বিজয় দেখেছেন একান্ড় আপনার করে। যে বিজয়ী আদর্শে অনুপ্রাণিত হন বার বার। প্রতিনিয়ত। প্রতিক্ষণে। কবি বেলালের আযান শুনেন তাঁর কবিতায়। গানের পরতে পরতে। কবির ভাষায়–

এ কোন মধুর শারাব দিলে আল-আরাবি সাকি।
নেশায় হলাম দিওয়ানা যে, রঙিন হল আঁখি।
তৌহিদেরই শিরাজী নিয়ে
ডাকলে সবায় যা রে পিয়ে।
নিখিল জগৎ ছুটে এলো,
রইলো না কেউ বাকি॥
বসল তোমার মাহফিল দূর মক্কা-মদীনাতে,
আল কুরআনের গাইলে গজল শবে-কদর রাতে।
নর-নারী বাদশা ফকির
তোমার রূপে হয়ে অধীর
যা ছিল নজরানা দিল
রাঙা পায়ে রাখি॥

তোমার কাসেদ খবর নিয়ে ছুটল দিকে দিকে,
তোমার বিজয়-বার্তা গেল দেশে দেশে লিখে।
লা শরিকের জলসাতে তাই
শরিক হলো এসে সবাই,
তোমার আজান-গান শুনাল
হাজার বেলাল ডাকি৷৷

রাসূল প্রেমের কী আকুতি কবির। কী অনুপ্রেরণা তাঁর। কবির এ আকুতি কবুল করুন আল্লাহ তায়ালা। কবিকে তাঁর জীবনের ভুলগুলো ক্ষমা করে জান্নাতবাসী করে দিন মহান রাব্বুল আলামিন। কবির রাসূল প্রেমের এই আবেগ আর অনুভূতি আজ আমাদের প্রাণে প্রাণে দোল খায়। প্রেরণা জোগায়। ঈমানের তেজে বলিয়ান হতে অনুপ্রাণিত করে। আবেগে আপ্লুত হই হৃদয় মেলে। রাসূল প্রেমের এই অনুভূতি কবিকে দেখা করার সুযোগ করে দিন প্রিয় রাসূলের সাথে। রাসূলপ্রেমের এই অনুভূতির ফলে কবির পরকালীন জীবন হোক ধন্য। মুক্তির পথ খুঁজে পাক কবর দেশের জমিনে। কবি জান্নাতের পাখি হয়ে ফুল কাননে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পাক আপনার আত্মার শান্তির জন্য। কবির এই রাসূলপ্রেম জাগ্রত হোক আমাদের প্রাণে প্রাণে। নবজাগরণে। আত্মার শিহরণে।

লেখক : প্রবন্ধকার।

বিশ্বনবী (সা.)-এর প্রেমিক যাঁরা

-মুফতি মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

মহানবী (সা.)-এর সাথে মুমিনের ঈমানী সম্পর্ক। তাঁকে ভালোবাসা, তাঁর আদেশ-নিষেধ মান্য করা এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণ করা একজন মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য। তবে প্রিয়নবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা, তাঁর আদর্শ গ্রহণ করা হতে হবে অকৃত্রিম ও লৌকিকতা মুক্ত। যেমন ভালোবেসেছিলেন সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী ও অলীগণ। রবিউল আউয়াল মাস আসলেই মুমিনের হৃদয়কে নাড়া দেয়। কারণ এ মাসে পৃথিবীতে আগমন করেছেন নবীকুল শিরোমণি, বিশ্বনবী, দোজাহানের সর্দার হজরত মুহাম্মদ (সা.)। এ মাসে নবীপ্রেমিকরা ইসলামী সংগীত, গজল, মিলাদ মাহফিল, ওয়াজ-নসিহত, মিলাদুন্নবী (সা.), সিরাতুন্নবী (সা.) ইত্যাদি আলোচনার মাধ্যমে প্রিয়নবীকে স্মরণ করে থাকেন। তাঁর প্রেম ভালোবাসার যথার্থতা কোন কোন কাজে নিহিত সে সম্পর্কেও জানা আবশ্যক। প্রিয়নবী (সা.)-এর খাঁটি প্রেমিকগণ নিম্ন বর্ণিত কাজসমূহ করে থাকেন–

১. সবকিছুর ওপর রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে প্রাধান্য : আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবীবকে পূর্বের এবং পরের সকল সৃষ্টির ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। রাসূল (সা.) বলেছিলেন, আমি আদম সন্তানের সর্দার এতে আমার কোনো গর্ব নেই, আমাকে প্রথমে কবর থেকে উঠানো হবে, আমি প্রথম সুপারিশকারী এবং প্রথমে আমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। সুতরাং মুমিনদের কর্তব্য হবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে প্রাধান্য দেয়া। সবকিছুর ওপর তাকে স্থান দেয়া। হজরত আবু সুফিয়ান মুসলমান হওয়ার পূর্বে একদা স্বীয় কন্যা উম্মুল মুমিন হজরত উম্মে হাবিবা (রা.)-এর সাথে দেখা করতে মদীনায় আগমন করেন। হজরত আবু সুফিয়ান (রা.) গৃহে গিয়ে রাসূল (সা.)-এর বিছানায় বসতে উদ্ধত হলে তার কন্যা তাকে বসতে বারণ করেন। আবু সুফিয়ান বললেন, হে কন্যা! আমার জন্য এ বিছানা উপযুক্ত মনে করছো না, নাকি এ বিছানার জন্য আমাকে উপযুক্ত মনে করছো না। কন্যা বললেন, এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিছানা। আর আপনি হলেন মুশরিক (অপবিত্র)। আল্লাহর রাসূলের বিছানায় মুশরিকের বসা আমি পছন্দ করি না। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরাম রাসূল (সা.)-এর সম্মান, তাঁর কষ্ট লাঘব ও আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে সদা পাগলপারা ছিলেন।

২. রাসূলের দরূদ পাঠ : (ক) নবীপ্রেমিক সদা তাঁর যথাযথ গুণকীর্তণ করেন, তাঁর প্রতি দরূদ পেশ করেন। এরশাদ হয়েছে, অবশ্যই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, নবীর প্রতি সালাত পেশ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করো। (সূরা আহযাব : ৫৬)। আল্লাহ তায়ালা এখানে আমরের শব্দ (নির্দেশমূলক) শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমরের (নির্দেশমূলক) শব্দ ওয়াজিবকে কামনা করে। তাই রাসূল (সা.) বলেছেন, ঐ ব্যক্তি কৃপণ, যার সামনে আমার আলোচনা করা হচ্ছে, কিন্তু সে আমার প্রতি দরূদ পড়ে না (তিরমিযী- ৫/৫৫১)। রাসূল (সা.) অন্যত্র বলেছেন, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামিশ্রিত হোক, যার সামনে আমার আলোচনা করা হয়, কিন্তু আমার প্রতি দরূদ পড়ে না (আহমদ)। অনেক ইবাদতে দরূদ শরীফ পড়া হয়। যেমন– নামাজে, খুতবায়, জানাজায়, আযানের পর, দোয়ার সময় ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

৩. অধিক হারে তাঁর আলোচনা করেন এবং তাকে দেখার আগ্রহ পোষণ : ইবনে কাইয়েম বলেন, যখন প্রিয়জনের আলোচনা অধিক পরিমাণে করা হয়, তখন সে তার হৃদয়ে হাজির হয়। তাই মুমিন বান্দাহ প্রিয়নবী (সা.)-এর আলোচনা যত বেশি করবে, তার হৃদয়ে মহব্বত তত গভীর হবে।

৪. আদবের সাথে তাঁর আলোচনা : নবীপ্রেমিকগণ প্রিয়নবীর নাম ধরে আলোচনা না করে বরং গুণবাচক শব্দ নিয়ে তাঁর আলোচনা করেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মত গণ্য করো না। (সূরা নূর : ৬৩)। আল্লাহ তাঁর হাবীবকে পরিচয়দানের মাত্র চার জায়গায় 'মুহাম্মদ' নাম উল্লেখ করেছেন। এ জায়গাগুলো হলো– সূরা আলে ইমরান : ১৪৪, সূরা আহযাব : ৪০, সূরা মুহাম্মদ : ২ এবং সূরা আল ফাত্হ : ২৮। অন্যত্র মুয্যাম্মিল, মুদ্দাস্সির, ইয়াসিন ইত্যাদি ছদ্মনামে ডেকেছেন।

৫. তাঁর মসজিদের আদব রক্ষা : নবীপ্রেমিকগণ তাঁর রাওজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। সেখানে বাজে কথা বলে না, উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ করে না, অন্যকেও আওয়াজ করতে দেয় না। মসজিদে নববিতে দু'জন লোককে কথা বলতে দেখে হজরত ওমর (রা.) তাদের কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোথাকার লোক? তারা বলল, তায়েফের। হজরত ওমর (রা.) তখন তাদের বললেন, তোমরা এ শহরের হলে অবশ্যই তোমাদের শাস্তি দিতাম। তোমরা আল্লাহর রাসূলের মসজিদে আওয়াজ উচ্চ করছ। (সহীহ বুখারী ১/১২০)।

৬. তাঁর বাণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন : যারা বিশ্বনবীর প্রেমিক তাঁরা নবীর বাণীকে আদবের সাথে শ্রবণ করেন, হাদীসের পাঠে আদবের সাথে বসেন। হাদীসের রঙে নিজেকে রঙিন করার চেষ্টা করেন। ইমাম মালেক (রহ.) হাদীসের পাঠ দানের পূর্বে হাদীসের সম্মানার্থে অজু করতেন, উত্তম পোশাক পরতেন, টুপি পরতেন এবং দাড়ি আঁচড়াতেন।

৭. তাঁর বাণীকে সত্য বলে বিশ্বাস : ঈমানের মূল হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণীকে সত্য বলে বিশ্বাস এবং তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য বলে স্বীকার করা। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, 'নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়। তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কুরআন অহি, যা প্রত্যাদেশ হয়।' (সূরা আন-নাজম : ১-৪)।

৮. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা ও কাজ মেনে নেয়ার মূল হলো তার আনুগত্য করা। আল্লাহ তায়ালা আনুগত্য প্রসঙ্গে এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি রাসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহর হুকুম মান্য করলো। আর যে ব্যক্তি বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।' (সূরা আন নিসা : ৮০)। আরো এরশাদ করেন, বলুন! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার আনুগত্য কর, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ভালোবাসবেন।' (সূরা আলে ইমরান : ৩১)। অন্যত্র এরশাদ করেন, 'আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের।' (সূরা আলে ইমরান : ১৩২)।

৯. রাসূল (সা.)-কে সাহায্য-সহযোগিতা : রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সাহায্য করা, তাঁকে হেফাজত করা ইত্যাদি প্রসঙ্গে বহু আয়াত রয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, তারাই সত্যবাদী। (সূরা আল হাশর : ৮)। হজরত আবু তালহা (রা.) উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ঢালস্বরূপ হেফাহত করেছেন।

১০. সাহাবায়ে কিরামকে সম্মান : রাসূল (সা.) বলেন, আমার সাহাবীদের গালি দিও না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় কর, তারপরও তাদের সামান্য কাছে যেতে পারবে না। (মুসলিম)। রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার প্রত্যেকটি সাহাবী ন্যায়পরায়ণ। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রশংসা করেছেন, 'অবশ্যই আল্লাহ ঐসব মুমিনের প্রতি সন্তুষ্ট যারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছে। তিনি জানেন, তাদের অন্তরে কি রয়েছে। (সূরা আল ফাতহ : ১৮)। আল্লাহ তায়ালা আরো এরশাদ করেন, 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি বজ্র কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদের রুকু ও সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমন্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন।' (সূরা আল ফাতহ : ২৯)।

১১. রাসূল (সা.)-এর স্ত্রীদের সম্মান : রাসূল (সা.)-এর স্ত্রীগণ হলেন মুমিনদের মাতৃতুল্য। নবীপ্রেমিকগণ তাদের অবশ্যই ভালোবাসেন। ইমাম মালেক বলেন, যে ব্যক্তি হজরত আবু বকর (রা.)-কে গালি দেয়, তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। আর যে ব্যক্তি হজরত আয়েশা (রা.)-কে গালি দেবে তাকে হত্যা করা হবে। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, যে তাদের গালি দিল সে কুরআনের খেলাফ করলো। (আস সারেমুল মাসলুল : ৫৭১)। ইবনে কাসীর বলেন, ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কুরআন মজীদের আয়াত নাজিল হওয়ার পরে যে ব্যক্তি হজরত আয়েশা (রা.)-কে গালি দেয় সে কাফির। কারণ সে কুরআনকে বিশ্বাস করে না।

১২. তাঁর সুন্নাতকে হেফাজত করেন : সুন্নাতকে হেফাজত করার অর্থ হলো তাঁর সুন্নাতসমূহকে বিদআত থেকে মুক্ত রাখেন, সুন্নাত অনুযায়ী আমল করেন, পরিবর্তন পরিবর্ধন থেকে মুক্ত রাখেন, হুবহু অন্যের নিকট বর্ণনা করেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল রাখুন, যিনি আমাদের থেকে শুনে হুবহু অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে, অনেক শ্রবণকৃত ব্যক্তি শ্রবণকারী থেকে অধিক সংরক্ষণকারী হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার কথায় যে ব্যক্তি এসব কথা অন্তর্ভুক্ত করে যা আমার কথা নয় তা প্রত্যাখ্যাত। (বুখারী- ৩/ ১৬৭)।

১৩. তাঁর সুন্নতসমূহ প্রচার : মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসা ও সম্মান করার পূর্ণতা হলো তার সুন্নাতসমূহ প্রচার করার ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার থেকে একটি কথা জানলেও তা অপরের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। (সহীহ বুখারী- ৩ /১৪৫)। বিদায় হজের ভাষণের সর্বশেষ কথা ছিল- তোমরা যারা উপস্থিত তারা আমার কথাগুলো অনুপস্থিতদের পৌঁছিয়ে দাও। তাঁর এ কথা শুনে আরাফাত মাঠে উপস্থিত সোয়া লাখ সাহাবীর অধিকাংশই সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দাওয়াত পৌঁছাতে চলে যান। তাঁর সুন্নতসমূহ প্রচার করা এবং মানুষকে শিখানো তাঁকে ভালোবাসার অন্যতম নিদর্শন।

১৪. তাঁকে প্রেরণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন : আল্লাহ তায়ালা দীনকে বিজয়ী করার জন্য রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তায়ালার বাণী, 'তিনি আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যেন এ দীনকে অপরাপর দীনের ওপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।' (সূরা তাওবা : ৩৩)। অন্যত্র এরশাদ করেন, 'তিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত দীনের ওপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠারূপে আল্লাহই যথেষ্ট।' (সূরা ফাতহ : ২৮)। অতএব, একজন নবীপ্রেমিকের প্রধান ও একমাত্র কাজ হল দীনকে বিজয়ী করার নিমিত্তে সদা সক্রিয়ভাবে কাজ করা। যেমনটি করেছেন আমাদের প্রিয়নবীসহ অন্যান্য নবী-রাসূলগণ।

লেখক : শিক্ষক।

মদীনা সনদ : একটি পর্যালোচনা

-ফারুক আহমাদ

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের (সা.) মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সূরা আযহাব : ২১)। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, মানবীয় সব গুণের একমাত্র আধার সকল নবী-রাসূলের সর্দার, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)। মহান আল্লাহ তাকে ইনসানে কামিল হিসেবে বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক করে পাঠিয়েছেন এ ধরায়। মানবীয় সব গুণের আধার ছিলেন তিনি। শিশু মুহাম্মদ (সা.) আমিনার কোল থেকে হালিমার কোলে। সকল শিশুর জন্য তিনি আদর্শ। যুবক মুহাম্মদ হিলফুল ফুজুল সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বযুবকদের জন্য আদর্শ সংগঠকের পরিচয় দিলেন। চাচার সাথে সিরিয়ায় বাণিজ্যিক কাফেলায়, খাদিজার (রা.) ব্যবসায় পরিচালনায় সত্যনিষ্ঠ, দক্ষ, যোগ্য ব্যবসায়ী হিসেবে দুনিয়ার সকল বণিকের তিনি আদর্শ। খাদিজার (রা.) সংসারে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ আদর্শ স্বামী, আদর্শ-পিতা ও আদর্শ-সংসারী হিসেবে বিশ্বের মানুষের সামনে তিনি পরম অনুকরণীয়। সংসার বিরাগী হেরা গুহায় তিনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখ, আল্লাতে-বিলীন অতুলনীয় ধর্মীয় নেতা।

সমাজচ্যুত বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) হয়ে উঠলেন বিশ্বমানবতার ত্রাণকর্তা। শত্রুপরিবেষ্টিত মহানবী হয়ে উঠলেন সকল মানব হৃদয়ের ভালোবাসার অন্তহীন মনিমানিক্য। মক্কানগরী থেকে অত্যাচারিত হয়ে বিতাড়িত মহানবী হয়ে উঠলেন মক্কা নগরীর আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ শাসক। বদর, ওহুদ, খন্দক, তাবুকে তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি। হোদায়বিয়া সন্ধির ধারা-উপধারা আজো বিশ্বের তাবৎ রাজনীতিবিদদের ভাবিয়ে তোলে, মুহাম্মদ (সা.) কত বেশি দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ও সমরবিদ ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সে রক্তপাতহীন গণঅভ্যুত্থান আধুনিক কালের বিশ্ব বিজেতাদের অহমিকা চূর্ণ করে। মসজিদে নববীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক, মসজিদের খতিব ও ইমাম। আবার সেই ইমামই হলেন শ্রেষ্ঠ বিচারপতি। বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া থেকে গণতন্ত্রের জনক, গগনচুম্বী চিন্তানায়ক ও আদর্শের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনবী। দাসপ্রথা অবলুপ্তকারী ক্রীতদাসদের মুক্তিতে বিশ্বনবী চরম ও পরম গরিবের বন্ধু। প্রকাশ্য দিবালোকে রাষ্ট্রনায়ক থেকে রাতের নিঝুম প্রহরে সিজদায় অবনত বিশ্বনবী। এক কথায় মানুষের মাঝে বিকশিত হতে পারে এমন মৌলিক মানবীয় সব গুণের আধার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)।

মদীনা সনদের প্রেক্ষাপট : নবুয়্যত প্রাপ্তির পর চরম জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে তের বছর মক্কার প্রান্তরে প্রান্তরে, জনে জনে, দ্বারে দ্বারে তাওহীদের সুমহান দাওয়াত দিতে লাগলেন মহানবী (সা.)। জুলুম-নির্যাতন চরম অবস্থা ছাড়িয়ে যাওয়ায় তিনি প্রথম তাঁর সাহাবীদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। অতঃপর মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। নবুয়্যতের একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সনে মদীনা থেকে হজে আগত পাঁচজন, বারজন ও পঁচাত্তরজন মদীনাবাসী মীনার আকাবা নামক গুহায় রাসূল (সা.)-এর হাতে বাইয়াত হন। যাকে ঐতিহাসিক বাইয়াতে আকাবা বলা হয়। এসময়গুলোয় রাসূল (সা.) বলতেন, 'কে আছ আমাকে আশ্রয় দেয়ার? কে আছ আমাকে সাহায্য করার? যাতে আমি আমার রবের বার্তা পৌঁছে দিতে পারি। যে আমাকে সাহায্য করবে তাঁর জন্য জান্নাত রয়েছে।' বাইয়াতে আকাবার তৃতীয় দফায় যারা মক্কায় এলেন, তারা রাসূল (সা.)-কে মদীনায় স্বাগত জানালেন। মাসয়াব ইবনে উমাইর (রা.) গত দুই বছর মদীনায় দাওয়াতী কাজ করায় একটু পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে রাসূল (সা.) মদীনায় আসার, এমন সংবাদ পাওয়ার পর আল্লাহর নির্দেশে মদীনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত নিলেন।

তখনকার মদীনার পরিবেশ ও পরিস্থিতি : সে সময়ে মদীনার নাম ছিল ইয়াসরেব। রাসূল (সা.) হিজরতের পর এর নাম হলো মদীনাতুর রাসূল (সা.)। এরপর ইতিহাসে মদীনা নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। শুধু মদীনা নয়, তখনকার সময়ে গোটা আরব ছিল গোত্র শাসনে অভ্যস্ত। গোত্রপতি ছিলেন রাষ্ট্রপতি। তার নির্দেশ ছিল আইন ও সংবিধান। গোত্রবিদ্বেষ ছিল তাদের মজ্জাগত। সামান্য ব্যতিক্রম হলেই তলোয়ারই সমাধান। সামান্য কথায় যুদ্ধ বেধে যেত। চলত যুগ যুগান্তর। হারবুল ফুজ্জার তো মাত্র চল্লিশ বছর চলেছিল। তখনকার পরিবেশ এর চেয়ে মোটেই ভালো ছিল না। রাসূল (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন সেখানে বসবাসরত কতগুলো গোত্র ছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোত্রগুলো হলো–

১. বনু আমর বিন আওফ, ২. বনু সায়েদাহ, ৩. বনু হারেছ, ৪. বনু জুশাম, ৫. বনু নাজ্জার, ৬. বনু নাবিত, ৭. বনূ আওস, ৮. বনূ নজির, ৯. বনূ কোরায়জা, ১০. বনূ কায়নুকা, ১১. বনূ বাইয়াযাহ, ১২. বনূ সালেমাহ, ১৩. বনূ আব্দুল আশহাল, ১৪. বনূ জোফার, ১৫. বনূ জোরায়েক, ১৬. বনূ আওফ, ১৭. খাজরাজ।

উল্লিখিত গোত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এরা বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। এদের মধ্যে বড় একটা অংশ ইহুদি ধর্মাবলম্বী ছিল। তারা আবার শতাব্দী থেকে শতাব্দী বংশানুক্রমে শেষ নবীর অপেক্ষায় মদীনায় বসবাস করেন। এ গোত্রসমূহ ইয়েমেন থেকে মদীনায় বসবাস শুরু করে। তাদের তাওরাত কিতাবে শেষ নবীর হিজরত মদীনায় হবে এমন পূর্বাভাস পাওয়া থেকে।

মহানবী (সা.) আল্লাহর নির্দেশে মদীনায় হিজরত করলেন। মদীনা এসে পৌঁছলেন। এখন রাসূল (সা.)-কে ভাবতে হলো অনেক কিছু। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিছু কাজ তাকে করতেই হবে। এর মধ্যে ছিল তাঁর নিজের ও সঙ্গী-সাথী মুহাজিরদের নিরাপত্তা বিধান। মদীনা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান। ছোট্ট শহর মদীনা। নবাগত মুহাজির ও কপর্দকহীন মুসলমানদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের চিন্তা করতে হবে। নবাগত মেহমানদের জন্য স্থায়ী থাকা খাওয়ার আয়োজন। ছোট্ট শহর মদীনার ওপর প্রকট অর্থনৈতিক চাপ ছিল। তা সামাল দিয়ে ওঠা চারটিখানি কথা ছিল না। নিজের নিরাপত্তা, মুহাজিরদের নিরাপত্তা, নওমুসলিম আনসারদের নিরাপত্তা, মদীনা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, গোত্রে বিভক্ত বহুধা মত ও পথে বিভক্ত মানুষকে এক কেন্দ্রীয় শাসনে নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন একটি ইনসাফভিত্তিক চুক্তিনামা দলিল। এ চুক্তিনামায় স্বাক্ষরকারী সব পক্ষকে সমমর্যাদা দিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ প্রয়োজন। সে চুক্তিনামা, দলিল ও সনদই হলো পৃথিবীর প্রথম লিখিত সনদ বা সংবিধান। আর সে যুগে বহু পথ, মত ও ধর্মের মানুষদের সম্মিলনে একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা। আর পৃথিবীর সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতায় অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ (সা.) হলেন এ রাষ্ট্র ও সরকারের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হলেন এ রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান। তিনি প্রণয়ন করলেন মদীনা সনদ, যা ছিল পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান। আমরা এখন বিশ্লেষণ করে দেখব মদীনা সনদ, যা মানবতাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে মানবতার মুক্তি সনদ হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে সমাদৃত।

মদীনা সনদের ধারা-উপধারা : মদীনা সনদে স্বাক্ষরকারী পক্ষসমূহ; রাসূল (সা.) মদীনায় হিজরত করে দেখলেন, সেখানে অবস্থানরত ইহুদিদের অনেক ছোট ছোট গোত্র আছে। তন্মধ্যে বড় তিনটি গোত্র ছিল। বনূ নজির, বনূ কোরায়জা ও বনূ কায়নুকা। এরা মদীনার অধিবাসী। যদি তারা মদীনা সনদে স্বাক্ষর না করে, তাহলে ষড়যন্ত্র ও ফেতনা সৃষ্টি করে মদীনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। এতে রাষ্ট্র ও সরকার বেকায়দায় পড়বে। আর ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম ব্যাহত হবে। তাই রাসূল (সা.) তাদের মর্যাদা দিয়ে, মদীনার নাগরিক হিসেবে সমমর্যাদা দিয়ে মদীনা সনদে স্বাক্ষরে উদ্বুদ্ধ করেন। এ ইহুদিরা মদীনা সনদের একটি পক্ষ। মুসলমানদের মধ্যে আনসার সাহাবীরা বিভিন্ন গোত্র ও উপদলে বিভক্ত ছিল। বিশেষত আওস ও খাজরাজ গোত্র। তাদের মদীনা সনদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া খ্রিস্টানদের ছোট ছোট গোত্র ও প্রকৃতি পূজারী, অগ্নিপূজক, পৌত্তলিকদের ছোট ছোট গোত্রও এ সনদে স্বাক্ষরকারী। কুরাইশ মুসলমানগণ সনদে স্বাক্ষরকারী একটি পক্ষ। কুরাইশ ও ইয়াসরেবের মুসলমানদের অনুসারীগণ এক পক্ষ। এদের হালিফ বলা হতো।

সনদের ভূমিকা : সনদের সূচনা করা হলো বিসমিল্লাহ বলে। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার নিকট মহান আল্লাহর পরিচয়, সংক্ষেপে তাওহীদের দাওয়াত ও মহিমাময় আল্লাহর একত্ববাদের মহত্ত তুলে ধরা হলো। যে মহান আল্লাহর নামে এ সনদ শুরু হলো তাঁর বান্দাদের মাঝে এ সনদ ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। কোনোরূপ জুলম অত্যাচার ছাড়া এ সনদ বাস্তবায়িত হবে।

ভূমিকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী সব পক্ষের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে চুক্তির আওতাধীন সব পক্ষের মর্যাদা সমুন্নত হলো। আবার সব পক্ষ চুক্তি মানতে বাধ্য ও আন্তরিকভাবে মেনে নেবে প্রচ্ছন্নে এমন মনোভাব ফুটিয়ে তোলা হলো। সন্ধি চুক্তিতে সবাই স্বতঃস্ফূর্ত বলেও প্রতীয়মান হয়।

ভূমিকায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শুরুটা করা হয়েছে একথা বলে যে, 'হাযা কিতাবুন মিন মুহাম্মাদিন (সা.)' অর্থাৎ এটা মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে লিপিবদ্ধ ফরমান, সনদ, চুক্তি বা অর্ডিন্যান্স। এখানে দু'টি কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো এ সনদ লিখিত আকারে প্রণীত। মৌখিক বা তামাশাচ্ছলে বা আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি। যা হয়েছে, তা আলোচনা-পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে। সর্বোপরি এখানে ছিল অপঠিত প্রত্যাদেশ।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, মুহাম্মদ (সা.) যে নবগঠিত মদীনার অসাম্প্রদায়িক, গোত্রপ্রীতির ঊর্ধ্বে, ফেডারেল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান। চুক্তিবদ্ধ সব পক্ষ স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা মেনে নিয়েছেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সব নাগরিকের পক্ষ থেকে তিনি আনুগত্যের শপথ নিলেন। অর্ডিন্যান্সের ভাষা ছিল রাষ্ট্রপ্রধানসুলভ।

একটি শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাঁর মর্যাদা সমুন্নত হলো। এ সনদে স্বাক্ষরকারীরা মূলত মুহাম্মদ (সা.)-কে রাষ্ট্রপ্রধান মেনে নিয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। সে কঠিন বাস্তবতাই এখানে ফুটে উঠেছে। মুহাম্মদ (সা.) শুধু রাষ্ট্রপ্রধান নয়, বরং তিনি যে আল্লাহর নবী তাও এ চুক্তির মাধ্যমে সনদে স্বাক্ষরকারী সব পক্ষকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া হলো। অন্য কথায় তারা নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন এমন কথা মেনে নিলেন। এখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁর নবুয়্যতের স্বীকৃতি দেয়া হলো।

বিচক্ষণ মহানবী (সা.) তাঁর দূরদর্শিতার মাধ্যমে এ সনদে স্বাক্ষরকারীগণ ছাড়া ভবিষ্যতে কেউ যদি এ সনদের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় তাদের জন্য সে সুযোগ ও সনদের অন্তর্ভুক্তির দ্বার উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। সনদে বলা হয়েছে, 'ইহা আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা.) কুরাইশ ও ইয়াসরেবের মুমিন ও মুসলমান, তাদের অনুগত, তাদের সাথে সম্পৃক্ত ও তাদের পক্ষে জিহাদে অংগ্রহণকারীদের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি।' এখানে সনদে অন্তর্ভুক্তির জন্য সময় নির্ধারণ না করে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে– যাতে ভবিষ্যতে কেউ যদি মুমিনদের অনুসরণ করে এবং তাদের সাথে জিহাদে শরিক হয়, তাহলে তারা যে কোনো সময় সনদে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন এবং সনদে বর্ণিত নিরাপত্তা ও নাগরিক সুবিধাদি ভোগ করতে পারবে।

চুক্তির ধারাসমূহ : পৃথিবীতে প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে এ সনদে তখনকার সময়ের আর্থসামাজিক পরিবেশের আলোকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় এ সংবিধানের ধারা-উপধারাসমূহ আজও সমাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ। আন্তর্জাতিক পরিম"লে আজও সংবিধান বিশেষজ্ঞরা সংবিধান রচনাকালে মদীনা সনদের ধারাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করেন ও করতে পারেন। আমরা সংক্ষেপে কিছু ধারা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করব–

১. কিসাস (প্রাণদ"ে) ও রক্তপণ পূর্ব থেকে যে নিয়মে চলে আসছে, এখনও ন্যায়নীতি অনুসারে অনুরূপ নিয়মে বহাল থাকবে।

২. প্রতিটি গোত্র ন্যায়নীতির সাথে তাদের দলের মুক্তিপণ আদায় করবে। অর্থাৎ যে গোত্রের বন্দী হবে, মুক্তিপণ আদায় করে তাকে মুক্ত করার দায়িত্ব থাকবে সে গোত্রের।

৩. অত্যাচার, অন্যায়, শত্রুতা ও পাপ কাজ প্রতিরোধের জন্য সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকবে। এ ব্যাপারে কারো প্রতি কোনো অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে না। যদি সে কারও সন্তানও হয়।

৪. কোনো মুসলমান অন্য কোনো মুসলমানকে কোনো কাফেরের বিরোধীতার স্বার্থে হত্যা করবে না এবং কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে কোনো কাফেরকে সাহায্য করবে না।

৫. একজন সাধারণ মুসলমানেরও কাউকে আশ্রয় প্রদান করার অতটুকুও অধিকার থাকবে, যতটুকু অধিকার থাকবে একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমানের কাউকে আশ্রয় দেয়ার অধিকার।

৬. যে ইহুদি মুসলমানদের অনুসারী হয়ে থাকবে তার নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকবে মুসলমানদের ওপর। তাদের প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করা যাবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুদের কোনো প্রকার সাহায্যও করা যাবে না।

৭. কোনো কাফের ও মুশরিকদের এ অধিকার থাকবে না যে, তারা কোনো মুসলমানের মোকাবিলায় কুরাইশদের কোনো জান অথবা মালের আশ্রয় দিবে অথবা কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

৮. যুদ্ধের সময় ইহুদিগণ জান ও মাল দিয়ে মুসলমানদের সাহায্য করবে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাউকে কোনো প্রকার সাহায্য করার অনুমতি নেই।

৯. রাসূলুল্লাহর কোনো দুশমন যদি মদীনার ওপর হামলা করে বসে, তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহায্য করা ইহুদিদের ওপর আবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে।

১০. এ চুক্তিনামায় যেসব শরিক থাকবে, তাদের মধ্য থেকে যদি কেউ এ চুক্তি হতে আলাদা হয়ে যেতে ইচ্ছা করে, তা রাসূলুল্লাহর অনুমতি ছাড়া কার্যকর হবে না।

১১. কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও অন্যায়কারীকে কোনোরূপ সাহায্য করা ও আশ্রয় দেয়া যাবে না। যদি কেউ কোনো পাপী ও অন্যায়কারীকে সাহায্য করে ও তাকে নিজের কাছে আশ্রয় দেয়, তার প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে। তার কোনো আমলই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

১২. মুসলমানগণ যদি কারো সাথে সন্ধি স্থাপন করার ইচ্ছা করে, তবে ইহুদিগণও সে সন্ধির সাথে শরিক থাকবে।

১৩. কেউ যদি কোনো মুসলমানকে হত্যা করে এবং তার যদি সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তবে তার কিসাস গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ তাকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা হবে। আর যদি যাকে হত্যা করা হয়েছে তার অভিভাবক অন্য কোনো উপায়ে রাজি হয়ে যায়। তবে হত্যাকারী কিসাস থেকে মুক্তি পেতে পারে।

১৪. যখন কোনো বিষয়ে পরস্পরে ঝগড়ার সৃষ্টি হবে অথবা মতানৈক্য দেখা দেবে, তখন বিষয়টি ফয়সালার ভার আল্লাহ ও তার রাসূলের ওপর ন্যস্ত করা হবে।

সংক্ষিপ্ত ধারাগুলো উল্লেখ করার পর এর কিছু দিক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দাবি রাখে

ক. একটি উম্মাহর স্বীকৃতি দান : তখনকার সময়ে জাজিরাতুল আরবের সব অঞ্চলই গ্রোত্রীয় শাসনের ধারায় চলত। কেন্দ্রীয় শাসনের ধারণা তাদের কাছে ছিল অভিনব। গোত্রশাসনে অভ্যস্ত মানুষগুলো স্ব-গোত্রের বাইরে সকলকে শত্রু মনে করত। গোত্রীয় আভিজাত্য নিয়ে শুধু গর্ববোধ নয়, বরং তা যুদ্ধে রূপ নিত অহরহ। অন্য গোত্রের সম্পদ; এমনকি তাদের সন্তান ও স্ত্রীদের জবরদখল করে ক্রীতদাস-দাসীতে পরিণত করা সে সমাজে কোনো অপরাধ বলে গণ্য হতো না, বরং এটা ছিল গৌরবের। এসনদে বলা হলো, 'চুক্তিবদ্ধ সব পক্ষ মিলে একটি উম্মাহ বা একটি জাতি। অন্য লোক হতে তারা একটি স্বতন্ত্র উম্মাহ।' এ ঘোষণা দ্বারা গোত্রে গোত্রে বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি একটি মজবুত শক্তিতে পরিণত হলো। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মুসলমান, ইহুদি, আনসার, মুহাজির মিলে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে রূপান্তরিত হলো। ধর্মের বাইরে থেকে রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সব ক্ষেত্রে যে একটি উম্মাহ গঠিত হতে পারে মদীনা সনদ তার একটি বাস্তব উদাহরণ। এতে করে ক্ষুদ্র গোত্রীয় ধারণা দূরীভূত হয়ে একটি মজবুত ঐক্য গঠিত হলো। যারা এতদিন পরস্পরের শত্রু ছিল তারাই এখন বন্ধুতে রূপান্তরিত হলো। ইসলামের কাঙ্ক্ষিত সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে এ ধরনের একটি পরিবেশ তৈরি করা ছিল সে সময়ের অনিবার্য দাবি।

খ. রক্তপণ ও মুক্তিপণ : যুগ যুগ ধরে যুদ্ধবাজ আরব জাতি যুদ্ধ করত, রক্ত ঝরাত, রক্তপণ আদায় করত। যুদ্ধবন্দীদের ধরে নিয়ে আসত এবং মুক্তিপণ আদায় করত। তাদের সমাজে পূর্ব থেকে প্রচলিত মুক্তিপণ ও রক্তপণ নিয়ে সনদে স্বাক্ষরকারী সব পক্ষের নামোল্লেখ করে বলা হয়, 'তারা তাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী তাদের প্রতিটি দল মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে মুক্তিপণ প্রদান করে তাদের বন্দীদিগকে মুক্ত করবে।' রক্তপণের ক্ষেত্রে পূর্বপ্রথা ও পূর্বহার বলবৎ রাখা হলেও মুক্তিপণের ক্ষেত্রে মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম ন্যায়বিচারের মানদন্ডকে ছাড় দেয়া হয়নি। এ সনদে প্রচলিত প্রথা ও ন্যায়বিচার দু'টি বিষয় উল্লেখ ও সমন্বয় করার যথাসাধ্য চেষ্টা লক্ষণীয়।

এ ধারার একটি উপধারায় একজন মুমিনকে হত্যা করলে হত্যাকারীর শাস্তি কী হবে, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। সনদে বলা হয়েছে, 'যদি কোনো ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করে এবং তা প্রমাণিত হয়, আর যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবক রক্তপণ গ্রহণ করতে রাজি না হয়, তাহলে হত্যাকারীর ওপর কিসাসের হুকুম বর্তাবে, অর্থাৎ তাকেও হত্যা করা হবে। এ প্রসঙ্গে সব মুমিন তার বিপক্ষ অবলম্বন করবে। এর বিরোধিতা করা কারো জন্য বৈধ হবে না।' যুদ্ধ যাদের জীবনে খেল তামাশার মতো বিষয় ছিল। আর এর অনিবার্য পরিণতি রক্তপণ ও মুক্তিপণ। মদীনা সনদে এর স্থান পাওয়া ছিল সময়ের অনিবার্য দাবি। একটি তাৎপর্যপূর্ণ সনদে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্তি সনদের পূর্ণতার জন্য ও অলঙ্কার বটে।

গ. সামাজিক দায়িত্ববোধ : রাষ্ট্রের নাগরিকদের ব্যাপারে রাষ্ট্রের মহান দায়িত্ব নাগরিকদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা। যেমন রাসূল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো অসহায় সন্তান রেখে মারা যায়, ঐ সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব আমাদের, অর্থাৎ রাষ্ট্র ও সরকারের, আর কেউ যদি ঋণগ্রস্ত হয়ে মারা যায়, তা পরিশোধের দায়িত্ব সরকারের।' এ দায়িত্ব যেমন রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকারের, সামাজিকভাবে সব মুমিনের। মদীনা সনদে এ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'নিশ্চই মুমিনরা তাদের মধ্যে ঋণে জর্জরিত ও সংসারে পোষ্য বেশি হওয়ার কারণে অভাবগ্রস্তকে পরিত্যাগ

করবে না। তারা তার পক্ষ থেকে মুক্তিপণ ও রক্তপণ আদায় করে দেবে।' একজন মুমিনের মুক্তিপণ ও রক্তপণ সব মুমিন মিলে বহন করবে। এতে মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। কুরআনের এমন ঘোষণার বাস্তব প্রতিফলন। মুমিনগণ পরস্পর শুধু ভাই নয়, বরং সুখ-দুঃখের অংশীদার, সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এর মাধ্যমে সামাজিক ইন্স্যুরেন্স প্রমাণিত হয়।

ঘ. ব্যক্তিগত মর্যাদা : সনদে অন্তর্ভুক্ত শুধু গোত্র নয়, বরং ব্যক্তিপর্যায়ে ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা ও ব্যক্তিগত মৈত্রী চুক্তিকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সনদে বলা হয়েছে, 'কোনো মুমিনের আশ্রিত ব্যক্তির সাথে উক্ত মুমিনকে বাদ দিয়ে কোনো মুমিন মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না।' ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের মাঝে বিশেষত মুমিনদের মাঝে সম্পর্ক হবে সিসাঢালা প্রাচীরের মতো। কোনো ছোটখাটো ঘটনা যেন এ সম্পর্কের অবনতি না ঘটায় সেদিকে মনোযোগ দেয়া হয়েছে।

ঙ. বিদ্রোহ দমন : নতুন প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো কারণে রাষ্ট্র সমাজ থেকে অন্যায় বিদ্রোহ শুরু হলে তা দমনের রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ কী হবে বলা হয়েছে। 'নিশ্চই আল্লাহ ভীরু মুমিনগণের মধ্যে কেহ বিদ্রোহী হলে অথবা মুমিনদের মধ্যে অত্যাচার অথবা পাপ অথবা শত্রুতা অথবা বিশৃঙ্খলার প্রসার ঘটালে সে তাদের কারো সন্তান হলেও তাদের সম্মিলিত হাত তার বিরুদ্ধে উত্থিত হবে।

চ. কাফেরদের হত্যার বিনিময় : ইসলাম অন্যায়ভাবে কোনো মানুষকে হত্যা অনুমোদন করে না। সেক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি মুসলমান হোক কিংবা কাফের। কিন্তু একজন মুমিনের মর্যাদা কাফেরের তুলনায় অধিক হওয়ায় কোনো কাফের নিহত হলে তার বিনিময়ে একজন মুমিনকে হত্যা করা যাবে না। সেক্ষেত্রে দিয়াত দেয়া হবে। সনদে বলা হয়েছে, 'কোনো কাফেরের বিনিময়ে একজন মুমিন অন্য মুমিনকে হত্যা করবে না এবং মুমিনের বিরুদ্ধে কোনো কাফেরকে সাহায্য করবে না।

ছ. নাগরিক অধিকার জননিরাপত্তা : রাষ্ট্রের সব নাগরিক নিরাপত্তা লাভের ক্ষেত্রে সম অধিকারী। ধনী-গরিব, আশরাফ-আতরাফ সকলে এক্ষেত্রে সমান। জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের পক্ষে ইসলাম। সনদে তাই বলা হয়েছে, আল্লাহ প্রদত্ত নিরাপত্তা সবার জন্য একই। শক্তিশালীর বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা দুর্বলকেও আশ্রয় দেয়া হবে। মুমিন মুমিনের বন্ধু। অন্য মানুষ ব্যতীত।

জ. ইহুদি সম্প্রদায়ের সাথে আচরণবিধি : ইহুদিরা আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত, মূসা (আ.)-এর অনুসারী। মদীনাতে তাদের অবস্থান ছিল খুবই দৃঢ়। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী, সামরিকভাবে শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ। নবপ্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রে তারা উপকার করলে করতে পারেন, কিন্তু ক্ষতি করলে তাদের সে ক্ষমতাও কম নয়। তাই সনদে তাদের বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ইহুদি সম্প্রদায়ের যারা আমাদের অনুসরণ করবে, তাদের প্রতি অত্যাচার না করে, তাদের শত্রুদিগকে সাহায্য না করে বরং উক্ত ইহুদিদিগকে সাহায্য করা হবে ও তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা হবে।

ঝ. যুদ্ধনীতি : ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে, এর একটা যুদ্ধনীতি, পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োজন। চুক্তিতে সে বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। যুদ্ধ ঘোষণার একমাত্র অধিকারী রাষ্ট্রপ্রধান মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না। প্রত্যেকটি সেনাদল আমাদের অনুসরণ করে যুদ্ধ করবে। ইয়াসরেবের ওপর অতর্কিত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে এ চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষসমূহ পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। যদি কেউ ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত না থাকে, তাহলে যদি ইহুদিদিগকে কোনো মীমাংসার দিকে আহ্বান জানানো হয়, তবে তারা সে মীমাংসা মেনে নেবে। অনুরূপ ইহুদিরা মুসলমানদিগকে কোনো মীমাংসার দিকে আহ্বান জানালে মুসলমানগণ সে মীমাংসা মেনে চলবে। প্রত্যেক পক্ষই তার ওপর অর্পিত অংশের (ব্যয়ভারের) দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আওস গোত্রের ইহুদিগণ ও তাদের মিত্ররা এ চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত পক্ষের সাথে উত্তম আচরণ করলে তারাও এ চুক্তি সম্পাদনকারীদের মতো গণ্য হবে।

ঞ. মুমিন মুত্তাকিনদের বিশেষ মর্যাদা : মানুষের সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি হলো ইসলামের দৃষ্টিতে তাকওয়া। মুসলমানদের কাছে ঈমান হলো সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ। তাকওয়া হলো সর্বোত্তম ভূষণ। তাকওয়ার আবার স্তর আছে। যে যত অগ্রসর তার মর্যাদা তত বেশি। মদীনা সনদে মুমিন-মুত্তাকিনদের বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'নিশ্চই মুমিন, মুত্তাকিগণ সর্বোত্তম ও সঠিক হিদায়েতের ওপর প্রতিষ্ঠিত।'

ট. মুশরিক কুরাইশদের সাথে সম্পর্ক : মক্কার কুরাইশ কাফেরগণ হলেন সনদের সরাসরি প্রতিপক্ষ। তাদের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে, তা সনদে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তাদের অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন চরম আকার ধারণ করায় বাধ্য হয়ে মুসলমানগণ দ্বীন-ঈমান ও জান নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন। এমন প্রেক্ষাপটে কাফের-মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সনদে বলা হয়েছে, 'কেউ কোনো মুশরিক কুরাইশের জানমালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে না এবং কোনো মুমিনের বিরুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষ অবলম্বন করবে না। কুরাইশ ও তাদের সাহায্যকারীকে আশ্রয় দেয়া যাবে না।'

ঠ. দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন : সত্যকথা বলা, সত্য প্রতিষ্ঠা ও সত্যের বিকাশ এটাই ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য। অন্যায়, অপরাধ ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম অত্যন্ত কঠোর ও সোচ্চার। কোনো অন্যায়কারী ও অপরাধীর পক্ষে ইসলামে অবস্থান

নেই। ইসলামী সমাজে কেউ অন্যায় করবে না এবং অন্যায়ের পক্ষে সহযোগী হবে না। অন্যায়কারীকে প্রশ্রয় দেবে না। মদীনা সনদে এমন কথারই প্রতিধ্বনি করা হয়েছে, 'যে মুমিন এ চুক্তিপত্রে সন্নিবেশিত বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তার জন্য কোনো দুষ্কৃতকারীকে সাহায্যদানকরা, আশ্রয়দানকরা বৈধ হবে না। যদি কেউ তাকে সাহায্য করে ও আশ্রয় দেয়, তাহলে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ নাজিল হবে। তার নিকট হতে কোনো অনুতাপ ও ক্ষতিপূরণ গ্রহণযোগ্য হবে না।' এখানেই ইসলামী রীতিনীতি ছিল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন।

ড. মতানৈক্য ও মতবিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি : সনদে স্বাক্ষরকারী সব পক্ষই মানুষ। তাদের মাঝে মতানৈক্য ও মতবিরোধ থাকতে পারে, হতে পারে। বিশেষত বিভিন্ন মত ও পথের মানুষ হওয়ার কারণে। এর সমাধানে সনদে রাসূল (সা.)-কে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে একটি ধারা প্রণয়ন করা হল। বলা হয়, 'কোনো বিষয়ে তোমাদের মাঝে যতই মতবিরোধ পরিলক্ষিত হোক না কেন সেজন্য এর সমাধানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তই হবে সমাধান।' এখানে আল্লাহর আইন মানা যেমন বাধ্যতামূলক করা হলো, অপর পক্ষে রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত সব পক্ষ মেনে নিয়েছে।

ঢ. অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত : পূর্ণাঙ্গ একটি চুক্তি বা সনদে কোনোদিক বাদ পড়ে না। তাই মদীনা সনদেও এ গুরুত্বপূর্ণ দিকটি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়েছে দূরদর্শী সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ (সা.) তাই সনদের ভেতরে এটাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। চুক্তিভুক্ত জনগোষ্ঠীর খরচাদি কে বহন করবে, কীভাবে অর্থের আমদানি হবে, তা বলা হয়েছে। এখানে খরচাদিকে দুভাগে দেখানো হয়েছে। এক সাধারণ খরচ, দুই যুদ্ধকালীন খরচ। সাধারণ খরচের ব্যাপারে চুক্তিতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চই ইহুদিদের খরচ তারা নিজেরা বহন করবে আর মুসলমানদের খরচ তারা বহন করবে।' আবার বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক পক্ষই তার নিজ নিজ খরচ বহন করবে।' আর যুদ্ধকালীন খরচ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যতদিন যুদ্ধ চলবে, ইহুদিরা মুমিনদের সাথে তাদের অংশের যুদ্ধের খরচ বহন করবে।'

ন. ধর্ম-কর্ম পালনের স্বাধীনতা : রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে প্রত্যেক ধর্মের লোকেরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মকর্ম পালন করতে পারবে। কেউ কাউকে বাধাও দেবে না, বাধ্যও করবে না। সনদে বলা হয়েছে, 'ইহুদিদের জন্য তাদের ধর্ম, আর মুমিনদের জন্য তাদের ধর্ম। একইভাবে তাদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিরা ও তারা একই সম্প্রদায় বলে বিবেচিত হবে।'

ত. কল্যাণকর সামাজিক নীতিমালা : নতুন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। এটা একটা কল্যাণ রাষ্ট্র। সুখী সমৃদ্ধশালী একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু রীতি প্রয়োজন। এ সনদে তার বিবরণ দেয়া হয়, 'নিশ্চই তাদের মধ্যে পারস্পরিক সদুপদেশ ও পরামর্শ বলবৎ থাকবে। পাপ নয়, পূণ্যই বিরাজ করবে। চুক্তিতে আবদ্ধ কারো দুষ্কর্মের জন্য অন্যরা দায়ী হবে না, সাহায্য হবে অবশ্যই অত্যাচারিতের জন্য।' 'অন্যায় ও পাপাচারে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আশ্রিতরা গৃহস্বামীর মতোই বিবেচিত হবে। কোনো মহিলাকে তার পরিবারের লোকদের অনুমতি ছাড়া আশ্রয় দেয়া যাবে না।

থ. মদীনার মর্যাদা : এ সনদে মদীনা রাষ্ট্রকে সামাজিক ও ধর্মীয় বিশেষ মর্যাদা দেয়া হলো। মদীনাকে নিরাপত্তার নগরী হিসেবে ঘোষণা করা হলো। সনদে বলা হয়েছে, 'এ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সবার জন্য ইয়াসরেব ভূখণ্ড হারাম।' 'ইয়াসরেবের ওপর অতর্কিত আক্রমণ হলে তারা সাহায্য অব্যাহত রাখবে।'

দ. সন্ধি মেনে চলার বাধ্য বাধকতা : সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ সব পক্ষ সমস্যার সমাধানে নিজেরা সম্মত ও মীমাংসিত বিষয়গুলো তারা মেনে চলতে বাধ্য। বলা হয়েছে, 'ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত না থাকা অবস্থায় ইহুদিদিগকে কোনো মীমাংসার দিকে আহ্বান জানানো হলে তারা সে মীমাংসা মেনে চলতে বাধ্য।'

ধ. মৌলিকত্ব ও নির্ভরযোগ্যতা : উপসংহারে আল্লাহকে সাক্ষী মেনে এ সনদের সমাপ্তি টানা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'এ সহীফায় যা রয়েছে আল্লাহ তার সততার সাক্ষী এবং তিনি এর রক্ষণাবেক্ষণকারী।' 'আল্লাহ ও মুহাম্মদ (সা.) সৎ ও তাকওয়াবানদের আশ্রয়দানকারী।'

লেখক : অধ্যক্ষ, আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদরাসা, ফেনী।

**********সমাপ্ত**********